শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, ৫ই জুলাই, ১৯৬০

প্রচ্ছদপট
অংকন : পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও নব মুদ্রণ, ১ বি রাজা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
হইতে শ্রীকমল মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

বাঙালীর সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় রাজনীতির পটভূমিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থান নির্ণয় নিয়ে আজ আর কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। মহান পিতার সুযোগ্য পুত্রকে আমরা একাধারে শিক্ষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী আবার অক্লান্ত সমাজসেবী এবং নিঃস্বার্থ নির্ভীক রাজনীতিক—নানাভাবে পেয়েছি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও দেশভাগকালীন অবস্থার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা জানেন মন্বন্তরের সময়ে এবং দেশভাগের পর বাংলা ও বাঙালীর কল্যাণার্থে শ্যামাপ্রসাদ কিভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তর্ক করে ও আলোচনা করে উদ্বাস্তুদের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পাকিস্তান তোষণ নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে ইতস্তত করেন নি। তিনি বরাবর যা নিজে ভাল বুঝেছেন, সাধারণ মানুষের হিতকর হবে ভেবেছেন তা করতে পিছপাও হন নি। লোকনিন্দার বা সমালোচনার পরোয়া করেন নি। স্বাধীনতার আগে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগদান ও পদত্যাগ, স্বাধীনতার পর হিন্দু-মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান, নেহরুজীর সঙ্গে মতবিরোধে পদত্যাগ, জনসঙ্ঘ দলের প্রতিষ্ঠা—এ সবই তাঁর জনগণের মঙ্গল-অন্বেষা ও চরিত্রদার্ঢ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। হিন্দু-মহাসভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছেন। শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিকথা, দিনলিপি ও শেষজীবন পড়লে এই ভুল আর কারও হবে না। এই কর্মবীর মানুষটির পারিবারিক জীবনটিও ছিল স্নেহময় ও মধুর যদিও ভাগ্যের নিদারুণ আঘাত মাঝে মাঝেই শ্যামাপ্রসাদের জীবনে নির্মম ভাবে নেমে এসেছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে সম্পাদক ও শ্যামাপ্রসাদের অনুজ শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'মুখপত্র ও ঘরোয়া কাহিনী'তে এবং শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিকথায় শ্যামাপ্রসাদের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র আছে।

বাংলা তথা ভারতের এই কৃতী সন্তানের জীবনাবসান ঘটে মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে কাশ্মীরে বিনা বিচারে আটক থাকার কালে বন্দিশালায়। সেই বন্দিশালায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা তথা সারা ভারত বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি এই মহান ভারতীয়র বিনা বিচারে বন্দী থাকাকালে সেই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য কাশ্মীর সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। এঁরা সকলেই এক বাক্যে কাশ্মীরে বন্দি-অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসার ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের

শেষভাগে বন্দিদশায় শ্যামাপ্রসাদের জীবন-অবসান প্রসঙ্গ এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মন্তব্যাদি, নেহরু ও শ্যামাপ্রসাদ-জননীর পত্রবিনিময় যা আগে উমাপ্রসাদবাবুর সম্পাদনায় ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিও বাংলা অনুবাদে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হল। জীবনাবসান প্রসঙ্গে উদ্ধৃত ইংরাজি মন্তব্যাদি অংশের অনুবাদ এবং পরিশিষ্ট অংশের অনুবাদ ভিন্ন হাতে হওয়ায় কোথাও কোথাও সামান্য ভাষান্তর ঘটেছে। উল্লিখিত ইংরাজি পুস্তিকাটির Appendex অংশ শ্যামাপ্রসাদ-জননীর ইংরাজি ভূমিকা সহ পরিশিষ্ট ৬-এ পুনর্মুদ্রিত হল। শ্যামাপ্রসাদকে লিখিত কাজী নজরুল ইসলামের একটি পত্র পরিশিষ্ট ৫-এ সংযোজিত হল। প্রাক্তন রাজ্যপাল ও শিক্ষাবিদ্ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে ভাষণটি ইংরাজিতে যথাযথ ছাপা হল। আমাদের ভবিষ্যতের জন্যই ইতিহাসকে জানা ও স্মরণে রাখা দরকার। এই গ্রন্থ সেই কাজে জাতি ও দেশের সহায়ক হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কাজী নজরুল ইসলামের পত্রের প্রতিলিপি।
উপরে শ্যামাপ্রসাদের মন্তব্য সহ। [২০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

সবাই "বেতিয়া". সব সাহিত্যি[illegible] [illegible] সেই কথার [illegible]
সাহিত্য) সুরে বেধেছে — সে সব অনুরাগ [illegible]
[illegible]. সেদিন [illegible] পাঠ হয়। আমি [illegible]
[illegible] ও [illegible] সহযোগ ওঁর [illegible]. [illegible]
দেখেছি. তার হাতে ছিল Coalition ministry-র ভার।
[illegible]
২০ সেপ্ট [illegible] জেনেরেল. "কিরকম লোক?" আমি [illegible]
ছিল এমন [illegible] ওঁর কাছে থাকি। — আমারি Secretariat-এ ভার দিয়েছেন. "ও হয় [illegible]" এখন থেকে [illegible]
তিনি বলেন. "আমি [illegible] থাকব।" এই [illegible]
Coalition-ministry-র এখানে [illegible] [illegible] করি.
[illegible] — [illegible] না। আমি [illegible]. — [illegible]
এই [illegible] — [illegible]
ও [illegible] — [illegible].

[illegible] ... [illegible]

হবে একেবারে [illegible] [illegible] কাজে।

আমার সহৃদয় [illegible] ও [illegible] গ্রহণ করুন। আমি জানি ও বলি Hindu-Muslim unity [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেয়েছি। ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] দিতে হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

প্রীত -

কাজী নজরুল ইসলাম



জননী যোগমায়া ও শ্যামাপ্রসাদ



মুখপত্র
ও
ঘরোয়া কাহিনী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর,—মেজদাদা হোতেন। মেজদা বলে ডাকতাম। এখানেও সেই নামেই উল্লেখ করব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর পিতৃদত্ত নাম প্রয়োগ করেছিলেন, তার যুক্তিযুক্ত কৈফিয়তও দিয়েছিলেন। আমার সেই একই পন্থা অনুসরণ না করার কারণ,—মেজদার জীবনী লেখার প্রয়াস এটা নয়,—নিরাসক্ত নিঃসম্পর্ক কাহিনী রচনাও উদ্দেশ্য নয়। আপন অগ্রজকে গৃহ-পরিবেশে যেমন দেখেছি তারই কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশ করার প্রচেষ্টা,—মেজদারই রচিত পুরানো এক দিনপঞ্জীর মুখপত্র লেখার সুযোগে।

কিন্তু, শুধু মেজদার কথাই নয়, তাঁর ডায়েরীতে লিখিত আমাদের পরিবারের পরলোকগত পরমাত্মীয় দু' একজন সম্পর্কে আমারও মনে যে-চিত্র ফুটে আছে, তাঁদেরও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই মেজদার ডায়েরী লেখার আগ্রহের বিষয়ে বলি।

মেজদার অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে কাশ্মীরে বন্দীদশায়। ১৯৫৩ সালে। সেই বন্দীজীবনে তাঁর লেখা যে কয়েকটি চিঠিপত্র 'সেনসড' হয়ে বাড়িতে আসত, তাতে দেখা যায় তিনি সেই নিঃসঙ্গ নির্বাসনে নিয়মিত দিনলিপি লিখছেন এবং পিতৃদেবেরও একটি জীবনী রচনা শুরু করেছেন। কিন্তু, তারপর, কাশ্মীর সরকার যখন হঠাৎ একদিন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে তাঁর মরদেহ কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদন করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর বন্দীকালে ব্যবহৃত সামান্য কাপড়-জামা ও জিনিসপত্রও ফেরত আসে, কয়েকটি কাগজপত্রও তাতে ছিল, অথচ, সেই ডায়েরী ও রচনাটি তার মধ্যে পাওয়া যায় নি। কাশ্মীর সরকারকে লিখেও সেগুলির উদ্ধার হয় নি। এ-ক্ষতি অপূরণীয়। তাঁর অবরুদ্ধ জীবনের সেই শেষ সময়ের দিনলিপি এইভাবেই লুপ্ত হয়, তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনাবলীও রহস্যাবৃত থাকে।

দিনলিপি লেখার প্রবল বাসনা যে মেজদার ছিল এবং অবসর পেলেই লিখতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া তাঁর দুটি পুরানো ডায়েরী থেকেও। তাতে তিনি জানান, নিয়মিত ডায়েরী রাখার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি দিনলিপি লিখতে শুরু করেন, কিন্তু "আরম্ভ করে শেষরক্ষা করতে" পারেন না। মনে হয়, লেখা বন্ধ হয়ে যায় উৎসাহের অভাবে নয়। নানাবিধ কাজকর্মে ব্যস্ততাই এই বিঘ্ন ঘটায়।

যে-ডায়েরী ও স্মৃতিকথা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে, এগুলিও তাই অসম্পূর্ণ। তা'হলেও, বিবিধ কারণে মূল্যবান।

ডায়েরী ও স্মৃতিকথা-লেখা খাতা দুটির বর্ণনা এই ঃ

দুখানি বই-আকারে বাঁধানো খাতা,—একটি বড়, অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

বড় খাতার প্রথম পাতায় বাঙলায় নিজের নাম লিখে তারিখ লেখা ৭ জানুয়ারী ১৯৪৬, পাশে লেখা "মধুপুরে লেখা আরম্ভ"। এতে মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা।

ছোট খাতার প্রথম পাতার উপর-অংশে ইংরেজিতে নাম সই করা S.P. Mookerjee Jany 1944। তার নিচে বাঙলায় নাম লেখা "শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৫-১২-৪৫"। এই খাতার প্রথম দিকে ৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী ইংরেজিতে লেখা "Calcutta 4. 1. 44" তারিখের একটিমাত্র বিবৃতি। অমৃতসরে All India Hindu Mahasabha-র 25th Session-এ যোগদান করে ২রা জানুয়ারী '৪৪ কলকাতায় ফিরে এসে ঐ সম্পর্কে নিজের মতামত ও অভিজ্ঞতা লিখে রাখা। এ অংশ ইংরেজিতে। সেই ছয় পৃষ্ঠার পর লেখা "১৯৪৬"।

তারপর শুরু হয় বাংলায় লেখা দিনলিপি "মধুপুর ৩/১/৪৬" তারিখ থেকে এবং শেষ হয় "২৭ জানুয়ারী" যেদিন তিনি মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। এই ডায়েরী ২২৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এরই ৮/১/৪৬ তারিখের বিবৃতিতে উল্লেখ পাওয়া যায়, "দুদিন আর লেখা হয় নি। অন্য লেখা লিখেছি—নতুন খাতায় জীবনের ঘটনা গোড়া থেকে লেখবার চেষ্টা করছি। সেটা বাংলায় লিখছি" —সেইটিই ঐ বড় খাতা,—যার মাত্র ৪৮ পাতা লেখা হয়েছিল অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষের ও নিকট আত্মীয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁর নিজের বাল্যস্মৃতি লিখে বন্ধ হয়ে যায়। "আমার ছেলেবেলা" শিরোনামায় ডায়েরীর আগে সেটিও ছাপা হোল।

এ ছাড়া, তিনি ৮/১/৪৬ তারিখের বিবৃতিতে আরও জানান, "ইংরাজীতে ছোট ডায়েরী রাখছি। আর গত দু' বছরের ঘটনার চুম্বক যা কিছুদিন আগে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, তাও বলে যাচ্ছি, ইংরাজীতে টাইপ হয়ে লেখা হচ্ছে।" ইংরাজী সেই রচনাও পৃথক্ প্রকাশ করার আয়োজন চলেছে।

২৫শে ডিসেম্বর '৪৫ থেকে ২৭শে জানুয়ারী '৪৬ পর্যন্ত মেজদাকে মধুপুরে কাটাতে হয় অসুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু, তিনি ছিলেন কর্মব্রতী, অক্লান্ত পরিশ্রমী। চুপ করে বসে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই রোগীর অবশ্যপালনীয় বিশ্রামকালের মধ্যেই তিনি সুযোগ নিলেন এই দিনলিপিগুলি ও তাঁর কিছু স্মৃতি-কাহিনী লেখার। তাঁর সেই বাংলা ডায়েরী ও অসম্পূর্ণ আত্ম-কাহিনী এখানে প্রকাশিত হোল।

এইবার আমাদের ঘরোয়া কাহিনী লিখি।

মেজদার জন্ম,—১৯০১ সালে ৬ই জুলাই। আমার,—১৯০২ সালে, ১২ই অক্টোবর। আমরা দুজনে পিঠাপিঠি ভাই। এই ধরনের সন্তানদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষার মনোভাব থাকার প্রবচন বাঙলায় প্রচলিত আছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে কিন্তু, জ্ঞান হওয়া অবধি কখনও সম্প্রীতির অভাব ঘটে নি। 'জ্ঞান হওয়া'র সময় নির্দেশের একটা কারণ আছে। মায়ের মুখে আমাদের অতি-শৈশবের একটা ঘটনা

শুনতাম যেটা মেজদার বা আমার দুজনেরই স্মরণে থাকে নি, এত ছোট বয়সের যে থাকার কথাও নয়। মেজদা তখন সবে হাঁটতে শিখেছেন,—আর আমি তখনও হামাগুড়ি দিই। মা বলতেন, মেজদা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে খুনসুটি করতেন চিমটি কাটতেন,—আমি কেঁদে উঠতাম। একদিন দুপুরবেলা মাটিতে আমাদের বিছানা পেতে পাশাপাশি শুইয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন, নিকটে বসে রামায়ণ-মহাভারত কি যেন পড়ছেন। হঠাৎ, কি কারণে, আমার ঘুম ভেঙে যায়। পিট্‌পিট্ করে এধার ওধার তাকাই। নজর পড়ে মেজদার দিকে,—অসাড়ে ঘুমাচ্ছেন। আমি আমার বিছানা ছেড়ে হামা দিয়ে মেজদার পাশে যাই, তাঁর ঘুমন্ত দেহের এলিয়ে-থাকা তুলতুলে হাতে আমার সবে-নতুন-ওঠা দাঁত দিয়ে কট্ করে কামড়ে দিই। মেজদা জেগে কেঁদে ওঠেন। আমি পাশে বসে সেই কচি-দাঁত-বার-করা মুখে হাসতে থাকি!

ছেলেবেলার এই গল্প মায়ের হাসি-ভরা মুখে অনেকবার শুনেছি। কিন্তু, জীবনে কখনও আমাদের দুই ভায়ের মধ্যে কোনও অসদ্ভাব ঘটে নি।

অথচ শিশুকালের সেই ক্ষুদ্র ঘটনার অন্তরালে আমাদের পিঠাপিঠি দুই ভাই-এর মধ্যে নানান্ বিষয়ে বৈসাদৃশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বয়সের অনুপাতে মেজদা দেখতে অনেক বড়সড় ছিলেন। ভারী দেহ। ভারিক্কি চালচলন। কথাবার্তা, বুদ্ধি ও মনোবিকাশেও অগ্রসর। সেই কারণেই স্কুলেও তিনি আমার তিন ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। তখনকার দিনের ফার্স্ট ক্লাসে (আজ-কালকার দশম শ্রেণীতে) উঠে এর জন্যে তাঁকে ফলভোগও করতে হয়। সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল, ষোল বছর বয়স না হলে কোন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারত না। তাই, ফার্স্ট ক্লাসে উঠে এক বছরের জায়গায় তিন বছর তাঁর থাকবার কথা। কিন্তু, ১৯১৭ সালে, দ্বিতীয় বছর পার হতেই, সেবারকার পরীক্ষা শুরু হবার আগে প্রশ্নপত্র প্রকাশ হয়ে পড়ায় পরীক্ষা দুবার বন্ধ হয়ে আবার নতুন করে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দেন, যে-সব ছাত্র নির্ধারিত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারে নি, অথচ পরীক্ষা পেছিয়ে যাওয়ায় ইতোমধ্যে যাদের ষোল বছর হয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে পরীক্ষায় বসতে পারবে। মেজদাও সেই পর্যায়ে পড়েন। তিনি সে-সময় মধুপুরে নিশ্চিন্ত মনে অবসরে দিন কাটাচ্ছেন। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর গেল, কদিন পরেই পরীক্ষায় বসতে হবে। তখনি তিনি কলকাতায় চলে এলেন। পরীক্ষাও দিলেন। ডায়েরীতে এ-ঘটনার উল্লেখ আছে। সেই কারণে, পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করলেও আশানুরূপ ফললাভ হয় নি। এ-ভাবে অনুমতি পেয়ে পরীক্ষা তিনি একাই দেন নি, সে-বছর আরও কয়েকজন ছাত্র দিয়ে-ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে দেখা যায়।

কিন্তু, ফিরে আসি মেজদার ছেলেবেলাকার কথায়।

ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল—'বেণী'। স্কুলের খাতাপত্রে তাঁর নাম 'শ্যামাপ্রসাদ' লেখা থাকলেও সহপাঠীরা স্বভাবতঃ বেণী নামেই তাঁকে ডাকতেন।

তখনকার বাঙলা পাঠ্যপুস্তকে এক রচনার মধ্যে ছিল,—'বেণী বড় দুরন্ত বালক'। স্কুলের সুযোগসন্ধানী ছাত্ররা তাঁকে এই নাম নিয়ে কেবলি ঠাট্টা করে উত্যক্ত করত। তিনি বাড়ি এসে বাবা-মার কাছে নাম বদলানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। অবশেষে, ডাকনাম তাঁর বদলেও যায়। কিন্তু, তবুও তাঁর স্কুলের এক সহপাঠী বন্ধু অনেক বছর পরেও দেখা হলেই তাঁকে ঐ বেণী নামেই সম্বোধন করতেন দেখেছি। তখন অবশ্য "দুরন্ত বালক"-এর খোঁচার আঘাত আবাল্য-বন্ধুত্বের স্মৃতি-মাধুর্যে রূপায়িত হয়েছে!

খেলাধুলায় আমার ছিল প্রবল উৎসাহ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের প্রায় সমবয়সী ছেলেরা যারা থাকত বা মাঝে মাঝে আসত, তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে যেতাম। মেজদাও কখন কখন তাতে যোগ দিতেন। কিন্তু, বয়সের বেশি তফাৎ না হলেও সবাই তাঁকে সমীহ করে খেলত, দলে থেকেও কেমন-যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব। ছোট ছেলেপিলের দলে বয়স্ক কেউ যেন মজা করে খেলতে নেমেছেন! খেলাধুলায় তাঁর বাল-সুলভ আকর্ষণ ছিল না। তবে হইচই করায় উৎসাহ ছিল প্রচুর।

বই পড়তেন খুব। তার একটা প্রমাণ দিই।

ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন আই. এ. ক্লাসে। তাঁর পুরানো চিঠিপত্রের মধ্যে দেখা যায়, যখন তিনি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে লম্বা চিঠি লিখছেন—শার্লক-হোম্‌স্‌ চরিত্র-স্রষ্টা আর্থার কোনান্‌ ডয়েলকে,—তাঁর বইগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন, তিনি যদি তাঁর স্বাক্ষরিত একটা ফটো পাঠিয়ে দেন্‌।

সেই বিশ্ববিশ্রুত কোনান্‌ ডয়েলের সঙ্গে পরে বিলাতে মেজদার সাক্ষাৎকারও হয়। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও করেন,—সে-গল্প তাঁর কাছে শুনেছি।

মেজদা মেলামেশাও করতেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়দের সঙ্গে। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে আচরণ করতেন সহজ আন্তরিকতা সহযোগে—বয়সের তারতম্যের দূরত্ব বা গাম্ভীর্য না রেখে। অথচ, মেজদার কথাবার্তায়, আচরণে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থাকত না।

তাঁর সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য থাকলেও তাঁদের কারও কারও সঙ্গে আমারই ঘনিষ্ঠতা ছিল গভীরতর। অপরপক্ষে, শিক্ষক ও অধ্যাপক মহলে মেজদার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। পুরানো চিঠিপত্রের মধ্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে পত্র-বিনিময় হোত—বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার সম্পাদনা সূত্রে। এমন কি, কলেজের দীর্ঘ-অবসর-প্রাপ্ত প্রাচীন প্রখ্যাত সাহেব অধ্যাপকদের দু'একজনকে বিলাতেও পত্র লিখে প্রবন্ধ পাঠাতে তিনি অনুরোধ জানাতেন। এইচ্‌. এম. পার্সিভ্যাল সাহেবের একখানি সুন্দর পত্র রয়েছে। তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক (১৮৮০-১৯১১) আমাদের পিতৃদেব ছিলেন তাঁর ছাত্র। আর মেজদা যখন তাঁকে চিঠি লিখছেন তখন তিনি বি. এ. ক্লাসে পড়েন, বয়স ১৯ বছর।

পার্সিভ্যাল সাহেবের চিঠির মধ্যে মেজদার চিঠির বক্তব্য ও মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়।

মেজদার ভারিক্কি চেহারায়, চালচলনে, বাক্যালাপে স্বতঃস্ফূর্ত গাম্ভীর্যের প্রকাশ থাকলেও তাঁর স্বভাবে রহস্যপ্রিয়তার অভাব ছিল না। অনেক সময় হাস্যপরিহাস ও সরস উপহাস করে কৌতুকময় ঘটনার সৃষ্টি করতেন। কথাবার্তায় মজলিস জমানোর অপূর্ব ক্ষমতা ছিল।

পরবর্তী কালে লোকসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর যে repartee কথা-কাটাকাটির নানান্ উপভোগ্য উজ্জ্বল উদাহরণ দেখা যায়, ছেলেবেলাতেও তাঁর সেই চারিত্রিক ক্ষমতার অস্ফুট ইঙ্গিত মেলে। একদিনের ঘটনা বলি। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন সবে ভর্তি হয়েছেন। কলেজের সেই বিরাট সোপানশ্রেণী। ভারি দেহ নিয়ে একতলা থেকে তিনি ধীরপদে ওপরে ধাপ বেয়ে উঠছেন। দোতলার 'করিডরে'—বারান্দায় সিঁড়ির মুখে কয়েকটি অপরিচিত ছাত্র তাঁকেই লক্ষ্য করে কী যেন পরামর্শ করছে তাঁর সন্দেহ হোল। মেজদা ওপরে পোঁছুতেই তাদের একজন হঠাৎ এগিয়ে এসে অতি-পরিচিতের ভান করে মেজদার স্থূল উদরের উপর হাত বুলিয়ে "আরে ভাই কী খবর"—বলে সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গেই মেজদাও তাঁর বিশাল মুঠো তুলে তার পিঠে দমু করে কিল মেরে থাবল দিয়ে টিপে ধরে বললেন,— "এই তো! কদ্দিন পরে দেখা!"—পিঠের আঘাতে আঁৎকে উঠে সে তখনি মুখ কাঁচুমাচু করে বলে ওঠে, "ওঃ! আর একজনকে ভেবে ভুল করেছি—চিনতে পারি নি! ছাড়ুন, ছাড়ুন।"—মেজদাও তখনি থাবলের মুঠো ছেড়ে দিয়ে বলেন, "সত্যি! তাই তো! আমারও ভুল হয়েছে দেখছি। মনে করবেন না কিছু।"

সেকালে ভারতে বৃটিশ রাজত্ব চলেছে। দেশবাসীর মনভরা পরাধীনতার গ্লানি। বিশেষ করে অধিকাংশ 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান'দের (লোকে বলত 'ফিরিঙ্গী') সাধারণ দেশবাসীর প্রতি বর্বরতা ও দুর্ব্যবহার অসহ্য বোধ হোত। পথেঘাটে আমাদের সম্বোধনকালে ঠোঁট বেঁকিয়ে ডাকতো—"এ-ই ব্যাবু"। শুনলে গা জ্বলত। বাগ্‌বিতণ্ডা লাগতো প্রায়ই। এর বহু ঘটনা তৎকালীন পত্রপত্রিকায় ও গল্প-উপন্যাসেও পাওয়া যায়। সেই সব পরিস্থিতিতে মেজদা সঙ্গে থাকলে তিনিই হোতেন আমাদের দলনেতা। একবার মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরব, স্টেশনে এসেছি। দলে আমরা চার-পাঁচজন। ট্রেন আসতে তখনও কিছু দেরী রয়েছে। "ওয়েটিং রুমে" ঢুকে দেখা যায় চেয়ার খালি নেই। দু-চারজন যাত্রী বসবার জায়গা না পেয়ে ঘোরাফেরা করছেন। অথচ, একটা প্রকাণ্ড বেঞ্চে এক ফিরিঙ্গী জুতাসমেত পা তুলে লম্বা হয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে! তাকে উঠে বসতে বলা হোল। কেয়ার করল না। পাও গুটাল না। বচসা বেধে গেল। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন সে একভাবেই শুয়ে রইল, আমাদের দলের দুজন তার ছড়ানো পায়ের ওপরই বসে পড়লাম। আর মেজদা করলেন কি, তাঁর ভারী দেহখানি নিয়ে তার পেটের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন! লোকটা 'ঘোঁৎ' শব্দ করে আর্তনাদ করে উঠল, "ওঃ!

মাই গড্ ! লেট্ মি গেট্ আপ্ !"—আমরাও তখনি উঠে দাঁড়াই, সেও বেঞ্চ ছেড়ে রেগে গজ্ গজ্ করতে করতে বেরিয়ে যায় ।

আর একবারের ঘটনায় কিন্তু ফলভোগ করতে হয় অভাবনীয়ভাবে বিপরীত ।

ঐ মধুপুরেই চলেছি কলকাতা থেকে। দুপুরের ট্রেন। মেজদা আছেন। প্রফেসর সতীশ বসুও সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর নামের উল্লেখ ডায়েরীতেও আছে। তখনকার সেকেণ্ড ক্লাস কামরা। তিনটে বেঞ্চি। আমরা দুটা অধিকার করেছি। অপরটিতে এক প্রৌঢ় সাহেব বসে চশমা চোখে একমনে বই পড়ছেন। মধুপুর প্রায় ছয় ঘণ্টার পথ। গল্প করে আমরা সময় কাটাচ্ছি। কিন্তু, নিরুত্তাপ গল্পে কি আর বেশিক্ষণ ভাল লাগে ! হঠাৎ মেজদার মাথায় প্রশ্ন জাগল, আচ্ছা, সাহেবটা চলেছে কোথায় ?—তাই নিয়েই আলোচনা চলে। কিন্তু সাহেব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হচ্ছে—"মর্কট" "বানর" "হনুমান"—এই সব আখ্যায়। তাতেই আমাদের ইংরেজ-বিদ্বেষের তারুণ্যসুলভ আত্মতুষ্টি ও স্ফূর্তি।

বাঙলাতেই আমাদের পরস্পরে কথাবার্তা চলছে। তাই সাহেবের বোঝবার ও আপত্তি করার কারণ বা সম্ভাবনা নেই। তিনিও আপনমনে নির্বিকারভাবে বই পড়ে চলেছেন। আমাদের দিকে একবারও আড়চোখেও তাকান নি। আমরাও ঐভাবেই তাঁর সম্পর্কে কে কতোরকম মুখরোচক উৎকট অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারি তারই প্রতিযোগিতা চালাতে থাকি,—দুষ্ট সরস্বতী আমাদের জিহ্বাগ্রে ভর করে অভব্য ভাষা যোগান। আসানসোল স্টেশন আসে। ট্রেন দাঁড়ায়। সাহেব তাঁর টুপি নিয়ে মাথায় দেন। ছোট্ট হাতব্যাগটি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খোলেন। এইবার এতক্ষণে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাদের পানে তাকান। ঠোঁটের কোণে তাঁর অবজ্ঞাপূর্ণ ঈষৎ বক্র হাসি। বিশুদ্ধ বাঙলায় বলেন, বাঙলাভাষা আমি ভালই বুঝি। অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সৌজন্যের জন্য !—কথাগুলি বলেই নেমে চলে যান। আমাদের এতক্ষণের সব স্ফূর্তি যেন তাঁর এক ফুৎকারে নিমেষে নিভে যায় ! পরস্পরের দিকে বোকার মত তাকাই।

এসব মেজদার ও আমাদের ছেলেবেলাকার কথা। এই ধরনের ছেলেমানুষী আচরণের আরও ঘটনা ডায়েরীখানিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, বালসুলভ সেই স্বভাব হঠাৎই মেজদার জীবনে চাপা পড়ে,—তাঁর লেখার মধ্যে সে-কথারও উল্লেখ আছে।

কিন্তু, তার আগে আমাদের পারিবারিক পুরানো কাহিনী কিছু শুনাই। প্রথমে বলি, আমাদের ঠাকুমার কথা।

পিতামহ—গঙ্গাপ্রসাদ—ছিলেন সেকালের এক বিচক্ষণ চিকিৎসক। তাঁকে আমরা ভাইবোনেরা কেউ দেখি নি। ১৮৮৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। কিন্তু পিতামহী—জগৎতারিণীকে দেখবার আমাদের সৌভাগ্য হয়। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন—১৯১৪ সালে। মধুপুরের বাড়ি তৈরি হওয়ার দু'বছর পরে। ডায়েরীতে ঠাকুমার উল্লেখ রয়েছে মধুপুরে নবনির্মিত গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান বর্ণনায়

মধ্যে। আমরা সবাই মধুপুরের রাস্তা দিয়ে চলেছি নূতন গৃহে প্রবেশ করতে পদব্রজে,—সর্বাগ্রে চলেছেন—আমাদের পিতৃদেব ননু—পিতামহী,—সংসারের সর্বজ্যেষ্ঠা কর্ত্রী,—হেঁটে—একটা গরুর লেজ ধরে! সে-অভিনব দৃশ্য এখনও চোখের উপর ভাসছে।

ঠাকুমা সম্পর্কে আমার আরও যেটুকু স্মৃতি আছে,—তারও কিছু ছবি এখানে দিই। তবে তার আগে তাঁর সম্বন্ধে পরোক্ষে জানা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও বউবাজারের মলাঙ্গা লেনের এক বাসাবাড়িতে থাকেন তখনই তাঁর বিবাহ হয়। জগৎতারিণী ছিলেন উত্তর কলকাতার কাঁসারীপাড়া নিবাসী হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। তাঁর বয়স তখন আনুমানিক বারো-তেরো বছর। সেই বাসাবাড়িতে একই সঙ্গে থাকতেন প্রসন্নকুমার বসু (১৮৪১-১৯২৯)—গঙ্গাপ্রসাদের এক সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রসন্নকুমারের এক কনিষ্ঠ সহোদর—মন্মথকুমারও (১৮৪৮-১৯২৪) কিছুকাল সেই বাসাতে একসঙ্গে বসবাস করেন। তিনি তাঁর "স্মৃতিকথা" পুস্তকে বর্ণনা করেছেন ঃ

"গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে এক বাসায় থাকিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ দাদার সহপাঠী, একত্র ১৮৬১ সালে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও তিনি Medical College-এ প্রবেশ করেন। তাঁহার মত সদাশয় নীতিপরায়ণ লোক দেশেঁ অতি বিরল। অতি মিষ্টভাষী ও অস্বার্থপর, তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত। ঐ সময়ে তিনি বিবাহ করিলেন ও কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীকেও ঐ বাসায় আনিলেন। শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রী। তাঁহাকে আমি পড়াইতাম। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন না, কিন্তু অতি সরলপ্রকৃতি, কোনরূপ কপটতা তাঁহার মনে আসিত না। হিন্দুয়ানীর কুসংস্কার-গুলির উপর গঙ্গাপ্রসাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। স্ত্রীও স্বামীর সম্পূর্ণ সহধর্মিণী। তিনি গৃহস্থালি কার্য জানিতেন না। যেদিন পাচক অনুপস্থিত হইত আমরা রাঁধিতাম। কাহারও ব্যারাম হইলে তিনি মাতার ন্যায় শুশ্রূষা করিতেন। আমাদের খোস হইয়াছিল, তিনি প্রত্যহ সকালে গরম জল ও ছুঁচ লইয়া আসিয়া আমাদের স্ফোটকগুলি পরিষ্কার করিতে বসিতেন। আমার এক রোগ ছিল, আমি স্ত্রীলোকের স্পর্শ সহিতে পারিতাম না, এজন্য আমি নিজে পরিষ্কার করিতাম, কিন্তু অন্য ভ্রাতাদের খোস তিনি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতেন। গরমের সময় স্কুল হইতে আসিলে একখানা পাখা হাতে উপস্থিত হইতেন ও বাতাস করিতেন। একবার আমার পানিবসন্ত হইয়া প্রায় ১৫ দিন শয্যাগত ছিলাম। তিনি সমস্ত দিবস আমার নিকটে বসিয়া গল্প করিতেন ও আমার পথ্য প্রস্তুত করিতেন। তিনি আমার সমবয়স্কা ছিলেন বোধ হয়। তথাপি তিনি তখন যুবতী, আমি বালক। আমার সকল ভ্রাতাদের সহিত ঐরূপ মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তাহা যে কিছু অসামাজিক বা নিয়মবিরুদ্ধ এরূপ ভাব তাঁহার কখনই মনে হইত

না। তাহার অনেকদিন পরে আমি যখন যুবা হইয়াছি তখনও তাঁহার গৃহে গেলে সেইরূপ বাল্যকালের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তখন আমার কেমন সঙ্কোচ হইত, কিন্তু তাঁহার হইত না।

ইহার বহুদিন পরে যখন আমাদের গৃহের মহিলাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তিনি কখনও কখনও কৃষ্ণনগরে আসিয়া দাদার গৃহে কিছুদিন প্রবাস করিতেন। আমি তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিতাম, তাহা শুনিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বলিতেন—তাঁহার লজ্জা-সরম নাই, সাংসারিক কোন কাজ করিতে পারেন না, তাঁহার আবার প্রশংসা কি? কিন্তু তাঁহার সরলতার জন্য সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহারা প্রশংসা করুন আর নাই করুন এই চিরবালচিত্ত মহিলারই পুত্র বাঙ্গালাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান পণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ধীর ও প্রবলচিত্তের লোক ছিলেন। কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম Religion বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা, কর্তব্যজ্ঞানে কঠোর আবার অত্যন্ত সদয় ও অস্বার্থপর।"

পরবর্তীকালে গঙ্গাপ্রসাদ যখন ডাক্তারি পেশা শুরু করেন এবং ভবানীপুরে রসা রোডে (অধুনা আশুতোষ মুখার্জি রোড্-এ) নিজ বাসভবন নির্মাণ করান, সে-সময়কারও কিছু কিছু বিবরণ ঐ "স্মৃতিকথায়" পাওয়া যায়, যেমন,—"ব্যারাম হইলে আমি অথবা ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেন। *আমার কনিষ্ঠ সহোদর* কেশব B.L পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে ২।৩ মাস মাতার সহিত বাস করিয়াছিল। তিনি ও তাঁহার সহধর্মিণী যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এই দম্পতির কথা উঠিলে মনে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয় তাহা সমস্ত প্রকাশ করিয়া ওঠা দুঃসাধ্য।"

আবার অন্যত্র লেখা,—গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদের "স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীও আমার নিকট কিছুদিন পড়িয়াছিলেন।···তিনি ও শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী বয়স্থা হইয়া যখন সন্তানাদি হইয়াছে তখনও এক পণ্ডিতের নিকট পড়িতেন। স্ত্রীদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে দুই ভ্রাতারই বিশেষ যত্ন ছিল।

ঠাকুমাকে আমিও কখনও সাংসারিক কাজকর্ম করতে দেখি নি। তাঁর তখন বৃদ্ধাবস্থা। বৈধব্যজীবন। তৎকালীন হিন্দু বিধবার বেশ। পরনে থান কাপড়। খালি গা। পুরুষদের মতন মাথায় ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুল—কদমফুলের মত। স্থূলাঙ্গী, বাতগ্রস্ত দেহ। থপ্‌থপে ভাব। ফর্সা রঙ্। বড় বড় চোখ। প্রশস্ত উঁচু কপাল—বিরলকেশ মাথায় আরও চওড়া দেখাত। সামনের দাঁত একটু উঁচু। তাঁর মনের সরলতা যেন উথলে পড়ত তাঁর হাসিতে। হাসতেন প্রাণ খুলে—উচ্চ শব্দ তুলে। আমি ছিলাম ছেলেবেলায় রোগা লিক্‌লিকে। পাঁচ বছর বয়সে গুরুতর টাইফয়েড্ রোগে ভুগেছি। (এলাহাবাদ থেকে ডাক্তার অবিনাশ ব্যানার্জি,—মেজদার ডায়েরীতে তাঁর নাম উল্লেখ আছে,—এসেছিলেন চিকিৎসা করতে।) কী

কারণে জানি না, আমার গলায় ছিল এক মাদুলি। ঠাকুমার কাছে প্রতিবেশিনী কয়েকজন মহিলা প্রায়ই দুপুরে আসতেন—"গুরুমশায়ের বৌ", "অমূল্যর মা", "হরেনের ঠাকুমা", স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ির মহিলারা প্রভৃতি। তাঁরা মজলিস জমিয়ে গল্প করতেন। কখন কখন তাস খেলার আসরও বসত। বিন্তি খেলা। মেজদা এদিকে কখনও ঘেঁষতেন না, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে যেতাম। কাছে গেলেই ঠাকুমা আমাকে খেপাতেন ছড়া কেটে,—"বিজনবালা কণ্ঠমালা গলায় মাদুলি, বিজু আমাদের পাড়া-কুঁদুলী।" (বিজয়াদশমীর দিন আমার জন্ম, তাই ডাকনাম রাখা হয়—বিজু)। আমিও তখনি হাততালি দিয়ে তাঁদের আসর ঘিরে ঘিরে পাক দিতাম আর বলতাম "ঠাকুমাবালা কণ্ঠমালা, হাতে মাদুলি, ঠাকুমা আমাদের পাড়া-কুঁদুলী!" (ঠাকুমারও ওপর-হাতে একটা মাদুলি ছিল);—আর ঠাকুমারও তখনি শুরু হোত হো হো করে উচ্চৈঃস্বরে হাসি।—এখনও সেই হাসির রেশ যেন কানে বাজে।

ঠাকুমার স্তন দুটি ছিল পয়স্বিনী গাভীর মতন মস্ত বড়। ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলতাম, ঠাকুমা, তোমার বুকে যেন দুটো ঝোলা লুকিয়ে রেখেছ! —তিনি হেসে বলতেন, বটে! তোর বাবাকে কোলে শুইয়ে এই খাইয়েই অতো বড় করিয়েছি, জানিস?—আমি বিশ্বাস করতাম না। বলতাম, হোতেই পারে না, বাবা বুঝি কখনো ছোট্ট ছিলেন? তোমার কোলে উঠেছিলেন? তুমি ঠাট্টা করছ। আমি রাগ করতাম। ঠাকুমা হো-হো করে হেসে উঠতেন। বলতেন, জিজ্ঞেস করিস্ তোর বাবাকে!

স্বপ্নে দেখা ঘটনার মত অস্পষ্ট এই মধুর স্মৃতিচিত্র মানসপটে এখনও ভেসে ওঠে।

ঠাকুমার আর এক দৃশ্যও খুব মনে পড়ে। প্রায় সারা সকাল ধরে তাঁর পায়-খানায় যাওয়া-আসা। সেকালে বাড়ির ভিতরে শোওয়ার ঘরের নিকটে শৌচাগার রাখার প্রথা ছিল না। ছাদের এক কোণে তৈরি হোত। ঠাকুমা দোতলায় যে-ঘরে থাকতেন, সেখান থেকে ভিতরের দালানে বার হয়ে—একতলায় নামবার সিঁড়ি—তারই পাশে চাতাল পেরিয়ে ছাদ। ঠাকুমা খাটো একটা কাপড় পরে পায়খানায় যেতেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সেই সিঁড়ির চাতালে রেলিঙ-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আবার খানিক পরে পায়খানায় যেতেন। ফিরে এসে আবার সেইভাবে রেলিঙ্-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। তারপর আবার পায়খানা যাওয়া, ফিরে আসা ও দাঁড়ানো,—এইভাবেই ঘণ্টা দেড় দুই তাঁর কাটতো। সেই রেলিঙ ধরে দাঁড়ানোয় নীচে একতলায় অন্দরমহলের দালানে কোথায় কি হচ্ছে, কখন কে এল, গেল,—সেই সবই দেখতেন। এটা ছিল যেন তাঁর 'ওয়াচ্-টাওয়ার'—পর্য-বেক্ষণ মিনার। কিন্তু, সারাক্ষণই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন তা নয়। কখন কখন নীচের দালানে কাউকে ডেকে কথা বলতেন। না হলে, আপন মনে মন্ত্র-জপার মত কী যেন বিড়বিড় করতেন ও তারই মাঝে নিজের মনেই খুব হাসতেন। আমার

দেখতে বেশ মজা লাগত। জিজ্ঞাসা করতাম, ঠাকুমা! আপনমনে কি বকছ? অতো হাসছ কেন?

ঠাকুমার এই এতো হাসির অন্তরালে যে তাঁর শোকদগ্ধ জীবনের গভীর ক্ষতের জ্বালা লুকান ছিল, তা শুনি অনেক পরে, বড় হয়ে, মায়ের কাছে।

ঠাকুমার জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃদেব। জন্ম ১৮৬৪ সালে। বউবাজারে মলাঙ্গা লেনের সেই বাসাবাড়িতে। দু'বছর পরে ১৮৬৬ সালে জন্ম হয় তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের। হেমন্তকুমারের। তাঁর ডাকনাম ছিল "বঁকি"। কাকাবাবুকে আমরা দেখি নি। অল্পবয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়,—১৮৮৭ সালে। একুশ বছর বয়সে। তিনি তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। ফল প্রকাশিত হয় নি। মৃত্যুর পরই "রেজাল্ট" বার হয়। তখন জানা যায়, ফিলসফি অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মেধাবী মৃতপুত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার চারশত টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি দান করেন। "হেমন্তকুমার স্বর্ণপদক" বি. এ. ফিলসফি (Mental & Moral Science) অনার্স পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্রকে এখনও প্রতি বছর পারিতোষিক দেওয়া হয়। হেমন্তকুমারের হাতে-লেখা কলেজের কয়েকটি খাতাপত্র এখনও বাড়িতে রয়েছে। আর দেখেছি, ঐ রসা রোডের পুরানো পৈতৃক বাড়িতে (যেখানে আমাদের ভাইবোনদেরও জন্ম)—তারই দুতলার একটা ছোট ঘরে—পরে আমাদের আমলে যার নামকরণ হয় 'চায়ের ঘর'—সেখানকার শার্সির একটা কাঁচের গায়ে যেন হীরে দিয়ে কাটা,—সুন্দর ইংরেজি হরফে তাঁর নিজের নাম উৎকীর্ণ করা। মায়ের কাছে শুনেছি, কাকাবাবু বাবার মতন গম্ভীর প্রকৃতির ভারিক্কি চাল-চলনের ছিলেন না। মা, পিসীমাদের কাছে নানান কৌতুকময় কথা, গল্প বলে খুব হাসতেন। মা অবশ্য তখন নববধূ। তাঁর বিবাহের তিন বছরের মধ্যেই কাকাবাবুর মৃত্যু,—টাইফয়েড রোগে,—কয়দিনের অসুখেই।

পুত্রের এই অকাল মৃত্যুজনিত শোক ঠাকুমার জীবনে নিদারুণরূপে আঘাত হানার এক সকরুণ কাহিনী আছে। কাকাবাবুর মৃত্যুর বছর তিনেক আগে তিনি গাজীপুরে তাঁর জেঠামহাশয়ের নিকট গিয়ে কয়েকদিন ছিলেন। কাকাবাবু মাঝে মাঝে Somnambulism—স্বপ্নচারিতায় আক্রান্ত হোতেন—সাধারণ ভাষায় যা কেবলা হয় "নিশি পাওয়া"। এক রাত্রে সেখানে তিনি ঘুমের ঘোরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। যখন তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসে তখন দেখেন, এক বনের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সুমুখে তাঁরই দুই কাঁধে দু হাত রেখে ঝাঁকানি দিচ্ছেন ও তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন—জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী! সেই মহাত্মা তখন তাঁকে সস্নেহে বলেন, শহর ছেড়ে এই গভীর রাত্তিরে কোথায় এই বনের মধ্যে চলে এসেছ! চল, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। তিনি সঙ্গে করে সেইমত দিয়েও যান। কিন্তু, পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার আগে কাকাবাবুকে জানান, দেখতে

পাচ্ছি, তোমার অমুক সময়ে মৃত্যুযোগ রয়েছে, তোমার মাকে বোলো—এই নিয়মগুলি পালন করতে ও এইটি ধারণ করতে,—তাহলে তোমার ফাঁড়া কেটে যাবে। বলে কয়েকটি নির্দেশ দেন।

কাকাবাবু সে কথা ঠাকুমাকে জানান। কিন্তু, নিয়তির গতি, সে-সময়ে এ-সব প্রকরণে তাঁদের বিশ্বাস না থাকায় নির্দেশগুলি পালিত হয় নি। সন্ন্যাসীর অবধারিত সময়ে কাকাবাবুর টাইফয়েড্ রোগে মৃত্যুও ঘটে।

সন্তানহারা জননীর বুকে এই মৃত্যুশোক যে সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ হয়ে আজীবন বিঁধে থাকবে,—আশ্চর্য কী!

শুধু এই পুত্রশোকই নয়। কাকাবাবুর মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যেই তাঁর বৈধব্য ঘটে,—গঙ্গাপ্রসাদ পরলোকগমন করেন। গঙ্গাপ্রসাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ধারণা হয়, সন্তানের অকালমৃত্যুর সঙ্গোপিত গভীর শোকের আঘাতের ফলেই তাঁরও এই জীবন অবসান।

ঠাকুমার আর এক সন্তানের জন্ম ১৮৭৪ সালে। একমাত্র কন্যা—হেমলতার। সেই কন্যারও মৃত্যু হয় ১৯০৩ সালে। ঊনত্রিশ বছর বয়সে।

সেই শোকতাপদগ্ধা সংসারে বীতরাগা পিতামহীকে আমার দেখা তাঁর শেষ বয়সে। যেন, বাজপড়া বিরাট মহীরুহ, কোনমতে তখনও পৃথিবীর মাটির বুকে দাঁড়িয়ে, অথচ, তখনও দু'একটা ডালে কোথাও সবুজ পাতা। সংসারে থেকেও সংসার-ছাড়া। আপন মনেই হাসতে থাকা, আপন মনে কথা বলা।

এই জননীর প্রতি পিতৃদেবের অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। তারই একটা কাহিনীর প্রচার আছে,—পরাধীন ভারতে বৃটিশরাজের প্রতিনিধি অসীম ক্ষমতাপন্ন ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল তাঁকে বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব করলেও মাতার অনুমতি না থাকায় মাতৃ-আজ্ঞাই পালন।

মধুপুরের গৃহপ্রবেশের শুভানুষ্ঠানেও তাই আমরাও দেখি, সর্বাগ্রে চলেছেন আমাদের সেই পিতামহী—জগৎতারিণী। মেজদার ডায়েরীতেও তারই বর্ণনা পাই। সে-ঘটনা ১৯১২ সালে—বঙ্গাব্দ ২৯শে কার্তিক ১৩১৯। সেই উৎসব উপলক্ষে পিতৃদেবের "কতিপয় বন্ধু" একটি কবিতা রচনা করে ছাপিয়ে বিতরণ করেন। আমার ধারণা, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধুপুরে বহুবার এসে একসঙ্গে থেকেছেন। একবার কাশীতে আমরা থাকাকালীন তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি সরস ঘটনা মেজদা ডায়েরীতে লিখেছেন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে রচিত কবিতাটি আমাদের কণ্ঠস্থ ছিল। মধুপুরের বাড়ির সম্মুখভাগে বিশাল চাতালের দুই প্রান্তে পিঠ হেলান দিয়ে আরাম করে বসবার মার্বেল পাথরে গাঁথা লম্বালম্বি "সীট"। বাবা বিকালে বেড়িয়ে এসে সেই "সীট"-এর এক প্রান্তে বসতেন। অতিথি অভ্যাগতরা সারি সারি অপর অংশ জুড়ে বিরাজ করতেন। সান্ধ্য মজলিশ জমজম করত পিতৃদেবের প্রদীপ্ত প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে। আমাদের—অর্থাৎ তখনকার বালকদের

ডাক পড়ত,—তাঁদের সম্মুখে আবৃত্তি করার জন্য। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমরা বিবিধ স্তব, কবিতা আবৃত্তি করতাম। ডায়েরীতে তারও উল্লেখ রয়েছে। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে রচিত কবিতাটিও সমবেত কণ্ঠে সুর করে শোনান হোত। সেই কবিতা বাঁধিয়ে এখনও মধুপুরের বাড়িতে টাঙানো রয়েছে।

আবার মেজদার কথায় ফিরে আসি।

তিনি যখন এম্. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২২ সালে, ১৬ই এপ্রিল। আমার মেজবৌদিদি হলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী, ডাক্তার বেণীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা,—সুধা দেবী। বিবাহের আনন্দোৎসবে আমাদের গৃহ মুখরিত হয়েছিল। ভবানীপুর থেকে উত্তর কলিকাতায় নিমতলা স্ট্রীট্এ বিবাহ-বাসরে যোগ দিতে বরযাত্রী দল চলেন রিসার্ভ করা ট্রাম গাড়িতে। বাবাও যান্ তাইতে উঠে—নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে নিয়ে। সেই একবারই তাঁকে ট্রামে উঠতে দেখেছি!

ইউনিভার্সিটি পরীক্ষাগুলিতে মেজদার কৃতিত্বেরও এখানে উল্লেখ করি।

১৯১৯ সালে আই-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ সালে বি. এ.তে ইংরেজি অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে শীর্ষস্থান লাভ করেন। আই-এ ও বি-এ দুই পরীক্ষাতেই বাঙলাতেও প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক পারিতোষিক পান। বাঙলাসাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। মাত্র তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিতে এম্-এ পরীক্ষাগ্রহণের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। মেজদাও ১৯২৩ সালে বাঙলাভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দিলেন। তাতেও শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সেই পরীক্ষায় দুই-"পেপার"-এর পরিবর্তে তিনি যে 'থিসিস্"—মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন তা ছিল গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি সম্বন্ধে—The social plays of Girishchandra।

এরই কিছু আগে ১৯২২ সালে আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীরমাপ্রসাদ ও মেজদার আগ্রহে ও উৎসাহে বাড়ি থেকে মাসিক "বঙ্গবাণী" সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। সাহিত্যজগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রও গ্রথিত হোল। পিতৃদেবেরও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সক্রিয় অনুপ্রেরণা ছিল।

এমনি সময়ে আমাদের সুখময় সংসারে মৃত্যুর বিষাদঘন ছায়াপাত হয়।

১৯২৩ সাল। আমাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। মাতাপিতার তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। পরম আদরিণী, অথচ আবাল্য দুঃখিনী। জ্যোতির্ময়ী দেবীস্বরূপা ছিলেন তিনি আমাদের সংসারে। তাঁরই স্নেহছায়াতলে হাতে-গড়া আমাদের ভাই-বোনদের শৈশব ও বাল্যজীবন। ডালপালা ছড়ানো স্নিগ্ধ তরুতলে যেন ক্ষুদ্র চারাগুলি। তিনি ছিলেন বাবার চোখের মণি। সবচেয়ে আদরের সন্তান। জন্ম তাঁর ১৮৯৫ সালে ১৮ই এপ্রিল। মাত্র নয় বছর বয়সে ১৯০৪ সালে তাঁর বিবাহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এক বছর পরেই ১৯০৫ সালে তিনি বিধবা হন্।

প্রতিবেশী উকিল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর এক ডায়েরীতে দেখা যায় শুভেন্দুসুন্দরের মৃত্যুদিবসে বাবার সঙ্গে গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে বাবা দৃঢ়কণ্ঠে স্বগত মন্তব্য করেন, আমার এই মেয়ের বিধবা বিবাহ দেবই।

সেইমত পুনরায় বিবাহ দেনও। ১৯০৮ সালে। বিবাহ হয় হাইকোর্টের উকিল যোগীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে। পরের বছরেই ১৯০৯ সালে দিদি আবার বিধবা হলেন। সেই দিদিই ছিলেন তাঁর ঐ অল্প বয়সেই আমাদের গৃহকর্ত্রী। মাতৃস্থানীয়া। বৃহৎ সংসারক্ষেত্রের একটি তৃণ-মাত্রও যেন এদিক ওদিক হেলতো না তাঁর অনুমতি ব্যতীত। মেজদার ডায়েরীতেও এর উল্লেখ আছে।

দিদি ছিলেন অশেষ রূপলাবণ্যময়ী। ঐ বালিকা বয়স থেকেই সাজ-সজ্জাহীনা, —পরিধানে অতিসরু-কালো-নরুনপেড়ে—যেন থান ধুতি। নিরলঙ্কার বিধবার সাজ। একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস। শুচিশুভ্র স্বর্ণকমলের মত ছিল তাঁর কান্তি। নামই ছিল তাঁর কমলা। সারাবাড়ি আলোকিত করে বিরাজ করতেন—তুলসীমঞ্চে নিবাতনিষ্কম্প দীপ্ত দীপশিখার মত। সংসারের সব কাজ তাঁর নখদর্পণে। সারাদিন অবিশ্রাম কর্মরতা। সংসার পরিচালনার কর্মভার ছাড়াও তাঁর সেলাই-এর কল ছিল। হাতে ও পায়ে চালানো—দুই রকমেরই। আমাদের জামা, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি চমৎকার সেলাই করতেন। নিখুঁত সূচীকর্ম। মনে পড়ে, একবার কলের সূঁচে তার হাতের বুড়ো আঙুল দৈবাৎ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বিঁধে যায়। ডাক্তার এসে আঙুলে বেঁধা সেই ভাঙা সূঁচ বার করেন। ধবধবে ফর্সা আঙুলে সে কি লাল রক্তের ধারা! অথচ, দিদির ঘোমটা-টানা মুখে কাতরোক্তি নেই। অসীম সহিষ্ণুতার প্রশান্ত প্রতিমূর্তি!

দুপুরে অবসর-সময়েও বিশ্রাম নিতেন না,—হয় সেলাই, অথবা বই-পড়া। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করে আমাদের শোনাতেন। নিজেও কবিতা রচনা করতে পারতেন। সেকালে বাঙালীর ঘরে ঘরে বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ছাপানোর প্রথা ও উৎসাহ ছিল। আত্মীয়, পরিচিত অনেকে এসে দিদিকে দিয়েই সেইসব কবিতা লিখিয়ে নিয়ে যেতেন,—আমাদের বাড়িতে বিবাহ উৎসবে নিজে লিখে আমাদের নাম দিয়ে ছাপাতেন। ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! বহির্জগতে অপরের অক্লান্ত নিঃস্বার্থ সেবাযত্ন, তাদের আনন্দের খোরাক যোগান, অথচ আবাল্য নিরানন্দ তাঁর আপন আভ্যন্তরীণ বৈধব্য জীবন!

সেই দিদিকে কী চোখে দেখতাম তারই এক ছোট্ট ঘটনা বলি।

ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেছি। কয়মাস পরে প্রথম ক'মাসের স্কলারশিপের টাকা একসঙ্গে পেলাম। আমার ক্ষুদ্র জীবনের প্রথম উপার্জন। বাড়ি এসেই সোজা অন্দরমহলে চলি দিদির খোঁজে। দেখি ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে তিনি রান্নাঘরের দিকে চলেছেন কাজে। দরজার কাছে দেখা। পথ রোধ করে

বলি, দাঁড়াও একটু। হেঁট হয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করি। তিনি আশ্চর্য হন। বলেন, কী ব্যাপার? হঠাৎ প্রণাম?

উঠে দাঁড়িয়ে বলি, হাত পাতো।—টাকাগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বলি, ধরো,—এই আমার প্রথম রোজগার:

দিদির সেই টুকটুকে গোলাপী গাল দুটি আরও লাল হয়ে ওঠে। অশ্রুভরা আয়ত নয়ন দুটি ছলছল করে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেন, আমাকে কেন? এ বাবা-মাকে দিও, ভাই!

আমি জানাই, না,—আমার পাওয়া এ-টাকা আমার দিদি নেবে!

দিদি হাত বাড়িয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে অঙ্গুলি স্বীয় অধরে ঠেকান। গাল বেয়ে তাঁর অশ্রুধারা নামে। যেন, কুহেলিকাচ্ছন্ন ম্লান প্রভাতে সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ি বেয়ে শিশিরবিন্দু ঝরে।

এমনি ছিলেন সেই দিদি আমাদের কাছে। তাঁর ডাকনাম ছিল রাণী। মা ডাকতেন রাণু, আর বাবা ডাকতেন 'আমার রাণী-মা'!

১৯২৩ সালের ৫ই জানুয়ারি হঠাৎ পাঁচ দিনের অসুখে দিদি চিরতরে চলে গেলেন। বয়স তখন তাঁর আঠাশ বছর। আলোকিত গৃহে অকস্মাৎ দীপ যেন নিভে গেল। সে কী নিশ্ছিদ্র গভীর অন্ধকার! আমাদের জীবনের সেই প্রথম মর্মান্তিক মৃত্যুশোক!

দিদির মৃত্যুর পরবৎসরই—১৯২৪ সালে—পিতৃদেবেরও তিরোধান। পাটনা শহরে। বজ্রপাতের মতনই আকস্মিক।

মেজদার ডায়েরীতে এই সব ঘটনারও সকরুণ বর্ণনা রয়েছে।

এরপরই তাঁর জীবনধারারও বিপুল পরিবর্তন।

ডায়েরীতে দেখা যায়, মেজদার ছাত্রাবস্থাতেই বাবা তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, বিধিবিধান, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে কথাবার্তা ও আলোচনা করতেন। সেইসময়কার চিঠিপত্র এখনও যে কয়েকটি পাওয়া যায়, সেগুলিও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়।

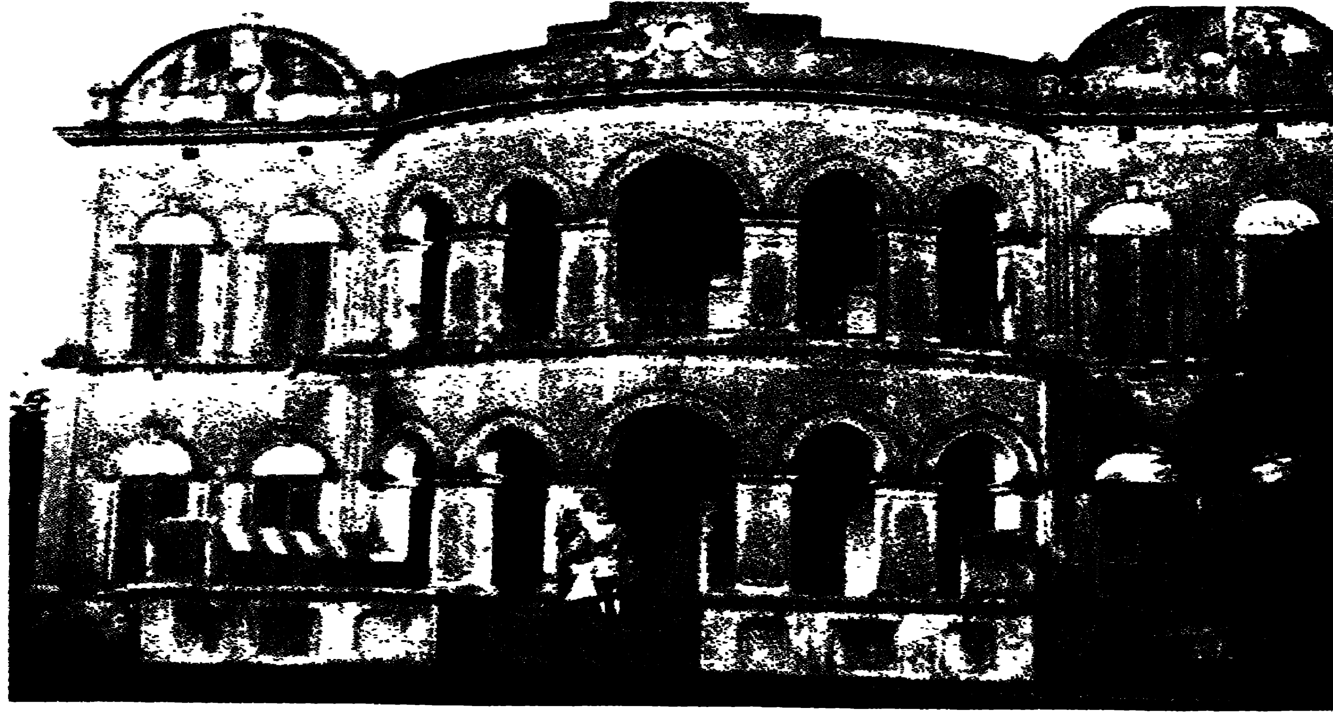
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন স্নাতকোত্তর—পোস্টগ্রাজুয়েট—শিক্ষাপ্রদানের ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার ও প্রকৃত বিস্তারের প্রবর্তন চলেছে। কেবলমাত্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেই নয়, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, চীন, তিব্বত, পারস্য প্রভৃতি দেশদেশান্তর থেকেও মনীষীবৃন্দ এখানে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেছেন। এমনি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণের জন্য বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ পেল। বৃটিশদের ধামাধরা দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিও সেই অপচেষ্টায় তৎপর হোলেন। ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকায়—এমন কি বিলাতের টাইমস্ পত্রিকাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলতে লাগল।

মেজদার পুরানো চিঠিপত্র ও মুসাবিদার বাণ্ডিলের মধ্যে এখনও কয়েকটি কাগজ দেখি, দেশে ও বিলাতে শিক্ষাজগতে ভারত-হিতৈষী কয়েকজন অধ্যাপক ও



[illegible]

[illegible]



মধুপুরের বাড়ি

বিদ্বজ্জনের নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে মেজদা পত্র লিখছেন সেই ছাত্রাবস্থাতেই। অবশ্য পিতৃদেবের পরামর্শ নিয়ে, এবং হয়ত, নির্দেশ অনুযায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অটুট স্বাধীনতা ও অম্লান মর্যাদা সংরক্ষণের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান এগুলি।

মেজদার প্রতিভা যাতে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সর্বতোমুখী হয়ে বিকশিত হয়,—সেদিকে পিতৃদেবের দৃষ্টি ছিল। বিখ্যাত Capital পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক Pat Lovett-এর নিকট মেজদাকে তিনি পাঠিয়ে দেন, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ রচনাশৈলীর উৎকর্ষ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে Pat Lovett-এর এই চিঠিখানি রয়েছে ঃ

Harold's Cross
33 Theatre Road

My dear Sir Asutosh, 23. 7. 23.

I was glad to meet your son yesterday and have a long chat. He is a charming young fellow who immediately conquered my sympathy. He has a worthy journalistic ambition which I will do my best to encourage. I have suggested a beginning in telling an ignorant public unofficially what is the Post Graduate system, how it is organised by whom worked. It would be of the greatest interst to readers of "Capital" who hardly appreciate the crux of the recent controversy. I wish you will approve my plan.

Yours sincerely
Pat Lovett

এ চিঠি পেয়ে পিতৃদেব যে উত্তর পাঠান তারও প্রতিলিপিখানি রয়েছে ঃ

77 Russa Road, North
Calcutta
July 25th 1923

My dear Mr. Lovett,

I am much obliged to you for your kind note. My son was giving me a glowing account of his interview with you. He has the making of a man in him and I am convinced he will benefit very largely by your kind guidance.

Believe me
Yours sincerely
A. M.

এর পরে Capital পত্রিকায় Ditcher's Diary সম্পাদকীয় স্তম্ভে মেজদার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়।

ডায়েরীতে মেজদা লিখেছেন, বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুর পর "১৯২৪ সালে ২৫শে মে থেকে জীবনের গতি সব পরিবর্তন হয়ে গেল। এক রাত্রের মধ্যে সব চাপল্য খেলাধূলো যেন শেষ হয়ে গেল। নতুন জীবনের অধ্যায় আরম্ভ হল।" তদবধি কর্মজীবনের গুরুদায়িত্ববোধ তাঁকে অধিকতর গুরুগম্ভীর করে তোলে। তখন তাঁর বয়স ২৩ বছর মাত্র। এম্‌ এ ও ল' পাশ করেছেন। সবে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করছেন। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন, এবং পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যও নির্বাচিত হলেন।

এরই দু'বছর পরে ১৯২৬ সালে তাঁর বিলাত যাওয়া ও ব্যারিস্টারী পাশ করে আসা।

কিন্তু, ভাগ্যবিধাতা যেন সংসার ক্ষেত্র থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে সর্বত্যাগীরূপে দেশের ও দশের কাছে আত্মনিয়োগের জন্যই তাঁর পারিবারিক জীবনে আবার অকস্মাৎ মৃত্যুবাণ হানেন। ১৯৩৩ সালে হঠাৎই তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। এখনও মনে আছে, সেই রাত্রে শ্মশানঘাটে আমরা পাশাপাশি বসে,—চিতার উপর শায়িত সেই লক্ষ্মীপ্রতিম মরদেহ। সিঁথিভরা টকটকে লাল চওড়া সিঁদুর। নয় বছরের পুত্র মুখাগ্নি করেছে। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠছে। প্রস্তরমূর্তির মত মেজদা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে, নিষ্পলক চোখে সেদিকে চেয়ে। হঠাৎ কানে এল তাঁর অস্ফুট স্বগতোক্তি—"কী সর্বনাশই না হয়ে গেল!"

এইভাবে সর্বনাশের দুঃখধারার ভরা স্রোতে তাঁর জীবনতরী ভেসে চলে।

পক্ষান্তরে, পরের বছরেই—১৯৩৪ সালে—তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। বয়স তখন তাঁর মাত্র ৩৩ বছর।

শিক্ষাজগৎ ছাড়াও তিনি তখন ক্রমশঃ দেশের সেবায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রেও নামতে শুরু করেছেন। তাঁর বহুমুখী কর্মজীবনের প্রসঙ্গ লেখা আমার উদ্দেশ্য না হলেও প্রবন্ধের শেষভাগে তার সামান্য চুম্বকমাত্র দেওয়া হোল।

এখানে তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা দেখেছি তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করি। ডায়েরীর একস্থানে তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমার মন বড় চাপা।"

দীর্ঘাকার ভারী দেহ। সহজাত রাশভারী চালচলন। গাম্ভীর্যময় মুখমণ্ডল। শ্যামবর্ণ। দীপ্ত চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি। পৈতৃক সূত্রে লব্ধ অসামান্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। লোকে তাঁর উপস্থিতিতে সর্বদা সহজেই সচেতন হোতেন। বয়সে ছোটবড় নির্বিশেষে সবারই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপকবৃন্দের, মনস্বী দেশনেতাদেরও দেখেছি তাঁর সঙ্গে সমীহ করে বাক্যালাপ করতে, তাঁর কর্মনিষ্ঠার উপর আস্থা রেখে নির্ভর করতে। পুরনো চিঠিপত্রের মধ্যে মেজদাকে

লেখা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কয়েকটা চিঠি রয়েছে। দুখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত করি। প্রথমটির তারিখ—৬.২.১৯২৫। অর্থাৎ পিতৃদেবের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে। মেজদার বয়স তখন মাত্র ২৪ বছর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজ থেকে লিখছেন:

University College of Science and Technology
Department of Chemistry
92, Upper Circular Road
Calcutta, 6.2.1925

Private

My dear Shyamaprasad,

আমি College of Science-এ প্রধানতঃ Inorganic Chemistry-র অনুশীলন করি। এই বিভাগে প্রিয়দা ও পুলিনবিহারী Lecturer। আমাদের বিভাগে এবং Organic Chemistry বিভাগেও measurement of crystals অনেক সময় অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি Goniometer-এর অভাবে কোন কাজ সম্ভব নহে। Presidency College-এতেও ঐ apparatus নাই। আমি এখন Geological Dept. হইতে মাঝে মাঝে crystal measurement করাইয়া লইতেছি কিন্তু তাহাদের এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিতে লজ্জা বোধ হয়। বিশেষতঃ Geological Dept-এর Mr. Wadia বৎসরে ৬ মাসের অধিক Tour-এ থাকেন। যাহা হউক এত বড় College of Science-এ যাহা Half a crore represent করে তাহাতে একটি Goniometer-এর অভাবে আমি শেষ জীবনে কার্যের অসুবিধা ও অসম্পূর্ণতা ভোগ করিব ইহা উচিত হয় না। University-র সাধারণ কাজে তুমি দেখিতেছি "বাপকা বেটা" হইয়াছ। কেন না এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজী নয়। কি প্রকারে কোন্ fund হইতে টাকা আসিবে আমি বুঝিটুঝি না। যেমন করিয়া হউক আশা করি টাকা যোগাড় করিয়া দিবে। আমি তারযোগে apparatus order দিতে চাই। অধিক আর কি লিখিব।

Yours Sincerely
P. C. Ray

দ্বিতীয় চিঠিখানিতে তারিখ নেই। ১৯২৫-২৬ সালেই লেখা। মেজদারই একটা চিঠির নীচে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বহস্তে উত্তর লেখা:

Private — Friday

My dear Sir,

আজ সিন্ডিকেটের মিটিঙ্-এ delegate নিযুক্ত করা হইবে। আপনি কি স্থির করিলেন? Science College-এর তরফ হইতে আপনার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সকল কথাই সেদিন বলিয়াছি—আর বলিবার কিছু নাই। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

Yours affly
Syama Prasad

নীল পেন্‌সিলে উত্তর লেখা—

Very well. I leave the matter to your judgement ; if you think it will do good, I am ready.

P. C. Ray

(খামের উপর মেজদার লেখা—Universities Congress held in Cambridge, July 1926)

সেই Universities Congress যে সময়ে কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত হয় মেজদাও তখন ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়ছেন এবং তিনিও সেই মহাসম্মেলনে—Conference of Universities of the British Empire-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

মেজদার গুরুগম্ভীর বহিরাবরণের অন্তরালে তাঁর অন্তঃকরণ ছিল অতি দরদী, কোমল, স্নেহপ্রবণ। সেই স্নিগ্ধস্বভাব মনোভাবের কখনও উচ্ছ্বাস প্রকটিত হোত না। তাঁর সংস্পর্শে এলে কথোপকথনে এবং আচরণে আন্তরিকতার, সহানুভূতির ও সম্প্রীতির মধুর স্পর্শ অনুভূত হোতো। যেন অয়স্কান্ত,—বাইরে চুম্বকশক্তির প্রকাশ নেই, নিকটে গেলেই আকর্ষণ করে।

অথচ, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর ছিল দুর্দমনীয় তেজো-দীপ্ত মনোভাব ও অসীম নির্ভীকতা। প্রয়োজনকালে সংঘর্ষে ও বাগ্‌বিতণ্ডায় বিজড়িত হতে কখনো বিমুখ হতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়লেশহীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ। তেমনি আবার, অন্যত্র সাধারণ শান্ত পরিবেশে পরিচিত অপরিচিত সবারই সঙ্গে আলাপন-আলোচনায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যময় অমায়িকতা। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বী কতো নেতাদের তাঁর কাছে আসতে দেখেছি। বন্ধুভাবেই তাঁদের সঙ্গে মিশতে দেখেছি। ডায়েরীতে তিনি নিজে লিখেছেনও, সবারই সঙ্গে মিলে-মিশে দেশের কাজ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মায়ের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর ভালবাসা ও ভক্তি। কিন্তু কখনও তাঁর উচ্ছ্বাস দেখি নি। বাড়ি ছেড়ে যখনি তাঁকে প্রবাসে কোথাও যেতে হোত,—সেখান থেকে সুযোগ পেলেই দূরপাল্লার টেলিফোনে প্রায়ই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, মায়ের সঙ্গে কথা বলে তৃপ্তি পেতেন। মাকে নিয়মিত পত্রও লিখতেন। ডায়েরীতে দেখা যাবে, মধুপুরে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় মা কীভাবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এদিকে পুত্রের কঠিন অসুখে মায়ের গভীর উদ্বেগ, অপর দিকে মায়ের দুশ্চিন্তা দেখে সন্তানের আক্ষেপ!

মেজদার পরোপকারী মন মানুষের বিপদে-আপদে, অভাবে-অনটনে সাহায্য করতে সর্বদাই উন্মুখ হোত। কতো ব্যক্তি কতো বিভিন্নপ্রকার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট আসতেন। তিনিও অকুণ্ঠভাবে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা করতেন। শত্রুমিত্র বাচবিচার থাকত না। একদিনের ঘটনা বলি।

বাড়িতে মেজদার অফিস-ঘরে উপস্থিত হলেন তখনকার বিধানসভার এক সভ্য। দুদিন আগেই মেজদার বিরুদ্ধে বিধানসভায় ব্যক্তিগত অন্যায় আক্রমণ করে তিনি এক অসত্য ভাষণ দিয়েছেন। তখন মেজদা সে সভার সভ্যও নন্। দৈনিক পত্রিকায় সেই বক্তৃতা প্রচারিত হয়েছে। সবাই পড়েছিও। সেই ব্যক্তি সশরীরে মেজদার কাছে সেদিন এসে হাজির। তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে নয়। সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু। কী এক ব্যাপারে কাকে যেন মেজদা অনুরোধ করলে বন্ধুটির এক কার্য-সিদ্ধি হয়—তারই সুপারিশে!

মেজদা তাঁদের বক্তব্য শুনে তখনি টেলিফোন করে কাজটি করেও দেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। মানুষ এত নির্লজ্জ হয়! দুদিন আগে যাঁর বিরুদ্ধে এমন কটু মিথ্যাভাষণ দিয়েছে, আজ অম্লানবদনে তাঁরই কাছে এসে হাসিমুখে সাহায্য ভিক্ষা চাইল! সেখানেই শেষ নয়। দুই বন্ধুতে তারপর ঘর ছেড়ে নীচে নেমে চলেছেন সিঁড়ি দিয়ে। আমিও যে তখন তাঁদেরই পিছনে যাচ্ছি, দেখেন নি। সেই ভদ্রলোক তখন তাঁর বন্ধুকে সদর্পে বলছেন, দেখ্‌লি শ্যামা-প্রসাদকে দিয়ে কেমন কাজটা করিয়ে নিয়ে এলাম!

আমি তখনি ফিরে আসি মেজদার কাছে। তাঁদের মন্তব্যটি বলে অনুযোগ করি, এ সব লোকের সাহায্য করো কেন?

দেখি, মেজদা নির্বিকার। হাসেন! শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলেন, লোকটি কী রকম তা আমি জানি। কিন্তু তাঁর বন্ধুটির সত্যিই সাহায্যের দরকার ছিল। একটা মানুষের উপকারটুকু তো করতে পারলাম!

কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবি, মানুষের অন্তরে কোথায় লুকিয়ে থাকে মহত্ত্ব! কী গুণে তিনি বড়,—আমার জ্যেষ্ঠ!

ডায়েরীর অংশবিশেষেও তাঁর এই মহৎ মনোভাব সুস্পষ্ট।

আর একবারের এক ছোট্ট ঘটনা।

আমার কাছে এক বন্ধু এলেন। কোন এক বিখ্যাত শিক্ষায়তনে তাঁর ছেলেকে ভর্তি করানোর ব্যাপারে মেজদা যদি সেখানকার অধ্যক্ষকে একটা সুপারিশ-পত্র দেন্। মেজদা তখন দিল্লী থেকে কাশ্মীর চলেছেন তাঁর সেই অন্তিম অভিযানে। সেই অবস্থায় তাঁকে এই সামান্য বিষয়ে লিখতে রাজি হই না! বন্ধুটি অগত্যা নিজেই লিখে তাঁকে অনুরোধ জানান। এর কয়েকদিন পরেই কাশ্মীরে বন্দী-দশায় মেজদার অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। বন্ধু আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, সজলচক্ষে গভীর সমবেদনা জানাতে। আর্দ্রকণ্ঠে বলেন, জানেন? আমার চিঠি পেয়েই অধ্যক্ষকে তিনি লিখেছিলেন! কালই ছেলের ভর্তি হওয়ার চিঠি এল। কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গে এ কী সর্বনাশা খবর! কী মানুষই আজ চলে গেলেন!

এই ধরণের তাঁর পরোপকারের বহু ঘটনা আছে।

কাজ করার ক্ষমতা ছিল মেজদার অফুরন্ত। সারাক্ষণই কর্মরত থাকতেন।

কোন কাজ পরে হবে বলে ফেলে রাখতেন না। নিয়মানুবর্তিতা ছিল কঠোর। সামান্য চিঠিপত্রেরও উত্তর দিতে অকারণ বিলম্ব করতেন না।

শিক্ষাজগতে ও রাজনীতিক্ষেত্রে ছাড়াও নানান্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে সেই ঘোর দুর্ভিক্ষের দুঃসময়ে, কলকাতায় রায়টের সেই ভয়াবহ দুর্দিনে এবং উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের এবং দৃঢ় নিপুণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায় তাঁর পুরনো কাগজপত্রের ফাইলের মধ্যে।

এইভাবে দেশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করায় তিনি বাড়িতে থাকার অবসর পেতেন কমই। আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মেলামেশার সুযোগ ও সময় হোত সকালে চায়ের টেবিলে। তাও প্রতিদিন নয়। জরুরী কাজের চাপ থাকলে বাইরে তাঁর বৈঠকখানায় বসে কাজ করার মধ্যেই কোনমতে প্রাতরাশ সেরে নিতেন। ঠিক চা খাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। চায়ে দুধ মেশানো নয়, দুধের মধ্যে চা-পাতা দিয়ে ফোটানো। অথবা, কখন শুধু চায়ের 'লিকারে' পাতিলেবুর রস নিঙড়ে পান। সকালে চায়ের টেবিলের আসরে তাঁকে পেলে হাস্য-পরিহাসে মজলিস জমতে থাকত। ঘটনাও ঘটত কতো কৌতুকাবহ। ভিন্ন পরিবেশে বাহ্য-গম্ভীর প্রকৃতি সেই ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সহজাত রহস্যপ্রিয়তা প্রকাশের সেইটুকু ছিল অবসর। যেন, বালুময় অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর বুকে কোথাও স্বচ্ছ জলের চিকন প্রভা।

দু-একটা ঘটনা বলি।

একদিন সকালে বারান্দায় চায়ের টেবিলে জমায়েত হতে এসে দেখা গেল,—পাশেই দোতলার ছাদ বেয়ে রাত্রে চোর এসেছিল, ছাদের দরজায় তার আগের দিন সন্ধ্যায় তালা লাগানো হয় নি। ভেতরের দালান থেকে কয়েকটা কাপড়চোপড় চুরি গিয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় তালা বন্ধ করার ভার দরোয়ানের ওপর। গাজীপুরের বাসিন্দা। নাম,—দেওকরণ দুবে। বহুকালের বিশ্বাসী লোক। দু-পুরুষ এ বাড়িতে চাকরি করছে। এককালে নিয়মিত ব্যায়াম ও কুস্তি করে বিশাল বপু, এখন শরীর-চর্চা ছেড়ে দেওয়ায় বিপুল ভুঁড়ি। মেজদা হাঁক দিয়ে তাকে ডাকেন। সিঁড়ি বেয়ে দেহভার নিয়ে হেলে-দুলে দোতলায় এসে সে দাঁড়ায়। মেজদা ধমক দিয়ে বলেন, কাল ছাতের দরজায় তালা লাগাও নি,—রাত্রে চোর ঢুকেছিল। সে অবাক হয়ে বলে, চোর! চোর উপ্‌পর আ্যায়াথা? কাঁহে আ্যায়াথা?

তার হাবভাব দেখে ও মন্তব্য শুনে সবাই হেসে ফেলি। মেজদা চাপা হাসি-মুখে বলেন, অ্যায়াথা তুম্‌হারা মুখ দেখ্‌নেকে লিয়ে,—আউর্ কিসি আস্‌তে!

সেই দেওকরণ দুবেকে নিয়ে বহু হাস্যকর গল্প লেখা যায়। কিন্তু এখানে এখন নয়।

অপর একদিনের আর এক ঘটনা। একটি চাকরকে নিয়ে।

যে ভৃত্যটি মেজদার কাজকর্ম করতো, সে দেশে গেল। নতুন আর একজন নিযুক্ত হোল।

মেজদার পায়ের চেটোর গাঁটের কাছে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হোত। তখন সেই জায়গায় রাত্রে 'আইওডেক্স্' মলম তিনি মালিশ করাতেন। সেদিন রাত্রে শোওয়ার সময় নতুন লোকটিকে বলেন, দেখ, এই শিশিটা থেকে আঙুলে একটু ওষুধ তুলে পায়ের এইখানটায় আস্তে আস্তে মালিশ করে দাও দিকি। আমি শুয়ে পড়ছি, হয়ত ঘুমিয়ে পড়ব। মালিশ করা শেষ হলে ধীরে ধীরে মশারিটা গুঁজে, আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেও।

সে মালিশ করতে শুরু করে। মেজদাও ক্লান্তদেহে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায় কীসের শব্দে। তাকিয়ে দেখেন ঘরের আলো নিভানো, দরজার কাছে আবছা আঁধারে কে যেন দাঁড়িয়ে খুটখাট করে দরজার খড়খড়ি নাড়ছে!

মেজদা চেঁচিয়ে প্রশ্ন করেন, কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

তখনি আজ্ঞাবহ বুদ্ধিমান ভৃত্যটির ভীতকণ্ঠে উত্তর শোনেন, আজ্ঞে আমি! আপনার আদেশমত মশারি গুঁজেছি, আলো নিবিয়েছি, দরজাও বন্ধ করেছি,—কিন্তু আমি যে বেরুতে পারছি না!

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে উচ্ছ্বসিত হাস্যমুখে মেজদা সেই কাহিনী শোনান।

মৃতদার নিঃসঙ্গ জীবন। ভৃত্য ও সেবক অনুচরের এমন কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের অভিজ্ঞতা প্রবাসেও তাঁকে বহুবার পেতে হয়েছে। সেই সব ঘটনা তিনি জমিয়ে বসে সরস গল্প করতেন। কিন্তু, বাইরের কর্মময় জগতে তিনি ক্রমশঃ এমনি লিপ্ত হয়ে পড়লেন যে গৃহজীবনের তাঁর সেসব আসর বিলীন হয়ে এল। এমন কি, বাড়ির লোকের সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলারও তাঁর আর সুযোগ ও অবসর হোত কমই। পরমপ্রিয় আপন পুত্র-কন্যা, অনন্তস্নেহময়ী জননী ও পরিজনবর্গের সঙ্গে তাঁর অন্তরের গভীর সংযোগ আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকলেও তিনি নিজেকে সাংসারিক পরিবেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই করে ফেলেন। আপন সুখ-দুঃখ ভুলে দেশের ও জনসাধারণের সেবায় এমনিভাবে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেন যে প্রত্যহ নিয়মিত আহার ও বিশ্রামও সম্ভবপর হোত না। অক্লান্ত অপরিসীম পরিশ্রমে দেহে রোগেরও আশ্রয় হোল।

মধুপুর আমাদের সকলেরই ভাল লাগে। বহুবিধ কাজের ফাঁকে মেজদাও কখনো কখনো সময় পেলেই চলে আসতেন মধুপুরে। তখন বিশ্রামলাভও হোত, তাঁর বাল্যকালের ছেলেমানুষী স্বভাবের দীর্ঘ সুপ্তিও যেন ভাঙতো। ছোটদের সঙ্গে আবার হইচই করে তাদের খেলাধূলায় যোগ দিতেন,—বাগানের মধ্যে তাদের ছোট বাই-সাইকেলে চড়ে বসে চালাতেন। ছেলেরা চেঁচাত,—নেমে পড় নেমে পড়,—ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে! তাদের ছোট্ট ক্রিকেট ব্যাট্ নিয়ে খেলতেন। বাগানের

প্রকাণ্ড মহুয়াগাছে টাঙানো দোলনায় বসে ডাকতেন, দে দেখি দোল! —ছেলেমেয়েরা চেঁচাতো,—নামো, নামো,—এখনি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

শুধু অল্পবয়সীদের সঙ্গে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুল-কলেজের প্রবীণ শিক্ষকরাও এসে বাড়িতে থাকতেন, অথবা নিকটে বাড়িভাড়া করে সপরিবার আসতেন,—তাঁদের সঙ্গেও গল্প-গুজবে, হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটত,—তাস খেলার মজলিসও বসত। তাঁর প্রাণোজ্জ্বল উপস্থিতিতে সারাগৃহ আনন্দে উৎসাহে জমজম করত।

১৯৪৫-৪৬ সালে,—যে-সময় এই ডায়েরী লেখা,—সেবার কিন্তু তাঁর মধুপুরে আসা ভগ্নদেহে, কঠিন রোগভার নিয়ে। কলকাতায় ঘটনাবহুল কর্মব্যস্ততা ও প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কী পরিস্থিতিতে সেই গুরুতর রোগের আকস্মিক নিদারুণ আক্রমণ আসে ডায়েরীর প্রথম ভাগে তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারির শেষ অবধি তিনি মধুপুরে সেবার কাটান। রোগের কিছুটা নিরাময়ও হয়। কাজের ডাকে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পুনরায় কর্মজগতে ও রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

সেই ১৯৪৬ সালে মধুপুরে থাকাকালে ডায়েরীটি লেখা ৩রা জানুয়ারি থেকে ২৭শে জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ডায়েরীতে পাওয়া যায়, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর বিবিধ, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী, হিন্দুমহাসভা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও তাতে তাঁর যোগদানের উদ্দেশ্য, কলকাতায় সে-সময়ে সংঘটিত কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ, বিশেষতঃ আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও 'আই. এন. এ. দিবস' প্রতিপালন উপলক্ষে ছাত্রদের শোভাযাত্রা নিয়ে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের বর্ণনা, কেন্দ্রীয় লোকসভার নির্বাচনের উদ্দীপনা ও উদ্ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হওয়ার বৃত্তান্ত প্রভৃতি এবং সর্বোপরি তাঁর নিভৃত আত্মচিন্তা, মনের ভাবভাবনা-বলী, আত্মবিশ্লেষণ, নিজ জীবনের ও পারিবারিক টুকরা স্মৃতিকথা।

চামড়া দিয়ে বাঁধানো এই ডায়েরীখানি তিনি আমাদের বড়বৌদিদিকে উৎসর্গ করে দিয়ে যান্। তিনি সযত্নে এটি রাখেনও। আজ এখানে সেইটি প্রকাশিত হোল।

এই ডায়েরী লেখার আগে ও পরে মেজদার বহুমুখী কর্মিষ্ঠ জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের কাঠামো এখানে দিলে ডায়েরীর অনুধাবনে হয়ত সহায়তা হবে। কেননা, আমার এই রচনার শুরুতেই জানিয়েছি, মেজদার জীবনী লেখার প্রয়াস এটা নয়। তাঁর কয়েকদিনের লেখা এ ডায়েরীখানিও তাঁর ব্যক্তিত্বের ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুলির সম্যক পরিচয় ফুটিয়ে তোলে না। তিনি ছিলেন দুর্জয় সাহসী, নির্ভীক-চেতা, তেজস্বী পুরুষ;—অসীম মনোবলের অধিকারী। তাঁর জীবিতকালে দেশবাসীর কাছে সেইটেই ছিল তাঁর বিশেষ ও প্রধান পরিচয়। কিন্তু, ডায়েরীখানির লেখার মধ্যে তাঁর সে-রূপের অভিব্যক্তি বিরল। এর প্রধান কারণ, ক্লান্ত অসুস্থ

দেহে, রোগযন্ত্রণা ভোগের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর এই রচনা লেখা। তবুও আশ্চর্য বোধ হয় যখন দেখি, ডায়েরীর একস্থানে তিনি রোগশয্যায় যন্ত্রণাকাতর হয়েও লেখেন, "শরীরে ভাঙন ধরেছে। মৃত্যুকে ভয় করি না। এটা খুব সত্য। কিন্তু তিলে তিলে বা ভুগে মরতে চাই না। কাজ করতে করতে, সংগ্রামের ভিতর যেতে যেতে, সত্যকে বরণ করতে করতে জীবন-দীপ নিবে যাক, এই আমার কাম্য। তা কি হবে?"

তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ,—১৯৪৬ সালে ভারত যখন পরাধীন।

বিধির কী বিচিত্র বিধান! তাঁর সেই কামনাই পূর্ণ হয়,—১৯৫৩ সালে,—আর ভারত তখন স্বাধীন! সেই স্বাধীন ভারতে এই সত্যব্রত নির্ভীক দেশ-প্রেমিকের যেন সংগ্রামের মধ্যে রণাঙ্গনেই মৃত্যু ঘটে। কাশ্মীরে বিনা বিচারে নিঃসঙ্গ বন্দী জীবন্দশায় তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়—অতি আকস্মিক ভাবেই! বন্দীদশায় মেজদার দেহাবসানের সেই মর্মন্তুদ কাহিনীও এই গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজিত হল।

—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা

[জন্ম—৬ই জুলাই, ১৯০১]

১৯২৪—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত।

১৯২৬—কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগদান।

১৯২৯—বঙ্গীয় বিধান পরিষদে জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত।

১৯৩০—কংগ্রেসের বিধান পরিষদ বর্জন নীতির কারণে পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে পুনর্নির্বাচন।

১৯৩৪—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—ভাইস্-চ্যান্সেলার (১৯৩৪-১৯৩৮)। পোস্টগ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল অফ্ আর্টস এণ্ড সায়েন্সের সভাপতি।

ফ্যাকালটি অফ্ আর্টস-এর ডীন।

ইন্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড-এর সদস্য ও পরে সভাপতি।

১৯৩৫—বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের কোর্ট ও কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৩৭—বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নবগঠিত বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৩৮—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল্. এল্. ডি. সম্মান-উপাধি লাভ।

"লীগ্-অফ্ নেশন্স্"-এর "ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটি"-তে ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত।

১৯৩৯—নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভায় যোগদান।

১৯৪০—নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক সভাপতি (১৯৪০-১৯৪৪) এবং বঙ্গীয় হিন্দুসভার সভাপতি।

১৯৪১—ফজলুল হক্ সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত Progressive Coalition মন্ত্রিসভায় অর্থসচিবের পদ গ্রহণ।

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে বিহার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভাপতিরূপে যোগদান করতে যাওয়া,—Defence of India Rules-এ গ্রেপ্তার ও পরে মুক্তিলাভ।

ক্রিপ্স্ মিশন আলোচনায় যোগদান।

১৯৪২—রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করে বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোকে পত্র প্রেরণ। কারাবরুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে সরকারের অনুমতিদানে অস্বীকার।

আগস্ট আন্দোলনকালে মেদিনীপুরে ও দেশের অন্যান্য স্থানে সরকারী দমননীতি ও দেশবাসীর উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। গভর্ণরের নিকট প্রেরিত পদত্যাগ-পত্রের প্রকাশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ।

১৯৪৩—পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাঙলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাসঙ্ঘ সংগঠন। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি (১৯৪৩-১৯৪৫)।

১৯৪৪—ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা "ন্যাশনালিস্ট" প্রকাশ ও সম্পাদনা।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

[১৯৪৫—কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত,—মধুপুরে আসা।

সেই সময়েই এই ডায়েরী লেখা।]

১৯৪৬—বঙ্গীয় বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচন।

কলিকাতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও দেশের বিভিন্নস্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকালে বিপন্নদের সাহায্যদান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থাপন এবং শান্তি স্থাপনের চেষ্টা।

হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল গার্ড স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন।

বাঙ্গলা থেকে Constituent Assembly—গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

পাকিস্তানী কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্দোলন।

১৯৪৭—স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভারগ্রহণ করে যোগদান। হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতি পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণের পরামর্শ দান।

মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর হিন্দু মহাসভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৪৯—হিন্দু মহাসভার মত পরিবর্তন ও পুনরায় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করায় মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নিকট থেকে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলায়নের পূত-অস্থি গ্রহণ ও ১৯৫২ সালে সারনাথে নবনির্মিত স্তূপে সংস্থাপন।

১৯৫০—নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি।

প্রধান মন্ত্রী নেহরু অনুসৃত পাক-ভারত নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ।

বাঙলার উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসনের ও দুর্গতিমোচনের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা ও আত্মনিয়োগ।

১৯৫১—"জনসঙ্ঘ" নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ও সভাপতি পদ গ্রহণ।

১৯৫২—দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র থেকে সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেণ্টের লোকসভার সদস্যপদ লাভ। লোকসভায় ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে বিরোধীদলের প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব। ভারতীয় রেলওয়ের পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান।

বর্মা, কাম্বুজ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ।

কটক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ও কানপুরে জনসঙ্ঘ সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৫৩—কাশ্মীর-সমস্যা বিষয়ে লোকসভায় পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে বারংবার বিরোধ ও দেশে আন্দোলন। দিল্লীর চাঁদনীচকে শোভাযাত্রার উপরে প্রচারিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ এবং পরে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ।

১১ই মে কাশ্মীরে প্রবেশ ও কাশ্মীর সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার।

শ্রীনগরে বন্দীজীবন্দশায় মৃত্যু এবং ২৪শে জুন কলিকাতায় প্রেরিত শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিকথা

॥ ১ ॥

পূর্বকথা

১৯০১ সাল ৬ই জুলাই ভবানীপুর, কলিকাতা, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড (তখন রসা রোড নর্থ) ভবনে আমার জন্ম হয়। আমরা চার ভাই তিন বোন ছিলাম। আমার পূর্বে আমার বড় বোন কমলা দেবী ১৮৯৫ সালে ও আমার বড় দাদা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৬ সালে ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে অক্টোবর মাসে আমার ছোট ভাই উমাপ্রসাদের, ১৯০৫ সালে ছোট বোন অমলার, ১৯০৬ সালের মে মাসে ছোট ভাই বামাপ্রসাদের ও ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ছোট বোন রমলার জন্ম হয়। আমার বাবার এক কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন হেমন্তকুমার। এক বোন ছিলেন হেমলতা। হেমন্তকুমার ১৮৮৭ সালে বি. এ. পরীক্ষায় ডবল্ অনার্সের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ সালে তাঁহার অকাল-মৃত্যু হয়। পিসীমা হেমলতাকে আমার মনে নাই। ১৯০৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, যেমন মেধাবী তেমনি তেজস্বী, কিন্তু বড় মেজাজী লোক ছিলেন। এখনও তিনি জীবিত আছেন, ৮৪ বৎসর তাঁর বয়স। পিসীমা মারা যাবার পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। আমি বাল্যকালে ও ছাত্রাবস্থায় তাঁর কাছ থেকে অনেক স্নেহ ও আদর পেয়েছি।

আমার পিতামহ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারা চার ভাই ছিলেন, এক বোনও ছিলেন। বড় দুর্গাপ্রসাদ, মধ্যম হরিপ্রসাদ, সেজ গঙ্গাপ্রসাদ, ছোট রাধিকাপ্রসাদ। বোনের নাম থাকোমণি। অল্পবয়সে তাঁরা বাপ, মা দুই হারান। তাঁদের মাতৃদেবী ব্রহ্মময়ী জীরাট থেকে পদব্রজে পুরীধামে তীর্থ করিতে গেলেন। সেখানে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁদের পিতৃদেব বিশ্বনাথ পৈতৃক ভিটা বাগনাপাড়া ত্যাগ করে মাতুলালয় জীরাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গঙ্গায় স্নান করার সময় একটি জাহাজের মাস্তুল তাঁর মাথায় পড়ে এবং সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। গল্প শুনেছি যে যখন তাঁর বয়স খুব অল্প এবং তাঁর মার সঙ্গে জীরাটে আসার কিছু পরে, তাঁর বিসূচিকা হয়। সকলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়েছিল এবং গঙ্গার কোলে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। বিধবা মা একমাত্র সন্তানকে ছাড়তে পারেননি; তাঁর মৃতপ্রায় দেহ আঁকড়ে গঙ্গার ধারে কাঁদছিলেন। এমন সময় এক সাহেব নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নৌকা থামালেন এবং বালককে দেখে বিচার করলেন যে তার জীবনের দীপ তখনও অল্প জ্বলছে। তাঁর ঔষধের গুণে বালক সুস্থ হয়ে ওঠেন। এইরূপ অলৌকিক ভাবে মুখোপাধ্যায় বংশ রক্ষা পায়। যদি তাঁর জীবনের সেদিন অবসান হত, গঙ্গাপ্রসাদ জন্মাতেন না, বাংলায়

ও ভারতে আশুতোষও আসবার অবকাশ পেতেন না। তিনি জীরাটেই বাস করলেন এবং সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ী পুরীতে দেহ রাখার কিছুদিন পরে তাঁর নিজেরও আকস্মিক মৃত্যু হল। তখন দুর্গাপ্রসাদ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৭ বৎসর। আর তিন ভাই একজন আর একজনের অপেক্ষা দু-তিন বছরের ছোট। সংসারে আপন বলতে কেউ নেই, এই বিপদে তাঁরা অনাথ হয়ে উপায়হীন বোধ করলেন। এখানেও ভগবানের আশীর্ব্বাদ এক পরিচারিকা যে তাঁদের মানুষ করেছিল সেই তাঁদের আশ্রয় ও সম্বল হয়ে দাঁড়াল। তার যথাসর্ব্বস্ব অল্পকিছু যা ছিল তাই নিয়ে সে তাঁদের নিয়ে এল কলকাতায় ভাগ্য-পরীক্ষা করতে। দুর্গাপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করলেন ভাইদের তিনি যে প্রকারে হউক মানুষ করে তুলবেন। পরিচারিকার অর্থে ও সেবায় ভাইএরা বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। দুর্গাপ্রসাদ নিজেও লেখাপড়া শিখলেন—তাঁর engineering-এর দিকে দৃষ্টি গেল। মধ্যম হরিপ্রসাদ দেশের দিকে ফিরে যাবার আগ্রহই দেখালেন বেশী। গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬১ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিছুদিন আইন পড়লেন ও পরে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করলেন। ১৮৬৬ সালে তিনি এম. বি. পাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁর বিবাহ হয় জগৎতারিণী দেবীর সঙ্গে। ১৮৬৪ সালে ২৯শে (?-২৮) জুন মলাঙ্গা লেনের বাসাবাটীতে আমার পিতৃদেব আশুতোষের জন্ম হয়। ১৮৭৩ সালে পিতামহ ভবানীপুরে ৭৭নং রসা রোড নর্থের বাড়ি কিনে দক্ষিণ কলিকাতায় বাস করা আরম্ভ করলেন। কনিষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ Engineer হলেন। দুর্গাপ্রসাদ যুক্তপ্রদেশে বড় সরকারী চাকুরি নিয়ে যান। প্রতিষ্ঠাবান লোক হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর অদ্ভুত ত্যাগ ও প্রচেষ্টা না থাকলে ভাইএরা মানুষ হয়ে উঠতেন না। তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র সুকিয়া স্ট্রীটে পৈতৃক বাড়িতে থাকেন। খুব বিষয়ী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ল কলেজের লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাও মারা গেছেন কিছুদিন। চারুচন্দ্র ডাক্তার। হিমাদ্রিকুমার লণ্ডনের ডি. এস-সি. বিশ্ববিদ্যালয়ের Zoologyর অধ্যাপক ও বিজনকুমার overseer। হরিপ্রসাদ বিবাহ করেছিলেন। আমরা মেজঠাকুরমাকে দেখেছি—বেশ ভাল লাগত তাঁর কাছে পুরাতন গল্প শুনতে। তাঁর স্বামী দেশেই থাকতেন—লেখাপড়া ভালবাসতেন। পুত্রকন্যা ছিল না, নির্ব্বিবাদে সামান্যভাবে সংসারে কাটিয়ে দেহ রাখেন। কনিষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদও প্রতিভা-শালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলাসরকারের বড় ইন্‌জিনিয়রের পদ পেয়েছিলেন ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন। বাড়ি অনেকগুলি তাঁর ভবানীপুরে ছিল, আবাদ কিনেছিলেন ও বিশেষ সচ্ছলতা তাঁর হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর দুই পুত্রই গিরীন্দ্র ও ফণীন্দ্র অত্যন্ত খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁদের ব্যবহারে ও অপচয়ের ফলে সম্পত্তি নষ্ট হয়। রাধিকাপ্রসাদ এই কারণে আকস্মিক দেহ রাখেন। তারপরও তাঁদের যা কিছু ছিল, গুছিয়ে রাখলে তাঁদের অভাব হত না। কিন্তু ক্রমে সবই তাঁদের নষ্ট হয়ে গেল। ১৯১১ সালে গিরীন্দ্র মরে বাঁচলেন। বহু সম্পত্তি



সস্ত্রীক শ্যামাপ্রসাদ



কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে, বাঁদিক থেকে বসে : রমাপ্র
শ্যামাপ্রসাদ। দাঁড়িয়ে : বামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ,



সামনে বসে বাঁদিক থেকে : দেবতোষ (অন্থ), আরতি (হাসি), বৌদি, সবিতা (নয়া), চিত্ততোষ

দ্বিতীয় সারি দাঁড়িয়ে : উমাপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ ও ললিতকুমার

তৃতীয় সারি : অশুতোষ (মন্টু), মনোতোষ, শিবতোষ

দেনার দায়ে বিক্রয় হয়ে গেল। ফণীন্দ্র অনেকদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে মারা গেল। তিনি মহারাজা টেগোরের কাছে চাকুরী করে দিন কাটালেন। খুব সৌখীন ছিলেন, মন উদার ছিল এবং গল্প করতে পারতেন খুব। মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাড়ীতে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগত। দেখলেই বোধ হত বেশ রাশভারী লোক ও মনে কোন ইতরতা নেই। তবে অসম্ভব খরচে মানুষ ছিলেন; সবই উড়িয়ে দিয়ে ফকীর হলেন। গিরীন্দ্রর সংসারের কাহিনী আরো দুঃখময়। ১৯১১ সালে তাঁর জীবনান্ত হল। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সামান্য বাসা বাড়ীতে তাঁর পরিবারবর্গ উঠে এলেন। খুব সৌখীন ছিলেন এবং পূর্বে যেভাবে দিন কাটিয়েছেন তার তুলনায় এঁদের নূতন জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই শোচনীয় হয়েছিল। তাঁর মেয়েদের বিবাহ মোটের উপর ভালই হয়েছিল। বড় ছেলে —করুণা, ডাকনাম ধুনী—দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ এবং ব্যবহারও বড় ভাল ছিল। সবার ভিতরে কয় বাড়ী মিলিয়ে তিনি ছিলেন সব চেয়ে বড় ছেলে। হাইকোর্টে বাবা তাঁর চাকুরী করে দিলেন। কোন রকমে সংসার হয়ত গুছিয়ে আবার দাঁড় করাতে পারতেন। কাকীমার শাসন ছিল না—নিজে ঐশ্বর্যের ভিতর গড়ে উঠেছিলেন—নতুন তিক্তজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারলেন না। যাহোক্ তাঁর বড় ছেলে কুসঙ্গে পড়ে রোগাক্রান্ত হলেন ও অকালে তাঁর মৃত্যু হল। মধ্যমপুত্র তারাপ্রসাদ মেধাবী ছিল—কিন্তু সেও মানুষ হল না। অবশেষে বহু কষ্টভোগ করে তারও অকাল-মৃত্যু হল। অন্য দুটি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হল না। এখনও তারা আছে—কখনও তাদের মাকে দেখে, কখনও দেখে না। দুঃখের ভিতর দিয়ে সেই পুরাতন স্মৃতিকে পিছনে ফেলে তাদের জীবন কেটে যাচ্ছে।

বাবা যতদিন ছিলেন আমি দেখেছি এঁদের জন্য কত দুঃখ করেছেন, কত চেষ্টা করেছেন এঁদের পায়ের উপব দাঁড় করাতে; কিন্তু সফল হন নি। যা সাহাযা করা সম্ভব আমরাও করেছি, কিন্তু অভিশপ্ত পরিবারের মত এঁদের দুঃখের অবসান কখনও হল না।

আমার পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদকে আমরা কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি তিনি চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর মেজাজ বাহিরে বড় কড়া ছিল কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল অসাধারণ কোমল। কখনও দুই টাকার বেশী ফি নেন নাই এবং তাও গ্রহণ করেননি যখন বুঝেছেন রোগীর সাংসারিক অবস্থা এমন যে অত অল্প ফি দেওয়াও কষ্টসাধ্য হবে। সকলে তাঁকে ভয় করতেন—তিনি কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না বলে ও কোথাও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করতেন না বলে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তখনকার যুগে যখন ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালীরা বাংলাভাষার কদর করতে অসম্মান বোধ করত, তখন তিনি নিজে মাতৃভাষার সাহায্যে পুস্তক লিখেন। কি করে নতুন মা নিজেকে গড়ে তুলবে, কি করে ছেলে মানুষ করতে হবে এই সব কথা তিনি বাংলায় লেখেন। অন্য

পুস্তকাদিও প্রণয়ন করেন। রামায়ণ পদ্যে লেখা তাঁর ছাপা হয়নি—তবে কাগজের তাড়া আমরা দেখেছি। তাঁর অনেক গুণ আমার বাবার চরিত্র ও চিন্তাধারাকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর এক প্রধান কামনা ছিল নিজের ছেলেকে মানুষ করা। অতি অল্প বয়সকাল থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে যা ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে তিনি দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠমানব হয়ে উঠবেন। শুধু লেখাপড়ার দিক থেকে নয়, মানুষ হতে হলে যেসব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, সেগুলিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, নেতৃত্ব, সময়মত কাজ করা, প্রত্যূষে ওঠা, সাদাসিধে জীবন-যাপন করা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা দেখান, কর্ম-কুশলতা, কর্ম-প্রেরণা, ত্যাগের মহিমা, এইসব গুণই গঙ্গাপ্রসাদের দানরূপে আশুতোষের ভিতরে প্রবেশ করেছিল। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর জীবদ্দশায় নিজের কর্মক্ষেত্রে যে প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, তা তখনকার দিনে সামান্য ছিল না। কিন্তু তাঁর চিরস্মরণীয় কাজ হয়েছিল এক অসাধারণ পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্যক্‌রূপে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ১৮৮৯ সালে যখন আশুতোষের বয়স ২৩ বৎসর ৬ মাস তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। গঙ্গাপ্রসাদের বয়স তখন ৫৩র কাছাকাছি। তিনি বাতরোগে কিছুকাল ভুগেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কারণ হল তাঁর কনিষ্ঠপুত্র হেমন্তকুমারের অকাল পরলোকগমনে। ইঁহার বিষয়ে শুনেছি যে ইনিও খুব মেধাবী ছিলেন, সুপুরুষ ছিলেন ও বিশেষ আমোদী ছিলেন। তাঁর হয়ত অভিমান ছিল যে জ্যেষ্ঠের তুলনায় তাঁর আদর তাঁর পিতার কাছে কিছু কম ছিল। জ্যেষ্ঠের উজ্জ্বলতর প্রতিভার সামনে হেমন্তকুমারের দীপ্তি ম্লান হবারই কথা। কিন্তু তাঁর অভিমান যে অমূলক ছিল তা প্রমাণ হল নিষ্ঠুরভাবে। তার অতি অল্প বয়সে দেহান্ত হওয়ার যে তীব্র শোক তা তাঁর পিতৃদেব সহ্য করতে না পেরে তাঁর অতি আদরের আশুতোষকে সঙ্গহীন অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে তিনি কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলেন।

আমাদের মাতুলবংশের বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখার নেই। আমার মাতামহ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য কৃষ্ণনগরে থাকতেন। গুপ্তিপাড়ায় তাঁদের দেশ। পণ্ডিত লোক ছিলেন, খুব সাত্ত্বিক ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আমার পিতামহ ইচ্ছা করলে বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনতে পারতেন—তাঁর অমন প্রতিভাশালী ছেলেকে জামাতারূপে বরণ করতে অনেকেই আগ্রহান্বিত হতেন। কিন্তু তাঁর গোড়া থেকেই খুব ঝোঁক ছিল কোন সদ্বংশজাত দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘর থেকে বধূ আনবেন। রূপবতী আর গুণবতী এই দুই হলেই তিনি খুশী ছিলেন—অর্থের দিকে তাঁর লালসা ছিল না। ১৮৮৬ সালে জানুয়ারী মাসে আমার মা বধূ-রূপে আমাদের বাড়ীতে আসেন। এক কপর্দকও আমার পিতামহ গ্রহণ করেননি। মার কাছে শুনেছি তিনি অগাধ স্নেহ ও প্রীতি পেয়েছিলেন চার বৎসরে তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে। ১৮৮৯ সালে তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। আমার দিদির জন্ম হয় ১৮৯৫ সালে। বছরের পর বছর গেল আর সন্তান হয় না—পিতামহীর এবং আত্মীয়দের

মধ্যে কথা হত যে ছেলের আবার বিবাহ দেওয়া হউক। পিতামহের কাছে এই বিষয়ে কথা আলোচনা করার সাহস কাহারও ছিল না, এত ভয় করত তাঁকে সকলে। কিন্তু একথা তিনি যে না শুনেছিলেন তাহা নয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, পাছে পরে কোনো প্রশ্ন ওঠে এজন্য তিনি ভবানীপুরের বসত্-বাড়ী তাঁর একমাত্র পুত্রকে না দিয়ে তিনি তাঁর বধূর নামে লিখে দিয়েছিলেন। পিতামহী ও মায়ের নামে বাড়ী ছিল। ১৯১৪ সালে আমার পিতামহীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিসাবে বাড়ীর উপর আমার পিতার অধিকার স্থাপিত হয়। আমার মাতামহের একমাত্র পুত্র ছিলেন পঞ্চানন। তিন কন্যা তাঁর ছিল। জ্যেষ্ঠা শরৎকুমারী, মধ্যমা আমার মাতৃদেবী যোগমায়া, আর কনিষ্ঠা জ্ঞানদা। মায়ের নাম ছিল বাপের দেওয়া—রাখালী। সেই নাম পিতামহ পরিবর্তন করে যোগমায়া নামে বধূকে বরণ করেছিলেন। বড় মাসীমা অনেকদিন বিধবা অবস্থায় জীবিত ছিলেন; তাঁর স্বামী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শান্তিপুরের এক প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিল না, কন্যাও অকালে গত হন। দুই নাতিনী—পেনু ও ছেনু ছিলেন। বড়র সঙ্গে বিবাহ হয় ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ডিস্ট্রীক্টজজের পদ থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কনিষ্ঠা এখনও জীবিতা আছেন—তাঁর স্বামী মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাব ডেপুটি ছিলেন, পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাজ নেন। মণীন্দ্রলাল আমার বিশেষ অনুরাগী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে আমরা হারিয়েছিলাম। ছোট মাসীমা অনেকদিন পূর্বে মারা গেছেন। দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, আমার ছোট মেসোমহাশয়, লালবাগ মুরশিদাবাদে থাকেন, মুক্তিয়ারী করতেন; এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার দুই পুত্র মণীন্দ্র ও সুধীর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। কন্যা পেনু—সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন—তাঁর স্বামী ছিলেন সুধানাথ মুখোপাধ্যায়— বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিস্‌টাণ্ট্ রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। এই দুর্গাপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগরের এডভোকেট্—আমার দাদার শ্বশুর মহাশয়। ইহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা দেবী আমার বৌদি। মাতুল পঞ্চানন কলিকাতায় থেকে লেখাপড়া শেখেন। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, খুব আমোদী ও সুরসিক। দুর্ভাগ্য এই, তাঁহার অল্পায়ু—শেষ হয় ১৯১৪ সালে। নিজেকে সামলাতে না পেরে কুসংসর্গে পড়ে তাঁর জীবন শেষ হয় দ্রুতভাবে। আমার দিদিমা তাঁর একমাত্র পুত্রের নিকট হতে সদ্ব্যবহার পাননি। তাঁকে আমরা দেখেছি—তিনি ১৯২৮ কি ২৯ সালে মারা যান। বড় ভালমানুষ ছিলেন এবং আমাদের প্রচুর স্নেহ করতেন। বয়স অধিক হওয়া সত্ত্বেও এবং বহু শোকতাপ পেলেও তাঁর রসজ্ঞান বেশ অটুট ছিল এবং নাতি, নাত্নী, নাতবৌদের নিয়ে গল্প করতে তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। মামার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার বহু চেষ্টা হয়েছিল। বড়ছেলে—অবনী—লেখাপড়া না শিখলেও চাকুরীতে ঢুকেছিল ও অল্প করে দায়িত্ববোধ তার হয়ে আসছিল, এমন সময়ে কলেরা রোগে সাতদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হল। তখন আমার দিদিমার শ্রাদ্ধ

হয়নি। মামীমা প্রথম বয়সে মামাকে হয়ত সামলে রাখতে পারতেন—কিন্তু তখন তিনি তাঁর দায়িত্ব—সব সময়ে পালন করতে পারেননি। তাঁর দুঃখভোগ শেষ জীবনে বহু হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। তাঁর দুই কন্যাই সুপাত্রে পড়েছে ও তাদের অভাব বোধ বিশেষ হয়নি। কিন্তু পুত্রদের কথা অধিক উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

॥ ২ ॥

আমার ছেলেবেলা

খুব ছেলেবেলার ঘটনা যা আমার মনে আছে তখন আমি হয়ত হাঁটতেও শিখিনি। বাড়ির বাহিরে সিঁড়ি দিয়ে আমাকে পেরামবুলেটরে বসিয়ে চাকর নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়ী উলটে যায় ও আমি গুরুতরভাবে আঘাত পাই। সেই আঘাতের ঘটনা আমার মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের ছাপ নিয়ে অনেকদিন ছিল এবং আজও সে কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলার গল্প বড় হয়ে শুনেছি যে খুব ছোট বয়স থেকেই আমি ভোজন-পটু ছিলাম। যখন উঠে দাঁড়াতে পারি না, কোনরকমে বসতে পারি, হয়ত কথাও ফোটেনি, তখন বড় একটা আম তলায় ফুটো করে আমার হাতে তুলে দেওয়া হত। বাবা হয়ত তখন স্নানে যাচ্ছেন—অত বড় আম হাতে দেখে মাকে বকে গেলেন। স্নান শেষ করে এসে দেখলেন যে আম আমি শেষ করেছি। তার ভিতরের সব রস নিঃশেষ করে আম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতাম—ঐ! যাঃ! এবং আরো একটার জন্য হাত বাড়াতাম।

১৯০৪ সালে যখন আমার তিন বছর বয়স আমরা কাশী গিয়েছিলাম। সেখানে যে বাড়িতে থাকতাম তার একটা প্রকাণ্ড হল-ঘর দুতলায় ছিল; এ ছবিটা এখনও মনে আঁকা আছে। আমি কালো ছেলে ছিলাম, মনে অভিমান ছিল যে আমাকে তত আদর করে না সকলে। আমার ছোট ভাই বিজু দেখতে খুব সুন্দর ছিল, কাশীতে রাগ করে লুকিয়ে তাকে একবার কামড়ে দিয়েছিলাম। একথাও এখনও মনে পড়ে।

বাড়িতে ছেলেবেলায় দেখতাম বহু লোক আসতেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে—এ বেশ মনে আছে।

বাবার জুড়ি গাড়ী আসত, সহিস সুর করে চীৎকার করে রাস্তার লোককে সরে যেতে বলত, এও মনে পড়ে। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে থাকতে, তিনি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে খুব ভাল লাগত।

১৯০৪ সালে দিদির প্রথম বিবাহ হল। বয়স তখন তাঁর নয় বৎসর। পাত্র বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র—শুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিয়ের বর এলেন চতুর্দোলা চড়ে। বাড়িতে মস্ত সভা হল—কত বাজনা, আমোদ তাও মনে পড়ে বেশ।

সুন্দর লম্বাচওড়া চেহারা ছিল জামাইবাবুর। তিনি আসতেন ভিতরে বসে গল্প করতেন, বাবা কত আদর করে তাঁকে কাছে নিয়ে বসতেন।

আমরা কাছাকাছি থাকতাম এই নতুন মানুষটির। ক'মাসের মধ্যে তাঁর টাইফয়েড হল—খুব বাড়াবাড়ি চল্‌ল। বাবার সঙ্গে একদিন তাঁকে দেখতে গেলাম—মেডিকেল কলেজের সামনে গলির ভিতর বাড়ি। একটা চওড়া বারান্দার শেষদিকের ঘরে তিনি শুয়ে ছিলেন—এ যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। বাবার মুখে হাসি নেই—তাঁর চেহারা দেখেই মনে দুঃখ ভরে যেতে লাগল। তিনি মারা গেলেন—যত বড় ডাক্তার—সাহেব ও দেশী—কলকাতায় ছিলেন, সবাই এলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তারপর শুধু মনে আছে বাড়ীতে কি কান্নার রোল—ঠাকুরমার ও মার সে বুক-ফাটা চীৎকার ধ্বনি আমাদের কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কি হাসি আর আনন্দ হত এই নতুন মানুষটিকে নিয়ে; হঠাৎ ক'মাসের মধ্যে তিনি কোথায় চলে গেলেন; দিদিকে ঘিরে সবাই কি কান্নাই না কাঁদত—এসব তখনকার সেই অল্প বয়সের ঘটনা হলেও মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। দিদির কাছে আরো নিবিড়ভাবে আমাদের যেন টেনে নিল—একটা খুব বিপদ ঘটে গেল তা' আমরা বুঝতে পারলাম। ১৯০৬ সালে মনে পড়ে আর একটা ঘটনা। সেবার বাবা সিমলা পাহাড়ে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছেন আর সেখানে রেগুলেশন্ তৈরী করার জন্য যে কমিটি হয়েছিল, তার কাজ হবে। বড়দা সঙ্গে যাবে, এই ঠিক হয়েছিল। মা যেতে পারলেন না, কেন না তার কয়মাস পরেই পচু জন্মাল। আমি ধরে বসলাম, আমিও যাব। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স পুরো হয়নি। আমি থাকতে পারব না, কষ্ট হবে, যত কিছু আমাকে বুঝবার চেষ্টা হল, সবই বৃথা হল। জিদ্ ধরলাম, বড়দা যাবে, আমিও যাব। শেষে বাবা রাজী হলেন। সে কি আনন্দ! নতুন জামা, জুতো, কাপড় এল। বহি নেওয়া হল। বাক্‌স বিছানা বাঁধা হল। আমরা স্টেশনে গেলাম। সে ছবিও এখন পর্যন্ত মনে আছে বেশ। হাওড়া স্টেশনে খুব ভীড়। বাবাকে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য বহু লোক এসেছেন, তা ছাড়া পঞ্জাব মেলে ভীড়ও আছে। এন্‌জিনের বাঁশী বাজছিল, চারদিকে আলো আর চিৎকারের ছড়াছড়ি। হঠাৎ যেন আমি কেমন অবশ বোধ করলাম। মনে হল কোথায় চলে যাচ্ছি, মাকে ছেড়ে। বাবার কাছে এগিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, বাবা, আমি যাব না, আমি মার কাছে ফিরে যাব, আমাকে পাঁচ টাকা দিন। বাবা শুনে অবাক হলেন। যা হোক্ বোধ হয় খুব নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। আদর করে হাতে পাঁচ টাকা—কি দশ টাকা গুণে দিলেন। আমার কাপড়, জামা, বিছানা, বই সব সিমলা বেড়াতে গেল। আর, আমি বাড়ী ফিরে এলাম। এও বেশ মনে আছে, রাত্রে স্টেশন থেকে বাড়ী ফিরলাম। দুতলার ঘরে মা শুয়ে আছেন—আমারই কথা বলছেন যে আমি জোর করে গেলাম, কি করে সেখানে থাকতে পারব তার ঠিক নেই। আমি চুপিচুপি দরজা ঠেলে মার কাছে ছুটে গেলাম ও কোলের কাছে শুয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমি পাঁচ টাকায় খুশী হয়ে ফিরে এসেছি—এই বয়সে সিমলা বেড়ানোর লোভ ত্যাগ করেছি—এত বোকা আমি, এ গল্প

অনেকদিন পর্যন্ত শুনেছি। বড় হয়ে ভেবেছিও অনেকবার যে সত্যি অমন করে পালিয়ে এলাম কেন? ভয়ে? না, মা-র জন্য মন কেমন করছিল বলে? তখন পাঁচ টাকা এত বেশী মনে হত যে তাই চেয়ে ও পেয়ে খুব সন্তুষ্ট বোধ করেছিলাম।

১৯০৬ সালে পুজোর ছুটিতে সবাই আমরা কাশী বেড়াতে গেলাম। খুব ভাল লাগত রেলে যেতে আর দেশ দেখতে। বড়দা ইস্কুলে পড়ছে আর আমি পড়ব না, এ সহ্য করতে পারলাম না। বাবাকে ধরলাম যে আমিও স্কুলে যাব। ১৯০৫ সালে ভবানীপুরে মিত্র ইন্সটিটিউসন্ খোলা হল। বীরেশ্বর মিত্র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বাবা হলেন সভাপতি। হেডমাস্টার মহাশয় ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। ছেলেবেলায় এঁর কাছেই অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছি। চমৎকার শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজীতে দখল ছিল অসাধারণ। যা' কিছু ইংরেজী শিখেছি তার জন্য অনেকটা এঁর কাছে ঋণী। ছোট ছোট ইংরেজী কথা বলান ও লেখান, এই তাঁর নীতি ছিল। বিশ্বেশ্বর-বাবুও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্কুলে আসতেন রোজই। তাঁর কাছে নোটবই থাকত। প্রত্যেক ক্লাসের উপযোগী phrases ও idioms ছোট ছোট, বড় বড় বাক্য সব তাতে লেখা থাকত। দুটো চারটে করে পড়িয়ে যেতেন, ছেলেরা তাই শিখত, মুখস্থ করত। যারা এর সুযোগ নিয়েছিল, তাদের বড় হয়ে ইংরেজী বলা ও লেখার বিষয়ে কখনও ভাবতে হয়নি। আমি যথেষ্ট ঋণী তাঁর কাছে আমার শিক্ষার জন্য।

যা হোক্ প্রথম যখন ৫ বৎসর বয়সে স্কুলে গেলাম, তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ। পড়া বিশেষ করার মত মনোযোগ বা অভ্যাস ছিল না। কিন্তু স্কুল যাওয়া চাই। বাড়ী ফিরে কখনও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। পাঁচ বছর বয়সে কাপড়চোপড় পড়ে অতক্ষণ বন্দী থাকা যেন এক সময়ে অসহ্য বোধ হত। তখন স্কুল হত ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়ায়। যাঁরা তখন পড়াতেন, তাঁদের ভিতর হেডমাস্টার মশায়, হরিবাবু, বিভূতিবাবু, হেড পণ্ডিত মশায়,—দুলালবাবু, নগেনবাবু—এই সব লোকের কথা মনে পড়ে। নগেনবাবু ছিলেন মার দেবার ওস্তাদ। গাঁট্টা মারা, দুই আঙুলের মাঝে পেন্‌সিল রেখে আঙুল চেপে ধরা—ইত্যাদি নানা কোমল উপায়ে তিনি তাঁর শাসন চালাতেন। আশু ঘোষ পরে এলেন। কি সুন্দর গল্প বলতেন—আর আমাদের মন আঁকড়ে বসতেন। তিনি স্বদেশী যুগের মানুষ ছিলেন, অনেক কিছু গোপন কাজও করেছিলেন। সেই সব লুকিয়ে শোনা কথাগুলো যেন মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত ও তাঁর উপর শ্রদ্ধা হত। কালো যতীনবাবু অঙ্ক কষাতেন। হরিভক্ত ছিলেন খুব। আমাদের হরিনামের পদ শেখাতেন। বড় অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক। এঁদের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে হতে লাগল যেমন বছরের পর বছর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কও দীর্ঘ হতে লাগল। বাড়ীতেও এঁরা অনেকে পড়াতে আসতেন। তবে সে আরো কিছু পরের ঘটনা। প্রথমে আসতেন প্রিয়নাথ বসু। ইনি এখনও বেঁচে আছেন। দিদিকে, বড়দাকে, আমাকে, আমার ছোট ভাইবোনেদের সবাইকে অ, আ, ক, খ শিখিয়েছেন। খুব কড়া লোক ছিলেন, বেশী গল্প বলতেন না। বিদ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু ব্যবহার ছিল ভালই। বড় হাত-টান ছিল তাঁর।

একা মানুষ। টাকা যা' করেছিলেন তা' ধার দিয়ে খুব বাড়িয়ে তুলেছিলেন। পরে বাড়ীতে এলেন মহেন্দ্রবাবু (মুখোপাধ্যায়)। লম্বা চেহারা, সৌম্যমূর্তি, দাড়ি বড়। দেখে প্রথম ভয় করত, কিন্তু আসলে তিনি মাটির মানুষ ছিলেন। এত ভালবাসতেন আমাদের, সুন্দর গল্প বলতেন। তাঁর সঙ্গে একটা গভীর আন্তরিকতা এসে পড়েছিল। তিনি একদিন না এলে আমরা অস্থির হতাম, তিনিও আমাদের ছেড়ে থাকতে পারতেন না।

ছেলেবেলা বাড়ী থেকে হেঁটে বাহির হবার হুকুম ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী ছিল। সকালে সেই গাড়ী বাবাকে বেড়াতে নিয়ে যেত, আর দুপুরে আমাদের স্কুলে রেখে আসত। মেয়েরা তাতে এখানে সেখানে যাতায়াত করতেন আবার আমরা বৈকালে বেড়াতে যেতাম। তখন সঙ্গে হয় কোন মাস্টারমশাই থাকতেন, না হয় দরওয়ান যেত। ভোরে ঘুম ভাঙত বাবার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি খুব সকালে সাড়ে চারটার পরই উঠতেন। সকালে খানিক কাজ করে তারপর বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার আগে যদি আমরা না উঠে পড়তাম, আমাদের তখন উঠিয়ে দিয়ে যেতেন। তখন বাড়ীতে গরু থাকত। ভাল দুধ খাবার অভ্যাস বাবার চিরদিন ছিল দেখেছি আর আমরাও সেইভাবে মানুষ হয়েছি। বাজার থেকে খাবার এনে খাওয়া তিনি কখনও পছন্দ করতেন না। কখনও হয়ত লুকিয়ে এনে খাওয়া হত আর ধরা পড়ে গেলে হয় ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হত, না হয় ধমক খাওয়া হত। বাড়ীতে মাংস তখন রান্না খুব কম হত,—যদি মাংস আসত, সেটা কালীঘাটের প্রসাদী মাংস। তাও আবার রান্না হত পিঁয়াজ-বিনা। বাবা যে খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন তা' নয়। তিনি বাহিরে কখনও সাহেব বাড়ীতে, এমন কি গভর্নমেণ্ট হাউসে, চা পর্যন্ত খাননি। পুজাপার্বণ সব হত বাড়ীতে, তাতে যোগদান করায় তাঁর খুব আনন্দ হত। দুর্গা-পূজার সময় দেখেছি সাদা গরদের ধুতি পরে তাঁকে চণ্ডীপাঠ করতে। খাওয়ার খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর কখনও গোঁড়ামি ছিল না। ঠাকুরমা অবশ্য অনেক কিছু মানতেন—তবে তিনি সবাইকে মানিয়ে চলতেন। আমার মার খুব হিন্দুয়ানী ছিল চিরদিন। মাঝে মাঝে সেটা গোঁড়ামির রূপ নিয়ে দেখা দিত। কেউ ছুঁয়ে ফেললে স্নান করতে হবে, নানারকমের ব্রতপালন, পূজা ইত্যাদি—এই সবের উপর তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁরই প্রভাব বাড়ীর উপর বিশেষ ভাবে বিস্তার করে। বাবার মত ও অভিরুচি অত্যন্ত উচ্চরকমের ছিল। যে যার মতানুযায়ী কাজ করুক—তিনি কখনও বাধা দিতেন না বা বিরক্ত হতেন না। আমার ছেলেবেলা থেকেই খাওয়ার উপর ঝোঁক ছিল কিছু বেশী। বিশেষ করে আমিষ আহারে বড় তৃপ্তি পেতাম। লুকিয়ে কখনও কোথাও খেতে যেতাম, বাবা সে খবর ঠিক পেতেন, কিন্তু কখনও তার জন্য বকুনি খাইনি,—অবশ্য যদি স্বাস্থ্যের দিক থেকে সেরূপ খাওয়া অনিষ্টকর হত, তা হলে তিনি রাগ করতেন। মা এসব শুনলে খুব বিরক্ত হতেন প্রথম প্রথম। আবার আমার দাদা মার মত খুব গোঁড়া হিন্দু হয়ে গড়ে উঠছিল। তাতেও বাবা কখনও বাধা দিতেন না। এই অবাধ স্বাধীন মতবাদের ভিতর দিয়ে আমরা গড়ে উঠছিলাম।

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে যাঁরা থাকতেন. তাঁদের মধ্যে দ্‌জনের প্রভাব আমার উপর খ্‌বই পড়েছিল। একজন ছিলেন আমার বাবার মাতুল—অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমরা দাদ্‌ বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল-বাসতেন। সব নাতি-নাতনীদের মধ্যে আমিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। তাঁর চরিত্র অদ্ভুত ছিল। তিনি অসাধারণ মদ্যপ ছিলেন। যখন এইভাবে তিনি বিভোর হতেন, তখন তাঁর ব্যবহার অবর্ণনীয় হয়ে উঠত। পথেঘাটে এমনভাবে চলতেন আর কখনও চীৎকার করতেন যে ভবানীপ্‌রের অনেকেই তাঁকে চিনত বলে কোন বিশেষ গোল-মালের বড় স্‌ষ্টি হত না। এক একবার আমরা দেখেছি বাবা তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাড়ীতে তাঁর আসা পর্যন্ত বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। ঠাকুরমা তখন জীবিত। বাবার রাগ কখনও বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। তিনি (দাদ্‌) পরে রাত্রির অন্ধকারে আবার ফিরে আসতেন। কখনও বা তাঁর আর এক ভগিনী—আমার ছোট ঠাকুরমা যিনি পদ্মপ্‌কুরে থাকতেন, তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেন। আমার এই দাদ্‌র দোষগ্‌ণ দ্‌ই যথেষ্ট ছিল। যখন স্বাভাবিক মান্‌ষ থাকতেন, তখন গল্প বলতে অমন আর দ্‌টি আমরা দেখতে পেতাম না। কথায়বার্তায় তাঁর সজীবতা. সরসতা, সাহসিকতা এই সবের পরিচয় পাওয়া যেত। ভয় বলে কোন পদার্থ তাঁর মধ্যে ছিল না। আর ছিলেন তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, যে জন্য সকলেই তাঁকে খাতির করে চলত। তবে তাঁর দোষের দিক ছিল—যাকে ভালবাসতেন, অন্ধভাবে ভালবাসতেন। আমাকে খাওয়াবার জন্য, ভাল পরাবার জন্য তাঁর কি আগ্রহ ছিল। কেড়ে নিয়ে, ঝগড়া করে, বাড়ীর সকলকে কথা শ্‌নিয়ে তিনি আমার জন্য যা পারতেন টেনে আনতেন। তাঁকে ছেড়ে আমি থাকতে পারতাম না। একবার প্‌জার পর—১৯১১ সালে বোধ হয়—আমাদের বাড়ীতে গ্যাস্‌-এর আলো হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। গ্যাস খানিক বেরিয়ে একটা ঘর ভর্তি করে দিল। সেই ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে প্রথমে শ্‌য়েছিলেন। পরে অন্য একটা ঘরে ম্যাজিক হচ্ছিল বলে আমরা সেখানে উঠে যাই। যে ঘরে গ্যাস বেরিয়ে জমেছিল, সেখানে আলো জ্বালার জন্য একজন চাকর দিয়েশেলাই জ্বালে। আর সমস্ত ঘর দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, সে কি ভীষণ শব্দ, যেন ঠিক বোমা ফাট্‌ল। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দেখলাম যে সেই চাকর ছ্‌টছে আর তার আপাদমস্তক আগ্‌ন জ্বলছে। সে তার কি চীৎকার। তারপর অজ্ঞান হয়ে সিঁড়িতে পড়ে গেল। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল—দ্‌দিন পরে বেচারী মারা গেল। আমার দাদ্‌র সঙ্গে আমার জীবনও সেদিন শেষ হত. যদি আমরা সেই ঘরে আর খানিকক্ষণ শ্‌য়ে থাকতাম। ১৯১২ সালে পদ্মপ্‌কুরে তাঁর অন্য ভগিনীর বাড়ীতে দাদ্‌র ম্‌ত্যু হয়। তার মাস কয়েক প্‌র্বে তাঁর মদ্যাভ্যাস এত বেড়ে উঠেছিল এবং ব্যবহারও এমন অসহনীয় হয়েছিল যে বাবা তাঁকে বাড়ীতে আসতে দিতেন না। আমি কিন্তু প্রায়ই ল্‌কিয়ে তাঁকে দেখতে যেতাম। তিনিও এক এক সময়ে চুপিচুপি আসতেন শ্‌ধ্‌ আমাকে একটু দেখবার জন্য। যখন তাঁর অস্‌খের বাড়াবাড়ি হল, বাবা দেখতে গেলেন। বড় বড় ডাক্তার এলেন। অনেক চেষ্টা হল

তাঁকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছিল, তিনি চলে গেলেন। তাঁর স্নেহ, প্রীতি আমাকে বাল্যকালে অভিভূত করে রেখেছিল। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা, পুত্র বিভূতিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউনটেণ্ট। আমাদের বাড়ী থেকেই মানুষ হয়েছিলেন। কন্যা—লীলা, তিনিও আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। বাবা তাঁর বিবাহ দেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কয়েক বৎসর পূর্বে অকালে জ্যোতির্ময় পরলোকগমন করেন।

আমি এতক্ষণ আমার ঠাকুরমার ভাই-এর কথা বল্লাম। আরো একজন থাকতেন আমাদের বাড়ীতে, তিনি আমার নিজের মাতুল, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলেছি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুরসিক ছিলেন। কিন্তু দেখতাম আমার মার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। তিনি আমার দিদিমার উপর কখনও ভাল ব্যবহার করতেন না। এই কারণে মায়ের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব ছিল না। প্রতি শনিবার তিনি কৃষ্ণনগরে দেশে যেতেন,—সেইখানে তাঁর পরিবারবর্গ থাকত। তিনি আমাদের একমাত্র মামা ছিলেন। মামারবাড়ী বেড়াতে যাবার প্রবল ইচ্ছা হত আমাদের। কিন্তু তা সব সময়ে হয়ে উঠত না। অনেক সময়ে মা ও মামার ভিতর বাক্যালাপ বন্ধ থাকত—আমাদের বাড়ীতেই মামা থাকতেন। তবু আমরা মাঝে মাঝে মামারবাড়ী বেড়াতে যেতাম। একবার বাবার সঙ্গে কৃষ্ণনগর গেলাম। স্টেশনে মহারাজার হাতী এল বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য। আমরাও হাতী চড়ে গেলাম। সে কি আনন্দ। পরে মামার সঙ্গে আমরা ভায়েরা একসঙ্গে যেতাম, অথবা আমি একলা যেতাম। মামা খুব ভোজন-বিলাসী ছিলেন। তাঁর কাছে দুদিন থাকা মানে খাওয়ার বিপুল আয়োজন।

খাওয়া ছাড়াও দিদিমা ও মামীমার আদরও ছিল খুব। সরভাজা, সরপুরিয়ার দেশ—আর মামারবাড়ীর একটা চিরনতুন আদর—এই সব একত্র করে সেই অল্প সময়ের জন্য কৃষ্ণনগর বেড়ানো খুব আমোদের ছিল। আরো একটা কারণ হয়ত ছিল, আমরা জন্মাবধি শহরে মানুষ। কলিকাতার চীৎকার-ধ্বনি ও ব্যস্ত জীবনের বাহিরে পল্লী অঞ্চলে যাওয়া একটা উপভোগের বস্তু ছিল। মামারবাড়ী গিয়ে পাড়া বেড়ানো হত, নদীতে স্নান হত, মহারাজার বাড়ী যাওয়া হত, পুতুল গড়া দেখা হত, আরো কত কি হত। এখনও মনে সেই আনন্দের ছাপ লেগে আছে। এখানে ললিতবাবুর (চট্টোপাধ্যায়) বাড়ীতে যাই বহু বৎসর আগে—ও তাঁর বড় মেয়েকে—যিনি পরে আমাদের গৃহলক্ষ্মীর রূপ নিয়ে বৌদি হয়ে এলেন—প্রথম দেখি। মামা আমাদের সঙ্গে চিরদিনই খুব ভাল ব্যবহার করতেন ও খুব স্নেহ করতেন। তবে তখনই বুঝতাম যে এমন কিছু ঘটছে যাতে তাঁর মনে শান্তি নেই। তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অনেক সময়ে স্ফূর্তি করতে যেতেন ও ক্রমে মদ্যাভ্যাসী হয়ে পড়েন। তাতেই তিনি রোগাক্রান্ত হন। আমাদের বাড়ীতেই তাঁর শেষ চিকিৎসা হয়। বহু চেষ্টা করেও তাঁর জীবনরক্ষা হল না। ১৯১৪ সালে অক্টোবর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাতে তাঁর সংসার সকল দিক থেকে ভাঙনের মুখে পড়ে। সে ভাঙন আর জোড়া লাগল না।

বাবার কাছে যাঁরা নিয়মিতভাবে আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উকীল বিরাজমোহন মজুমদার, উকীল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, উকীল হেমেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উকীল চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিরাজবাবুকে আমরা কাকাবাবু বলে ডাকতাম। ইনি বাবার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। সামান্য অধ্যাপকের কাজ থেকে বাবা ইঁহাকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। পরে হাইকোর্টের উকীল, ল' কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপাল, ল' জার্নেলের সম্পাদক ইত্যাদি হন। খুব ঘনিষ্ঠভাবে বিরাজবাবুকে আমরা দেখেছিলাম। অত্যন্ত হিসাবী লোক ছিলেন এবং তাঁর গুণও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অনেকে তাঁকে পছন্দ করতেন না—কেউ বা হিংসা করতেন তাঁর প্রতিপত্তি ও আর্থিক উন্নতি দেখে। এক এক সময়ে তিনিও লোকের ভাল করতে ইতস্তত করতেন। তাঁর উপর অবিচার বেশী করা হত—তাঁর ভিতরের কোমলতা সকলের কাছে ধরা পড়েনি। যা হোক, আমরা তাঁর স্নেহের পরিচয় বিপদে সম্পদে যথেষ্ট পেয়েছিলাম। তাঁর কথায় বাবা 'না' বলতেন না, এই আমাদের ধারণা ছিল। অনেক সময়ে তাঁকে দিয়ে আমাদের কাজ করিয়ে নিতে হত। তাঁর পুত্রেরা সবাই কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সদ্ভাব সমান ভাবেই চলে এসেছে।

জ্ঞানবাবু ১৯১২ সালে মারা যান। ইনিই বিরাজবাবুকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এঁর গুণ ও দুর্বলতার দুয়ের পরিচয় আমরা ছেলেবেলায় পেয়েছিলাম, খুব স্নেহ করতেন আমাদের। এঁর একমাত্র পুত্র মুরলীধর আমাদের সঙ্গে খুবই সৌহার্দ্য রেখে এসেছেন চিরদিন।

হেমেন্দ্রনাথ সেন বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমরা তাঁকে জেঠামশাই বলে ডাকতাম। তিনিও আমাদের খুব স্নেহ করতেন। গল্প বলে আমাদের খুব আমোদ দিতেন। তাঁর বাড়ীতে বছরে একবার কি দুবার আমাদের নিমন্ত্রণ হত। নানা রকমের খাদ্য প্রস্তুত হত এবং বাড়ীতে খুব আনন্দ হত। সেই সব দিনের কথা, সেখানে যাবার আগ্রহ, এখনও মনে পড়ে।

পূজার ছুটি হলে বাবা বাহিরে বেড়াতে যেতেন। ছেলেবেলা থেকেই এইভাবে নানা দেশ দেখবার সুযোগ হয়েছিল আর বাহিরে যাবার আনন্দও উপভোগের বস্তু ছিল। মনে পড়ে যাবার কতদিন আগে থেকেই সাজগোজ আরম্ভ হত। বাক্স সাজানো, বই নেওয়া, জামা কাপড় জুতো সব নতুন আদায় করার চেষ্টা, সে কি স্ফূর্তি ও উত্তেজনার ভিতর দিয়ে দিন কাটত। সারা সংসার মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হত পাঁচ ছয় সপ্তাহের জন্য। বিছানা বাঁধা একটা রীতিমত আসুরিক ব্যাপারে পরিণত হত। প্রকাণ্ড মোটা চট দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাড়ীর চাকর সহিস সব যেন কাবু হয়ে পড়ত। আমরা তাই খুব মজার সঙ্গে দেখতাম—আর সেসব বাঁধা হবার আগে যখন দালানে সাজানো থাকত তখন তারই উপর গড়াগড়ি দিতাম।

১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত মধুপুরে আমরা এসেছি। তার কোন কথা

আমার মনে পড়ে না। ১৯০৪ সালে মধুপুরে বাবা বিজয়নারায়ণ কুণ্ডুর কাছ থেকে জমি কিনলেন। দেওঘরে ঠাকুরদাদার কেনা জমি অনেক আগে থেকে ছিল। কিন্তু ব্রাঞ্চ লাইনে যাতায়াত খুব সুবিধাজনক ছিল না আর কবারই নানা দুর্ভোগ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মধুপুরে বাড়ী করবেন বলে সেখানেই বাবা জমি কিনলেন। যে অঞ্চলে জমি কেনা ছিল তখন সেখানে শালবন ছিল। সন্ধ্যা হলে বড় কেউ সেদিকে বেড়াতে আসত না। এখন কত বাড়ী সে সব দিকে হয়েছে, এমন কি আরো দূরে ছড়িয়ে প'ড়ছে। ১৯০৪ সালের পর কয়েক বছর মধুপুরে আর আসা হয়নি। সেই বছরে বাবা হাইকোর্টের জজ হলেন। তখন ভারতীয়দের পক্ষে এই ছিল সর্বোচ্চ পদ। ঠাকুরদাদা বলতেন যে তাঁর ছেলে চাকুরী করেন এ তাঁর ইচ্ছা নয়; তবে যদি কখনও তিনি কোন চাকুরী নেন, তা হলে হাইকোর্টের জজিয়তী ছাড়া আর কিছু নয়।

তখন বাবার ওকালতী থেকে যা রোজগার হত তা জজের বেতনের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার হওয়া আর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষার দ্বারা দেশকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করা। তাঁর মুখেই গল্প শুনেছি কি করে অতি অল্প বয়সে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চার বৎসরের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। তাঁর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের পূর্ব ইতিহাস অতুলচন্দ্র ঘটকের "আশুতোষের ছাত্রজীবন"-এ লিখিত হয়েছে। বহু বাধা তাঁকে অতিক্রম করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল। তবে কখনও বাধা তিনি স্বীকার করতেন না। চিন্তা করে যে কাজ করণীয় মনে করতেন, তাই সফলকাম করতে তাঁর অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ তাঁকে সর্বদা সাহায্য করত। ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হয়েও তিনি তাঁর অক্লান্ত কর্মকুশলতা, তেজস্বিতা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সকলের উপরে তাঁর প্রিয় ছিল শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং এই কাজ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন। যখন ১৯০৪ সালে তাঁকে বিচারপতির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান এল, তখন তিনি গ্রহণ করতে উৎসুক হলেন এই কারণে যে তখনকার নিয়মানুযায়ী এই পদ থেকেই ভাইসচ্যান্সেলার হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হতে পারে। আমার পিতামহী তখন জীবিতা। তাঁর আর এক পুত্র ও কন্যার তখন দেহাবসান হয়েছিল। বাবা কখনও তাঁর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেননি। তার কিছুদিন পূর্বে তাঁকে বিলাতে সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে কলিকাতার প্রতিনিধিরূপে যাবার জন্য লর্ড কার্জন বলেছিলেন। কিন্তু আমার পিতামহীর অমত থাকায়, তখনকার দিনের এতবড় সম্মানের আহ্বান তিনি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন। যখন হাইকোর্টের জজ হবার জন্য চিঠি এল, বাবা তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি খুব লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন ও বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর ছেলে চাকুরী করবেন এ তাঁর ইচ্ছা হল না। বাবা তাঁকে ঠাকুরদাদার কথা বল্লেন ও ভাইসচ্যান্সেলার হবার সম্ভাবনা জানালেন। শেষকালে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর

স্বপক্ষে মত দিলেন। চিঠি লিখে বাবা তাঁর সম্মতি জানালেন। কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতামহী বাবাকে নিদ্রা থেকে তুলে জানালেন যে তিনি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না যে তাঁর পুত্র পরের চাকুরী করবে—তা সে যত বড় চাকুরীই হোক্ না কেন। বাবা যখন তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেন যে তাঁর উত্তর সিমলাতে লাটসাহেবের কাছে চলে গেছে, তিনি উত্তর দিলেন যে চিঠি যেতে তিন দিন লাগবে, তার পূর্বেই টেলিগ্রাম করে জানাতে যে তিনি ওই পদ গ্রহণ করবেন না। অনেক বুঝিয়ে তখন বাবা তাঁকে শান্ত করেন।

সে সব দিনের কথা তেমন কিছু মনে পড়ে না—শুধু এই যে বাড়ীতে লোকসমাগম হত খুব আর চারদিকে যেন একটা আনন্দের ঢেউ ভেসে যেত। ১৯০৫ সালে বড় জামাইবাবুর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু প্রকাণ্ড একটা ছায়াপাত করেছিল সংসারের উপর। সেই বছর বাবা ভাইস-চ্যান্সেলার হলেন। ১৯০৭ সালে বাবা আমাদের নিয়ে জসিদিতে পূজার ছুটিতে বেড়াতে গেলেন। সেখানে তাঁর বাত রোগ হয় ও কয়েক মাস ধরে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসেও অনেকদিন ভুগেছিলেন। বাড়ীতে থেকেই হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করতেন। তখনকার একটা ঘটনা কেন জানি না বেশ মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীতে সেনেটের সভা হল—কত সব সাহেব ও অন্যান্য সভ্যেরা আসলেন। বাড়ীর ভিতরে দুতলার বড় দালানে মিটিং হয়—বড় লম্বা টেবিল পাতা হল, অফিস থেকে লোকজন এল। আরো একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। বাংলার ছোটলাট সার এনড্রু ফ্রেজার বাবাকে বাড়ীতে দেখতে এলেন। রাস্তায় পুলিস দাঁড়িয়ে গেছে, লোকজন জমা হয়েছে। লাটসাহেব বাড়ীতে এলেন ও বাবার শোবার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন।

১৯০৮ সালে আমাদের সংসারে খুব একটা স্মরণীয় ব্যাপার ঘটে। দিদি বিধবা হন মাত্র দশ বৎসর বয়সে, বিবাহের কয়েক মাস পরেই। প্রায় তাঁকে বাবা নিজের কাছেই রাখতেন, যদিও তাঁর শাশুড়ী, বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যা, খবর নিতেন ও নিয়ে যাবার জন্য তাগিদও দিতেন। বাবার সংকল্প হল দিদির পুনরায় বিবাহ দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলন করার জন্য যে বিপুল আন্দোলন করেছিলেন, তা ইতিহাসে লিখিত আছে। কিন্তু তাঁর মত অসাধারণ পুরুষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজ তখনও বিধবা বিবাহের পরিকল্পনাকে শ্রদ্ধা বা সহানুভূতির সঙ্গে দেখত না। বাবার প্রস্তাবেও নানা দিক থেকে বাধা ও আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু তিনি সে সব কিছু গ্রাহ্য না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হলেন। সুপাত্র পাওয়াও সহজ ছিল না, কিন্তু তাও মিলেছিল। সেরূপ প্রসিদ্ধ বা ধনবানের বংশজাত না হলেও, সুচরিত্র ও সুপুরুষ ব্রজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল পাত্র নির্বাচিত হন। ইনি হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলালের ভ্রাতুষ্পুত্র। বাবা সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের স্বপক্ষে আনবার জন্য চেষ্টা করেন। গুরুদাসবাবুর সঙ্গে বহু আলোচনা হয় এবং তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে যদিও সমাজ এর অনুকূল তখনও হয়নি, তবুও বিধবা-বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত। তিনি বিবাহে স্বয়ং

উপস্থিত থাকবেন বলে আশ্বাসও দেন। কিন্তু তিনি আসেননি। এই হঠাৎ মত বদলাবার কারণ নিজের দুর্বলতা। তিনি আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, এমন সময় তাঁর কুলপুরোহিত এই সংবাদে ত্রস্ত হয়ে তাঁকে বাধা দেবার জন্য উপস্থিত হন। তিনি পৈতা হাতে নিয়ে শপথ করেন যে তিনি গুরুদাসবাবুর পরিবারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বর্জন করবেন—এমন কি অভিসম্পাত করতেও অগ্রসর হয়েছিলেন। কি অভিসম্পাত ফলবান করার তাঁর ক্ষমতা ছিল তা পরীক্ষা করবার অবসর হল না, কেন না তাঁর এই বিদ্রোহী মূর্তি দেখে গুরুদাসবাবু আমাদের বাড়ীতে আসার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তারপর আমাদের সঙ্গে সকল সামাজিক ব্যবহারও তিনি বন্ধ করেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন গুরুদাসবাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত, গঙ্গার ধারের তাঁর বাড়ীতে বাবা প্রায় তাঁকে দেখতে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর দু'একদিন পূর্বে দশ বৎসর পূর্বে আমাদের বাড়ীতে তাঁর আসার অক্ষমতার কথা স্মরণ করে তিনি বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বাবা খুব বিব্রত হয়ে পড়েন, কেন না গুরুদাসবাবু তাঁর চেয়ে ২০ বৎসরের বড় ছিলেন এবং তিনি তাঁকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন। বাবা কথা চাপা দিবার প্রয়াস করতে গেলেন, কিন্তু গুরুদাসবাবুর এক কথা—'ক্ষমা করেছেন, বলুন'! অবশেষে বাবাকে হাঁ বলতে হল। তখন তিনি বল্লেন—সামনে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হারাণবাবু তখন দাঁড়িয়েছিলেন—যে তাঁর বিদায়ের সময় আসন্ন, তিনি চান যে প্রথমে তাঁর পুত্র বাবার কাছে দ্বারস্থ হবেন এবং বাবা যেন গুরুদাসবাবুর শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হয়ে তাঁর আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন। তাও বাবাকে স্বীকার করতে হয়। গুরুদাসবাবুর দুর্বলতা ও মহানুভবতা—এই দুয়েরই পরিচয় এই থেকে বেশ পাওয়া যায়।

আমাদের বাড়ীতে এই বিধবা বিবাহের বাধা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছিল। বাংলা সংবাদপত্রের তীব্র আঘাত বাবার উপর পড়েছিল। তাঁকে সমাজ থেকে একঘরে করা হবে, এইভাবে ব্যবস্থা চলতে লাগল। নানারকমের নিন্দা ও অপবাদের বন্যা দেখা দিল। খবর রটনা হল যে আমার পিতামহী বাবার এই কাজে বাধা দিতে না পেরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করে কাশী চলে যাচ্ছেন। তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত বিরক্ত হন, কেন না তাঁর পুত্র তাঁর অমতে কোন কাজ করতেন না, আর এই কাজেও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর অনুমোদন দিয়েছিলেন। লোকের মিথ্যা নিন্দার প্রত্যুত্তর হিসাবে তিনি নিজেই কন্যাসম্প্রদান করেন। মিথ্যা কুৎসা প্রচার করতে কোন কোন লোকের আগ্রহ এত বেশী হয়েছিল যে তারা পয়সা খরচ করে নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করতে লাগল দেশময়—যে বাবা তাঁর বিধবা মাতার পুনর্বিবাহের আয়োজন করেছেন এবং সেই উপলক্ষ্যে সকলে যেন আমাদের বাড়ীতে আসেন। এই নিমন্ত্রণপত্র কোন এক বিদেশীর হাতে পড়ায় তিনি দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করে বাবাকে পত্র দিয়েছিলেন ও নিমন্ত্রণপত্রখানিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—আমি নিজে দেখেছি।

সবচেয়ে সাংঘাতিক বাধা এল দিদির প্রথম পক্ষের শাশুড়ীর কাছ থেকে। তিনি লোকের প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়ে বাবার কাছে দাবী করলেন যে তাঁর বধূর উপর

আইনতঃ তাঁরই অধিকার এবং বধূকে যেন এখনই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবা তাতে রাজী হননি, এ বলাই বাহুল্য। বেশ মনে পড়ে, একদিন রাত্রে তিনি লোকজন নিয়ে আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে আসেন। বাবা তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেও তিনি শুনতে রাজী হননি এবং শেষ পর্যন্ত প্রবেশ অধিকার পাননি। কি মর্মান্তিক ঘটনা তখন ঘটেছিল। একদিকে বিধবা শাশুড়ী তাঁর পুত্রকে হারিয়ে শিশু বধূকে তাঁর কাছে রাখবার দাবী স্থাপন করতে চান্—আর একদিকে স্নেহময় পিতা যিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যাকে বিধবার বেশে বাল্যকাল হতে রেখে তিলে তিলে দগ্ধ করতে রাজী নন্—তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা কন্যাকে সুখী করতে। বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যা শুধু আমাদের বাড়ীতে এসে ক্ষান্ত হননি—তিনি আলিপুর কোর্টে মামলা আরম্ভ করেন এবং তাঁর বধূকে আনবার জন্য কোর্টের আশ্রয় নেন। কোর্টে নাবালক কন্যার উপর পিতার অধিকারই সাব্যস্ত হয়।

এই সব অসাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে দিদির দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হল। তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর। বিশেষ কোন ঘটা হয়নি, কেন না সকলের মনে তেমন করে আনন্দের ছাপ পড়েনি। সেই প্রথম বিবাহের আনন্দ ও উদ্দীপনা যেন আরো সবার মনে বিষাদের রেখাপাত করেছিল। দিদিকে রাত্রে যখন শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল, তখন বাড়ী থেকে ছোট ভাইদের মধ্যে একজন পড়ে গেল রাস্তার উপর। সে দৃশ্য এখনও মনে পড়ে। যা হোক্ বিবাহ হয়ে যাবার পর আবার সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। জামাইবাবুর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। চাউলপটী রোডে একটি বাসাবাটীতে তাঁদের থাকা স্থির হয়েছিল। আমাদের বাড়ীতে নতুন সাদা ঘোড়া আর গাড়ী এল। জামাইবাবু সেই গাড়ীতে করে ল' কলেজে ও এম. এ. ক্লাসে যেতেন। বাড়ীতে খুব আনন্দের রোল আবার উঠল। শুক্রবার রাত্রে জামাইবাবু আমাদের বাড়ীতে আসতেন, তখন কি আনন্দ হত সবার। বাবার সঙ্গে দুতলায় তাঁর খাবার আয়োজন হত। দিদির হাসি মুখ দেখে আমরাও সব আনন্দ পেতাম। সেবার পুজার ছুটিতে কাশীতে সব যাওয়া হল।

দুর্গাবাড়ীর কাছে বিহারের প্রসিদ্ধ উকীল শালীগ্রাম সিংহের বাড়ীতে আমরা ছিলাম। এই বেড়াবার কথা বেশ মনে আছে। অসংখ্য হনুমান ছিল দুর্গাবাড়ীতে—তাদের তাড়া দিলে তারা উল্‌টে আমাদেরই তেড়ে আসত। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়া—ছোট ছোট গলির মধ্যে ঘোরা—কত দোকান, কত খেলার জিনিস, খাবার সামগ্রী, চারদিকে যেন আনন্দের ফোয়ারা! গঙ্গায় স্নান করতে যেতাম আর স্নানের পর চন্দন পরাবার যে হুড়োহুড়ি পড়ত তাও বেশ মনে পড়ে। সেই প্রথম নৌকা চড়ার কথা মনে পড়ে। প্রথমে একটা আতঙ্ক হয়েছিল, পরে খুব ভাল লেগেছিল। গঙ্গাগর্ভে দুর্গাপুজার প্রতিমা নৌকাযোগে নিয়ে যাচ্ছে—কত বাজনা বাজছে তার সঙ্গে এ যেন ছবির মত ভেসে আসে। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বেড়াতে এলেন। পরে এঁর কথা আরো লিখব। তখন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করেছিলাম। তিনি আমার ছোট বোন অমলার—তখন তার তিন বছর বয়স—মাথার ফোঁড়া ফাটিয়ে

দেন—তাই দেখে কিছুদিন তাঁকে সব-জান্তা বলে ভাবতাম। বাংলা বলেন, সংস্কৃত বলেন, গান করেন, হাসাতে পারেন, আবার ফোঁড়ার চিকিৎসা করেন—এই সব তখন সাধারণ লোকের গুণ বলে মনে হত না। কলকাতা ফিরে এসে স্কুলে পড়ার চাড় আরো বেড়ে গেল।

১৯০৯ সালে মিত্র ইনস্টিটিউসন্ তার পুরাতন বাড়ী ছেড়ে হরিশ মুখুজ্জে রোডে প্রকাণ্ড নতুন বাড়ীতে উঠে এল। সে কি আনন্দ। মনে হত যেন আমাদের নিজের থাকবার কোন একটা বাড়ী হল। ১৯০৯ সালে আমার খুব বেশী রকমের পান ও আসল মিশ্রিত বসন্ত হয়। সকালবেলা পড়তে বসে শরীর খারাপ লাগল, মাস্টারমশায় কপাল দেখে বল্লেন, গরম ঠেকছে আর সব ঘামাচিতে ভরে গেছে। বাবার কাছে গিয়ে দেখাতে তিনি খুব ব্যস্ত হযে বাহিরের ছাদে নিয়ে এলেন। বল্লেন—এ বসন্তের মত লাগছে। সকলেই বলতে লাগল যেন আমি কাউকে না ছুঁয়ে ফেলি। দুতলার ছোট ঘ র আমাকে রাখা হল। এত ভয় করত তখন, ভাবতাম বুঝি খুব বেশী রকমের অসুখ হয়েছে, সেজন্য কেউ কাছে আসে না! শুধু মা আসতেন আর কাছে থাকতেন। অন্য ভাইবোনেরা বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখত ও ডাকত। জামাইবাবু এসে দূরে বসে গল্প করতেন, তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে খুব ভাল লাগত। কয়েক সপ্তাহ পরে সেরে উঠলাম।

তারপরই আমাদের বাড়ীতে তিনতলায় নতুন ঘর তৈরী হল। তখন সে কি উৎসাহ। নতুন ঘ'র কবে আমরা থাকব এই ভাবতেই তখন আমোদ ছিল।

ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলাম সবাই বলে। লোকদের রাগিয়ে দিতে, একটু-আধটু মারপিট করতে ভালই লাগত। অন্য ভাইদের যা হবে আমার তা চাই—তা না হলে খুব রাগারাগি করতাম। আমার প্রথমে নাম রাখা হয় বেণী। স্কুলে যাবার কিছুদিন পরে যখন শিশুপাঠ পড়ছি, তখন 'বেণী'র গল্প পড়লাম। 'বেণী বড় দুরন্ত ছেলে' ইত্যাদি। সবাই আমাকে ক্ষেপাত যে আমিই সেই বেণী। আমারও একটুও ভাল লাগত না বেণী নাম ধরে কেউ আমাকে ডাকে। বাবাকে এসে ধরলাম যে বেণী নাম আমার বদলাতেই হবে। তখন নাম হল শ্যামাপ্রসাদ। সব ভায়েদের প্রসাদ দেওয়া নাম রাখা ঠিক হল। ১৯০৯ সালে আবার বাড়ীতে বজ্রাঘাত হল। নভেম্বর মাসের শেষদিকে—বোধহয় ২৯শে হবে—জামাইবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। সে কয়দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে। জামাইবাবুর শরীর খুব ভাল ছিল না—হাঁফানির মত হত মাঝে মাঝে। দেওঘরে কিছুদিন বেড়াতে যাবার কথা হল। যাবার আগের দিন বৈকালে তিনি নিজে মার্কেটে গিয়ে তাঁর দরকারমত জিনিস কিনে আনলেন। আমাদের জন্যে লজেন্‌স্ এল। রাত্রে বাবার সঙ্গে খেলেন। কত গল্প হল আমাদের সঙ্গে। তারপর আমরা তিনতলায় শুতে গেলাম। তিনি দুতলায় ভিতরের বড়ঘরে শুতেন। রাত্রে যখন ঘুমিয়ে আছি, বাবাকে মামা এসে ডাকলেন। বাবা, মা নীচে চলে গেলেন। আমাদের ঘুম ভেঙে গেল—কিন্তু ভয়ে আমরা নামতে পারলাম না। খানিক পরে বাবা শুধুপায়ে উপরে আমাদের ঘরে এসে খাটের কাছে

দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—'ভুনুবাবা, ভুতুবাবা. সব শেষ হয়ে গেল, ব্রজেন চলে গেল।' এ আজ কত বছর আগের কথা। কিন্তু বাবার সেই গলার স্বর, তাঁর সেই বেদনার ডাক, যেন আজও কানে বাজছে। আমরা তাঁর সঙ্গে নীচে গেলাম। বড় খাটের উপরে জামাইবাবুর দেহ পড়ে আছে। সেই প্রথম মৃত্যুর পরিচয় পেলাম। আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। চারদিকে কান্নার রোল। ঠাকুরমা পাশের ঘরে শুতেন—তিনি দালানে বসে চীৎকার করে কাঁদছেন। ঘরের মধ্যে মা দিদিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পড়ে আছেন। বাবার চোখে জল নেই, কিন্তু কি নিদারুণ তাঁর মূর্তি সেরাত্রে দেখেছিলাম।

পরে মামার কাছে সব বিবরণ শুনলাম। মামা বাবার বাহিরের ঘরে এক ছোট খাটে শুতেন। রাত ১২টার পর জামাইবাবু মামাকে গিয়ে ডাকেন ও বলেন তাঁর হঠাৎ বুকে বড় ব্যথা ধরেছে। মামা তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবাকে ডাকতে যান। তখন জামাইবাবু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। জল গরম করার জন্য চাকরদের ডাকা হয়। পাশের বাড়ীতে ডাঃ গিরীন্দ্রবাবু থাকতেন। তাঁকে তখনি নিয়ে আসা হয়। প্রথমে মনে হয় হয়ত হাঁফানির আক্রমণ হয়েছে। অল্প কিছু ঔষধ দেওয়া হয়— হাঁফানি কমার জন্য ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন। কিছুতেই কিছু হল না। চিকিৎসাই হল না। একঘণ্টাও তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেননি। খাটের ধারে বসে ছিলেন—শুয়ে থাকলে নিঃশ্বাস টানার বেশী কষ্ট হচ্ছিল। সেইভাবেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

অকস্মাৎ এই নিদারুণ আঘাতে সবাই যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। সেই রাত্রে জামাইবাবুর মাকে চাউলপটী রোডের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা হল—এই ছিল বিধবার একমাত্র পুত্র। সে কি করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম, জীবনে ভুলতে পারি নি। দিনের পর দিন বাড়ীতে যেন থাকতে পারা যেত না। বাবা একদিন বিছানা থেকে উঠতে পারেন নি। দিদির চেহারা দেখে আমাদের দুঃখ হত, ভয় হত। কি অভাগিনী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। সুখ যখন ভাগ্যে নেই, মানুষ শত চেষ্টা করলেও তাকে খণ্ডন করতে পারে না।

— — —— ———

স্মৃতিকথা এই পর্যন্ত লেখা।

শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী

৩রা জানুয়ারি—২৭শে জানুয়ারি, ১৯৪৬

মধুপুর
৩।১।৪৬
সন্ধ্যা—৬টা

দুই বৎসর পরে এই খাতায় আবার হাত দিলাম। গত কয়েক বৎসরে প্রায়ই মনে হয়েছে ঠিকমত ডায়েরী লিখি—কিন্তু আরম্ভ করে শেষরক্ষা করতে পারি না। এই ক' বছরে কত ঘটনা ঘটে গেল যার হিসাব রাখা সোজা কাজ নয়। এবার মধুপুরে এক মাসের মধ্যে মোটামুটি ভাবে সব ঘটনার একটা বিবৃতি লিখে ফেলব এই ঠিক করেছি। কাজে কতদূর পারব তা জানি না।

২৫শে ডিসেম্বর মধুপুরে এলাম। তার এক মাস পূর্বে হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়ল। তখন ইলেকশনের ব্যাপার নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কিন্তু এবার অসুখ বাড়াবাড়ি ধরনের হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত নিজে নির্বাচনের দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়ালাম। এখানে এসেছি একটু বিশ্রাম নিয়ে শরীর সারাতে। মনের মধ্যে নানা কথা তোলপাড় করে। সব কি লেখার মধ্যে বাঁধা যায়? প্রথম ইলেকশন ব্যাপার নিয়ে কি হয়েছিল তাই লিখি।

দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হল সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে ঠিক হল নির্বাচনে হিন্দু মহাসভার নামে প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে। কংগ্রেসের নেতারা সব তখন মুক্তি পাচ্ছেন। নতুন জোরে তাঁরা কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই কংগ্রেস নেতারা জেলে আবদ্ধ হয়েছিলেন। গত তিন বৎসরে হিন্দু মহাসভা সব দিক দিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী জানিয়েছে, বিপদে-আপদে দেশকে সেবা করার জন্য এগিয়ে গেছে, মুসলিম লীগ ও ইংরেজের মিলিত চেষ্টায় যখন হিন্দু দলিত হয়েছে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

আরো অনেক কিছু হিন্দুসভা এর মধ্যে করেছে যার বিশদ বিবরণ দেবার প্রয়োজন এখানে নেই। মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি শুধু ইংরেজ পোষণে বাড়েনি —কংগ্রেস ও তার নেতৃবৃন্দ অনেক সময় লীগের আবদার সহ্য করেছেন, তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, জিন্নার পায়ের তলায় গান্ধীজি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লুটিয়ে পড়েছেন। এই সর্বনেশে তোষণ-নীতির ফলে লীগের শক্তি আরো বেড়ে উঠেছে। লীগকে যতই অপছন্দ করি না কেন, ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় হিসাবে তার কার্যনীতির যতই নিন্দা করি না কেন, এ কথা মানতে হবে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান জনসমাজের ভিতর লীগ এক অভূতপূর্ব নূতন প্রাণসঞ্চার করেছে। তারা ভাবে কি প্রকারে মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম-রাজ স্থাপিত হবে, কি করে তাদের জাতীয়

শক্তি ও কৃষ্টি সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু হায়, হিন্দু হিসাবে এই চিন্তা হিন্দু সমাজ করে না। কংগ্রেস তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার যে চেতনা জাগিয়েছে তার মূল্য কম নয় তা জানি। কিন্তু কিছুকাল ধরে মুসলমানদের মধ্যে যে নূতন রাষ্ট্রীয় চেতনা জেগেছে, যা দেখা দিয়েছে পাকিস্তান রূপ নিয়ে, তার বিরুদ্ধে হিন্দুকে রক্ষা করার কোন শক্তি দান করতে পারে নি। হিন্দু মহাসভার এইখানে সব চেয়ে বড় দান। ভারত স্বাধীন হোক, এ তো আমাদের কাম্য। কিন্তু ইংরেজের গোলামী ছেড়ে আমরা পাকিস্তানীর গোলামী করতে প্রস্তুত নই। ভারতে বা ভারতের কোন প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড়তে থাকবে এ আমরা স্বীকার করতে চাই না। সারা হিন্দুস্থানে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু; যদি গণতন্ত্রবাদের উপর ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠে, এটা স্বীকার করতে হবে যে তাহলে সারা ভারতের যে গভর্মেণ্ট হবে তার মধ্যে হিন্দুর প্রভাব থাকবে বেশী। আর ভারতকে খণ্ডিত করার কোন প্রস্তাবই আমরা মানতে প্রস্তুত নই।

হিন্দু মহাসভার স্বপক্ষে এত কথা বলার থাকলেও আমি জানতাম আমাদের দুর্বলতা কোথায়। আমরা যা বলেছি তার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু সেই কথা অনুযায়ী সংগ্রাম করার মত আয়োজন আমরা করে উঠতে পারি নি। দেশের লোক, বিশেষ ক'রে হিন্দুরা, যাচাই করে দেখতে চায় দেশের জন্য কোন্ প্রতিষ্ঠান সব কিছু ত্যাগ করার জন্য তার কর্মীদের ডাক দিতে পারে। গত চার বৎসর, আমি তাই বার বার বলে এসেছি যে কোন একটা হিন্দু-সংরক্ষণকারী ও স্বাধীনতার পরিপোষক হেতু নিয়ে আমরা একটা সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তা হলে যারা আমাদের মধ্যে শুধু আপন সুবিধার জন্য জড়িয়ে আছে তারা সরে পড়বে আর দেশের লোকের আস্থাও আমরা ভাল ভাবে পেতে পারব। অবশ্য হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহের সময় অথবা ভাগলপুর অধিবেশনের সময় হিন্দুসভা যথেষ্ট সৎসাহস ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু একটা ভারতব্যাপী আন্দোলন কখনও তারা করেনি, আমি কবারই চেষ্টা করেছিলাম হিন্দুসভাকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে। কিন্তু যদিও প্রকাশ্য সভায় আমার সমর্থিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হত, তাকে কার্যকরী করার নানা বাধা উপস্থিত হত। সাভারকার এ বিষয়ে কখনও আমার সঙ্গে একমত হন নি। হয়ত তিনি ভাবতেন যে আমাদের কিছু সমর্থক গভর্মেণ্ট করতে পারেন। এবং তারই সাহায্যে আমরা শক্তি অর্জন করে পরে সময়মত কাজে হাত দেব। কিন্তু তিনি যে ভাবেই এই প্রস্তাবগুলি দেখে থাকুন না কেন, আমরা দেশের মোটামুটি সুনজরে থাকলেও, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের বরণ করতে দেশবাসী ইচ্ছুক ছিল না। তারই প্রকৃত পরীক্ষা হয়ে গেল এই কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের সময়।

আমি এবার সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে আমাদের কমিটির সভায় আবার বললাম যে ইলেকশনের পূর্বে কোন একটা issue নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করি, যেমন communal award-এর ভিত্তির উপর কোন নির্বাচন চলতে পারে না। কেননা এটা ইচ্ছা করে হিন্দুদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতনরূপে জারী করা হয়েছিল। যখন এই

নির্বাচনের ফলাফলের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে তখন এই ঘোর অন্যায়কে তারা প্রত্যাহার করল। অথবা অন্য কোন একটা issue ধরা যেতে পারত। কিন্তু আমার প্রস্তাব কমিটি স্বীকার করলেন না। আমি দিল্লী থেকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরে এলাম। দেখলাম একটা হিন্দু জাগরণের সাড়া পড়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস যে অসম্ভব সবাই তা বুঝেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারাও এই কথা বলতে শুরু করায় সাধারণ লোকেরা হিন্দুসভার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদাসীন হয়ে উঠেছিল। Congress খুব বড় একটা ধাপ্পার ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল। তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, কিন্তু তারা self-determination for territorial units মানতে প্রস্তুত এবং কাউকে তারা জোর করে ভারতে রাখতে চায় না। জিন্না সাহেব তো স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিতে রাজী নন—তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে তিনি ভারতের কতকটা অংশে মুসলিম রাজ গড়তে চান। কংগ্রেস আত্ম-নিয়ন্ত্রণতার হিসাবে পুরা Sind, N. W. F. এবং আধা Punjab এবং Bengal দিতে রাজী—অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে মুসলমান খুব বেশী, সেখানে যদি সবাই মিলিতভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় Congress তাতে বাধা দেবে না। আমরা এর ঘোর প্রতিবাদ করি। তা হলে দেশকে যে টুকরো করা যাবে—এটা মানা হল ; তবে কতটা ভাঙা হবে এবং কি ভাবে হবে তাই নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতপার্থক্য। Cripps সাহেবও দেশকে ভাঙবার এক খসড়া এনেছিলেন। তবে তাঁর নীতি ছিল আর এক রকমের। এক হিন্দুসভাই বলেছে যে ভারতকে খণ্ডিত করা চলতে পারে না—এবং গোটা ভারত গণতন্ত্রবাদের উপর নির্ভর করে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলবে। এই অপরাধে হিন্দুসভা হল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান! যদি ভাড়াটিয়া কাগজ হাতে থাকে ও চেঁচাবার লোক বেশী থাকে দলের মধ্যে—তা হলে মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়। এই হল রাজনীতি!

যাই হোক, আমি কলকাতা ফিরে এলাম সেপ্টেম্বর মাসে। ভারতের অন্য প্রান্তে যাই ঘটুক, বাংলায় যাতে কংগ্রেস ও হিন্দুসভার ঝগড়া না বাধে, এ কথা আমি বরাবরই বলে এসেছি। তার একটু ইতিহাস এখানে লেখা দরকার।

আজ এই বিষয়ে আর লিখলাম না। আবার কাল লিখতে চেষ্টা করব।

এখন একটু অন্য কথা পাড়ি। এখানে এসেছি আজ দশ দিন। হার্টের অসুখ এবার একটু বেশী হ'ল। এখানে মা সঙ্গে আছেন, অন্তু আছে, কেনোর (আমার মামার ছোট ছেলে) বৌ ও মেয়ে আছে। সঙ্গে বারিদবরণ এসেছে। সন্তু আসার দিন আসানসোলে উঠেছিল। দুদিন কাছে ছিল। গত শনিবার আবার এসেছিল। সেদিন বিজুও আসে। তারা ১লা চলে গেল। এখানে এসে যতটা উপকার পাব ভেবেছিলাম তা এখনও পাইনি। ক'বারই ব্যথা ধরেছিল। বড় তখন কষ্ট হয়। নিঃশ্বাস টানতে পারি না। মনে হয় সামলাতে পারব না আর, ব্যথা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ দুর্বল বোধ করি। এটা হার্টের জন্য বা খানিকটা পেটে বাতাস হয় এই

কারণে—তা ঠিক বুঝি না। ডাঃ দেবেন মজুমদার এখানে যত্ন করে দেখছেন। ওষুধ খাচ্ছি, injection নিচ্ছি। আজ কাল একটু ভাল গেল। ব্যথা হয়নি। Constipation বেড়ে গেছে। ক্ষুধা খুবই কম। বেড়ানো সাবধানে করি। বাগানেই ঘুরি।

শরীর ও মন দুই এক সূত্রে বাঁধা। ইলেকশনের কথা লিখতে শুরু করেছি। এভাবে ঘটনা সব ঘটবে তা ভাবিনি। কিন্তু তার জন্য মনে খুব বেশী দাগ পড়েনি। খুব চেষ্টা করি—যতটা সম্ভব নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে। প্রতিষ্ঠান বা দেশকে দিয়েছি আমার যা কিছু দেবার—যদি সে দেওয়া কেউ গ্রহণ না করে, তার উপর রাগ করতে চাই না। হয়ত আমার দেওয়ার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি ছিল যাতে তা সফল হতে পারল না। আমি নিজে এটা মানি না যে যদি দেশ আমার দ্বারা না বাঁচে, তাহলে দেশ উচ্ছন্নে যাক। এটা বড় ভুল কথা। আমি কতটুকু? এই ৪৫ বৎসর বয়সে ভগবানের কৃপায় অনেক কিছু করার সুযোগ পেয়েছি—তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এখন যে পথে চলেছি, যদি সেখানে কোন বাধা এসে দাঁড়ায়, সেই বাধার সামনে নিজেকে লুটিয়ে দেব না, এটা সত্যি। কিন্তু তাই বলে পরাজয় যেখানে হল তাকে হেতু করে দেশের ক্ষতিকর কোন কিছু করবও না। আমার সেবা চাই না, বা আমার প্রতিষ্ঠানের সেবা চায় না এ কথা দেশবাসী যদি বলে, তাহলে তাদের উপর রাগ করে লাভ নেই। নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করে যাব—পরকে সেবা করতে চেষ্টা করব, ফলের আশা করব না—এতে যা আনন্দ সেটা সকলে বুঝতে পারে না।

কিন্তু মন ভাঙা অন্য কারণে। বড় একলা লাগে। আশ্রয় পাই না যেখানে শান্তি পাব। এ জীবনের কাম্য কি? শুধু কি ভোগবিলাস? তা নয়। এ তো বাসা-বাড়ী। যেতে হবে সবারই। ভোগ যে না করেছি তা নয়। কিন্তু এখন মনে নানা প্রশ্ন জাগে। জীবনে ন্যায়, অন্যায়—অনেক কিছু করেছি। শক্তির পরিচয় দিয়েছি, দুর্বলতার কাছেও পরাজয় মেনেছি। আজ বড় নিঃসঙ্গ লাগে। শরীরে ভাঙন ধরেছে। মৃত্যুকে ভয় করি না। এটা খুব সত্য। কিন্তু তিলে তিলে বা ভুগে মরতে চাই না। কাজ করতে করতে সংগ্রামের ভিতর যেতে যেতে, সত্যকে বরণ করতে করতে জীবন-দীপ নিবে যাক্, এই আমার কাম্য। তা কি হবে? জীবনে অনেককে কিছু না কিছু দেবার সৌভাগ্য হয়েছে। এজন্য বৃথা গর্ব করা উচিত নয়। কখনও চাইনি কারুর কাছে কিছু—দু-একজন ছাড়া। আমার মন বড় নরম।

* * *

কত ঝড় আমার উপর দিয়ে গেছে এই বয়সে। যখন ২৩ বৎসর বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলাম, সব অন্ধকার হয়েছিল। ভাবিনি যে তারপর আবার আমরা উঠে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু এ তো ভগবানের আশীর্বাদ। আস্তে আস্তে তিনি নিয়ে এলেন সফলতার সোপান দিয়ে। কত বাধা, কত ষড়যন্ত্র সব নষ্ট হয়ে গেল—সত্যের জয় হল। বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থা-পরিষদ, নানা সভা-সমিতি, বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র—সবারই ভিতর দিয়ে চলে এসেছি নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে।

কারুর কাছে মাথা নত করতে হয়নি—পিতার পবিত্র নামই ছিল সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। শুধু অর্থ মিলল না। চেষ্টা করলে তাও হত, প্রচুর হত। কিন্তু লক্ষ্মী সেরূপ সদয় হন নি। সংসারের উপর এর প্রভাব খুব ভাল হয়নি। বড়দার উপর চাপ পড়েছে খুবই। পয়সা নিজে আমি জমিয়ে রাখিনি। যা পেয়েছি দিয়েছি—নিজের খরচে, সংসারের কাজে বা পরের সেবায়। কখনও হিসাবের খাতা রাখতে চেষ্টা করিনি বা হিসাবের অংকও কষিনি। ১৯৩৩ সালে যখন সে চলে গেল—এক রকম অকস্মাৎ, একটা বড় তুফান উঠেছিল মনের মধ্যে। তাকে সমস্ত জীবন দিয়ে ভালবেসেছিলাম, সে-ও আমি ছাড়া কিছু জানে নি। অত তাড়াতাড়ি সে চলে যাবে এ আমার স্বপ্নের বাইরে ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানুষ করা কত কঠিন কাজ—তা দেখেছি এ ১২ বৎসরে। বৌদি না থাকলে ওদের মানুষ করা সম্ভব হত না। এ আমি জানি।

* * * ছেলেমেয়েরা তাকে এক এক সময়ে হয়ত বোঝে না। তারা তাদের মাকে ভুলে গেছে—সন্তু ছাড়া। আবছায়া মত তাদের হয়ত মনে পড়ে—আর হয়ত ব্যর্থতার নিঃশ্বাস পড়ে যে তাদের মা নেই। আমাকে তারা খুব চায় ও ভালবাসে। আমিও তাদের সব দিকে মঙ্গল চেয়েছি। তারা সুধার দান এই আমি ভাবি। তার স্মৃতির সৌরভ নিয়ে ফুটেছে আজ ছেলেমেয়েদের ভিতর।

৪. ১. ৪৬

Force must in the last analysis be met with force. An internal policy of non-resistance to armed violence would eventually condemn any society to dissolution.

কাল যে লিখেছিলাম ইলেকশনের বিষয়—তারই কাহিনী শেষ করতে চেষ্টা করি। কংগ্রেস আর হিন্দুসভা বাংলা দেশে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করুক এটা আমি কখনও চাইনি। আগস্ট মাসে আমি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাবার আগে কিরণশংকর রায় ও বিধান রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। গত ৬ বৎসর দলগত পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, আমি সব কাজেই একসঙ্গে মিলিত হয়ে চলতে চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে এত রকমের সুযোগ আমার হাতে এসেছে যে তখন যদি শুধু হিন্দুসভাকে দল হিসাবে বড় করতে চাইতাম, অনেক কিছু করতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি এই বিশ্বাসে যে বাংলায় কংগ্রেস আর হিন্দুসভার দুয়েরই স্থান দরকার। যতদিন হিন্দু-ধ্বংসকারী লীগ-ইংরেজ ষড়যন্ত্র চলবে ও নানা দিক থেকে হিন্দুর উপর আঘাত চলতে থাকবে, একটা হিন্দুদের জন্য রাজনৈতিক দল থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই দল ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হবে না—সহায়তাই করবে, আর হিন্দুকে রক্ষা করতে কোন রকমে পশ্চাৎপদ হবে না। আমি সব সময়ে চেয়েছি যে এইভাবে কংগ্রেস ও

হিন্দুসভার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত। বাংলায় কংগ্রেস-দলাদলি ভারত-প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সুভাষ গান্ধীজির সঙ্গে বিবাদ করেছিলেন—কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন। তাঁর অনুচরেরা কংগ্রেস থেকে ধাক্কা খেলেন। শরৎ বসুর দল কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কথা না শুনে পৃথক হলেন। এ সব ত জানা কথা। এই কারণেই বাংলায় কংগ্রেস কয় বৎসর ধরে তেমন সবল হয়ে উঠল না। আমার নেতৃত্বে যখন হিন্দুসভা গড়ে উঠল, আমি দু দলের কারও সঙ্গে ঝগড়া করিনি। সদ্ভাবই রেখেছি সবার সঙ্গে, আর যখন কোন বড় বিপদ এসেছে—সব দল যাতে একত্র কাজ করতে পারে তার পথ খুঁজেছি।

শরৎ বসু যে মুক্তি পাবেন এটা কংগ্রেসের লোকেরা জানতেন না—কেউই জানতেন না। খানিকটা নিজেদের দুর্বলতার কথা ভেবে, খানিকটা আপোসে মিটমাট করা ভাল এই ভেবে কিরণবাবুরা গোড়া থেকে বলেছেন যে আমাদের সঙ্গে ইলেকশন ব্যাপার নিয়ে একটা মিটমাট করে নেবেন। তারপর শরৎ বসু মুক্তি পেলেন হঠাৎ। তাঁর মুক্তির জন্য সবাই আমরাও যথাসাধ্য আন্দোলন করেছিলাম। তাঁকে আমরা সকলেই অভিনন্দিত করে বাড়ি আনলাম। খুব আশা হয়েছিল যে তিনি এসে যথার্থ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাকে বাঁচাবার জন্য একত্র কাজ করতে নামবেন। তিনি প্রথমেই যে ভাবে Wavell Plan, Simla Conference, Self-determination-এর বিরুদ্ধে বল্লেন তাতে খুবই মনে আশা হল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে কথা বলার ঝোঁক খুব বেশী ও গোড়া থেকেই জহরলালের উপর কটাক্ষ করার খুবই আগ্রহ। কয়েকটা অযথা কটূক্তি করতে ছাড়লেন না। নিয়ে এলেন টেনে চ্যায়াংকী সেক্‌কে, সে নাকি দেশদ্রোহী ইত্যাদি। আমার সঙ্গে যখন আলাপ হল দেখলাম খুবই অহং-ভাবাপন্ন। খানিকটা হওয়া স্বাভাবিক কেননা লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে দেশে ফিরে আনল। যা হোক্ আমাকে বল্লেন একসঙ্গে কাজ করতে তিনি ইচ্ছুক, তবে কিভাবে হবে তা তিনি বম্বে থেকে ফিরে এসে বলবেন। তিনি বম্বে চলে গেলেন। সেখানে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা পেলেন। মাথা আরো ঘুরল—গান্ধীকে যেভাবে লোকে অভ্যর্থনা করেছিল, ঠিক তারপরই তাঁর অভ্যর্থনা—ইত্যাদি। বাড়ী ফিরে আসার পর আমার সঙ্গে আলাপ হল। Central Assembly নিয়ে আমি ৮ টার মধ্যে তিনটা seat চেয়েছিলাম, অথবা ৬টা general seat-এর মধ্যে ২টা। আর দুটো special seat-এর জন্য পার্টি থেকে কোন প্রার্থী থাকবে না। কদিন ধরে আলোচনা চলল। শেষে তিনি বলে দিলেন টেলিফোন দ্বারা, যে দুটোর বেশী তিনি রাজী নন। আমি আগেই বলেছিলাম যে আনন্দমোহন পোদ্দার—নারায়ণগঞ্জ হিন্দুসভার সভাপতি মহাজনসভার সিট পাবেনই। সুতরাং দুটো মানে পোদ্দার আর আমি। আমি একজনকে general seat থেকে চেয়েছিলাম—সনৎ রায়চৌধুরীকে। যা হোক যখন তিনি দুটোর বেশী রাজী নয় বল্লেন, আমিও বলে দিলাম যে তাহলে Contest হবে। আমি সেই রাত্রেই কলকাতা ছাড়ি। তখন যদি সামনা-সামনি তাঁর সঙ্গে কথা হত, হয়ত পরে যা সব গোলমাল হয়েছিল তা

বন্ধ হতে পারত। আমি যখন মন্দার হিল থেকে মধুপুরে এলাম তখন খবর পেলাম যে ৬টা general seat-এর মধ্যে দুটো দেবার জন্য শরৎবাবু রাজী হয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের অন্য প্রতিনিধিরাও তাই বুঝেছিলেন। আমি তখনই শরৎবাবুকে লিখলাম যে তাহলে কোন ঝগড়ার কারণ থাকে না। তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন যে ৮টার মধ্যে দুটো এই দিতে তিনি রাজী ছিলেন। আমি কলকাতায় ফিরলাম। বন্ধুবান্ধবেরা, যাঁরা দুদলেরই সুহৃদ, তাঁরা ঘোরাফেরা করলেন। আমি তাঁদের বল্লাম আমি কি চেয়েছি। শরৎবাবু দেশবন্ধু পার্কে বক্তৃতা করলেন—সেখানে আমার উপর কটূক্তি করলেন যথেষ্ট। বলে ফেল্লেন ৬টার মধ্যে ২টা seat দিতে তিনি রাজী ছিলেন। আমি তাঁকে লিখলাম—এ হলে এখনও মিটমাট হয়। তিনি আমাকে দোষারোপ করে উত্তর দিলেন। আমি মাথা ঠাণ্ডা করে জবাব দিলাম। মেটানো তখন তাঁর ইচ্ছা নয়—Too late -high command বিরুদ্ধে ইত্যাদি অছিলার আশ্রয় নিলেন।

আমার নিজের দাঁড়ানো নিয়েও খুব গোলযোগ হল। আমি বর্ধমান বিভাগ থেকে দাঁড়াব ঠিক করেছিলাম; শরৎবাবু জানতেন একথা। তিনি সেখান থেকে দাঁড়াবেন বলে প্রকাশ হল। আমি তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অশোভন হবে বলে কলকাতা থেকে দাঁড়াব ঠিক করলাম। এই শুনে তিনি দু'জায়গা থেকেই মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন। আমি তখন Calcutta Suburbs থেকে দাঁড়াব স্থির করলাম। আমাদের পক্ষ থেকে দাঁড়ালেন সনৎ রায়চৌধুরী (কলিকাতা), মেয়র দেবেন মুখোপাধ্যায় (প্রেসিডেন্সী), বর্ধমান থেকে বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. সি.—আমি (সাবারবন্), নরেন দাস—(বরিশাল ঢাকা ইত্যাদি)। মনোরঞ্জন চৌধুরী (চট্টগ্রাম রাজসাহী)। জমিদারের পক্ষ থেকে আমরা সমর্থন করলাম রাজেন্দ্রসিংহ সিংহীকে। এর ভিতর কে কেমন ব্যবহার করলেন তার একটু ইতিহাস লেখা দরকার।

যখন শরৎবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে তখন ক্ষিতীশ নিয়োগী (যিনি কংগ্রেসের পক্ষে ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর থেকে দাঁড়ালেন) আমার সঙ্গে দেখা করেন। সূর্য বসু (ঢাকার) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বলেন যে কোন দলের পক্ষে তিনি কখনও দাঁড়াবেন না। বিশেষ করে কংগ্রেসের নাম নিয়ে তিনি দাঁড়াতে রাজী কখনই হবেন না—শরৎ বসুর বিষয়ে অনেক কথাই বল্লেন—দাম্ভিক, অহংকারী ইত্যাদি। আর এই কারণে তিনি কোন দলের হয়ে দাঁড়াতে নারাজ, কেননা তিনি এসেমব্লীর সভাপতির পদের জন্য প্রার্থী হতে চান। আমি তাঁকে মহাসভার পক্ষ থেকে দাঁড়াতে বল্লাম, তাতে তিনি সম্মত হলেন না। Independent supported by Mahasabha বল্লাম, বল্লেন ভেবে দেখবেন। তবে কথা দিলেন যে কংগ্রেসের টিকিটে তিনি দাঁড়াবেন না। পরে আমাদের কিছু না জানিয়ে ইনি দরখাস্ত পাঠালেন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের কাছে।

সবচেয়ে জঘন্য ব্যবহার পেলাম আনন্দমোহন পোদ্দারের কাছ থেকে। তাঁকে বাঁচাবার জন্য শরৎবাবুর সঙ্গে আমার মিটমাট হল না। তিনি হিন্দুসভার লোক। তাঁর নিজের নাম জাহির করবার জন্যে, যাতে Narayanganj Municipality-র

সভাপতি হতে পারেন এইভাবে সভ্য মনোনীত করার জন্য আরো নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছি। যাতে তিনি uncontested যেতে পারেন—তড়িত রায়ের ছেলেকে অনুরোধ করে তাঁর form দেখে দেওয়া—সব করলাম। কখনও ঘুণাক্ষরে আমাকে বলেন নি যে তিনি আমাদের বিপক্ষে যাবেন। আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, কত কথা শরৎ বসু ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে বলে গেলেন। আর তারপর আমাকে না জানিয়ে খবর না দিয়ে uncontested elected হয়ে বিবৃতি দিলেন যে তিনি Congress দলে যোগদান করবেন। আরো বল্লেন যে Congress-এর সঙ্গে seat-এর সংখ্যা নিয়ে যারা ঝগড়া করছে তারা দেশের শত্রুতা করছে ইত্যাদি। মানুষের এই বিকৃত ও বিশ্বাসঘাতক রূপ দেখে চমকে যেতে হয়। দেশ নীতি কিছু নয়, সমাজের নীতি কিছু না, দল বা মত যা নিজের বলে জাহির করেছি—তার পর শ্রদ্ধা রেখে বিশ্বাস রাখা কিছু না—নিজের সুবিধার জন্য যখন যেদিকে যাওয়া যায় তাই চলঃ—এই হল আনন্দ পোদ্দারের নীতি। আর এই মানুষকে নিয়ে কংগ্রেসের নেতারা খুব মাতামাতিও করলেন। একবার ভাবলেন না যে-লোক সুবিধাবাদী হয়ে আজ আমার বিশ্বাস-ঘাতকতা করল সে দেশের কোন বড় কাজে লাগতে পারে না, আর কাল বা পরশু সে অবাধে কংগ্রেসের বুকেও হাসিমুখে ছুরি মারতে পারে।

আরো কতক হিন্দুসভার সভারা এইভাবে আমাদের ছাড়তে লাগলেন। প্রথম সর্বনাশ করলেন পাঞ্জাবের গোকুলচাঁদ নারাঙ। তিনি স্যার উপাধি ছাড়লেন আমাদের নির্দেশমত। Assemblyতে দাঁড়াতে প্রথম ইতস্তত করলেন। পরে আমার কথায় রাজী হলেন। শেষে—পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতাদের assurance-এ সন্তুষ্ট হয়ে নিজেও election থেকে সরে দাঁড়ালেন। আবার বিবৃতি দিলেন যে Pakisthan and party-র বিরোধিতা Congress করবে বলেছে, সুতরাং আর election লড়াই করা নিষ্প্রয়োজন। Self-determinationএর ভয়াবহ পরিণতি পঞ্জাবের উপর কি হতে পারে তা ভাবলেন না। আর আমাকে জিজ্ঞাসা না করে নিজে সরে দাঁড়ানো বা কোন বিশেষ নীতিকে সমর্থন করে বিবৃতি দেওয়া হিন্দ সভা প্রতিষ্ঠানের উপর যে ক্ষতি করতে পারে তাও তিনি ভাবলেন না। Frontier Provinceএর মেহেরদচাঁদ খান্না আর এক খেলা খেল্লেন। হিন্দুসভার সভাপতি থেকে কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন এবং কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হলেন। তবু হিন্দুসভা ছাড়লেন না। নিজে হিন্দুসভার সেবাও করব না—আবার পদও ছাড়ব না—এ অদ্ভুত নীতি চালালেন। আমি তাঁকে পদত্যাগ করতে অথবা ঠিকভাবে হিন্দুসভাকে বড় করতে—যেটা তিনি সত্যি চান, তাই বেছে নিতে বল্লাম। তিনি সময় চেয়ে আরো কিছুদিন কাটালেন। পরে হিন্দুসভা ছাড়লেন এক বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে নানা অবান্তর কথা লিখলেন, সব পুরানো কাসুন্দি নিয়ে নাড়াচাড় করে নিজেই তৃপ্তি পেলেন।

৮. ১. ৪৬

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা

দু'দিন আর লেখা হয়নি। অন্য লেখা লিখেছি—নতুন খাতায় জীবনের ঘটনা গোড়া থেকে লেখবার চেষ্টা করছি। সেটা বাংলায় লিখছি। ইংরাজীতে ছোট ডায়েরী রাখছি। আর গত ছ'বছরের ঘটনার চুম্বক যা কিছুদিন আগে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, তাও বলে যাচ্ছি, ইংরাজীতে টাইপ হয়ে লেখা হচ্ছে।

কাল থেকে একা আছি। নীচে মা-রা আছেন; উপরে আমি একা। পড়া-শুনায় সময় কাটে বেশ। তবে নানাভাবে মন আলোড়িত হয়; তখন শুধু বইয়ের সঙ্গ ভাল লাগে না। অন্তু ক'দিন কাছে ছিল, অনেকভাবে কাজে লাগত। তা ছাড়া কথা বলায় সময় কাটত। এখন যত বয়স হচ্ছে, একা থাকার খারাপ দিকটা বেশী করে মনে পড়ে। বই বড় ভাল সঙ্গী এ মানি। বড় লেখকরা সামনে এসে তর্ক করেন না, কিন্তু লেখার ভিতর দিয়ে নানা রকমের তর্ক মনের মধ্যে জাগিয়ে দেন। রকমারী বই পড়লে দিন একঘেয়ে ভাবে কাটে না। মনে হয় লেখকদের সঙ্গে বেশ মনের সদ্ভাব রেখে বন্ধুতা গড়ে উঠছে। কিন্তু মনে যে কথাগুলো ভেসে ওঠে, তা বলবার সঙ্গী পাই না। অন্তু সে সঙ্গী ছিল না এটা ঠিক, তবে ছেলের মন কোন্ দিকে বেড়ে উঠছে এ লক্ষ্য করাও একটা বেশ ভাল অভিজ্ঞতা।

আমার মন বড় চাপা এটা নিজে বেশ বুঝি। অল্প বয়স থেকে দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে চেপেছে। ছেলেমানুষীর ভাব খুবই ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু বাইরের জীবনে অনেক গুরু কাজের ভার মাথার উপরে আসায় অন্যভাবে মন গড়ে উঠেছে। সেরকম বন্ধু হিসাবে কেউ আসেনি এগিয়ে। কলেজে যাদের সঙ্গে খুব প্রীতি হয়েছিল, তারা একে একে ভিন্ন পথে চলে গেছে। এখন তাদের সঙ্গে দেখা হলেও একটা ব্যবধান যে দাঁড়িয়ে গেছে তা বেশ লক্ষ্য করি। কাজ আর কাজ এই নিয়ে সারাদিন কেটেছে—অন্য কথা, আমোদ করার কথা, গল্প করার কথা, ভাবতেও পারি নি। আর কাজ মানেই সংঘর্ষ আর বাগ্‌বিতণ্ডা। মন যে শান্তি চায়, তা খুঁজে পাইনি কাজের মধ্যে। কত চাতুরী, কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কত ছল—এই ত হল সংসার। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছু নেই। গোটাকয়েক মানুষকে দেখেছি যারা এসেছে অযাচিতভাবে—স্বার্থের কোন সম্পর্ক না রেখে। কিন্তু একটা মানুষ যদি তার নিত্য ব্যবহারের মধ্যে খালি সংসারের টানা-পড়েনের ভিতর পড়ে থাকে, তার চেয়ে হতভাগ্য কে থাকতে পারে! সেইজন্য মন চায় মাঝে মাঝে কেউ এসে আমাকে মানুষ হিসাবে কাছে ডেকে নিক্—যার কাছে কিছু দিতে হবে না—যে তার অফুরন্ত সমবেদনা ও প্রীতি দিয়ে আমার মনের ঘা সারিয়ে দেবে। এই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান, যেটা নিঃস্বার্থভাবে গড়ে ওঠে, এই সম্বন্ধই স্থায়ী হয়।

১৯৩৩ সালে যখন সুধাকে হারাই, তখন জীবন এত কর্মময় হয়ে ওঠেনি। তার উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল—সে অযাচিত ভাবে তার ফুটন্ত জীবনের যা কিছু দেয় ছিল তা আমার কাছে নিবেদন করেছিল। ১১ বৎসর বিবাহিত জীবনে এত আনন্দ এত সুখ পেয়েছিলাম তা বলতে পারি না। বাইরের জীবনের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না—তখন আমিও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে এত জড়িয়েছিলাম যে অন্য কাজ করার অবকাশ ছিল না।

সে যাবার পর যে ভাবে আঘাত পেয়েছিলাম তা ভুলতে পারি না। বাইরে শোক চেপে রাখার ক্ষমতা আছে। যেদিন তার মুখাগ্নির জন্য সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলাম, তার পরদিন কলেজে গিয়েছি, কোর্টে গিয়েছি, সব কাজও করেছি। কিন্তু এটা বলা ভুল হবে যে মনে তখন শোকাগ্নি জ্বলছিল না। যে অভাব তখন হয়েছিল—সেটা দৈহিকের চেয়ে মানসিক বেশী। মন এতই নির্ভরশীল যে বিনা অবলম্বনে মনস্থির করতে পারি না। পুনরায় বিবাহ করার কথা মনে আনিনি—শুধু তাকে ভালবাসতাম বলে নয়। আমার ছেলেমেয়েদের আমি বুকের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি। তারা যাতে কোনভাবে মায়ের অভাব না বোধ করে, এটা আমার বড় দায়িত্ব ছিল। নূতন কোন মানুষ বাড়ীতে তাদের মায়ের স্থান দখল করলে শুধু তাদের মানসিক আঘাত যে প্রবল হত তা নয়, তার আগমনে হয়ত এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হত যার সমাধান করতে আমাদের ঘোর অশান্তির মধ্যে ডুবতে হত। দৈহিক সুখের প্রয়াসী খুব কখনই ছিলাম না। তার অভাব বোধও খুব করিনি। কিন্তু চেয়েছিলাম এমন একজনকে যে আমাকে ঠিক বুঝতে পারবে এবং তার আন্তরিক শুভকামনা দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখবে—তার কাছে অনুপ্রেরণা পাব—আমার রুদ্ধ চিন্তার ধারাকে যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে নিতে পারবে।

বৌদি ছেলেমেয়েদের খুবই আপন করে টেনে নিয়েছিল—না নিলে তারা মানুষ হতে পারত না। মাতৃহারা অভিমান-পূর্ণ হৃদয় অনেক সময় ভুল বোঝে এবং যদি বাহিরের মত তাকে এই ভুল থেকে না সরিয়ে রাখে, অনেক সময় হয়ত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আমার বিশ্বাস আমার ছেলেমেয়েরা বোঝে যে কিভাবে তারা তাদের জ্যাঠাইমার কাছে ঋণী। মান-অভিমানের পালা মাঝে মাঝে হলেও এই বোধটুকু তাদের আছে আমি বিশ্বাস করি। তারা বড় হত না, মানুষ হত না—তাদের জেঠাইমার স্নেহ-মমতা ছাড়া। কিন্তু তার চেয়ে কম কথা নয়—যেভাবে আমাকে বাঁচিয়েছে বৌদি তার প্রেরণা দিয়ে। আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করার তার শক্তি হয়েছিল—এবং আমাকে সে বাঁচিয়ে তোলে। যখন সে দেখে যে শোক ও দুঃখ আমাকে বাহিরে খর্ব না করলেও আমার ভিতরটা তিলে তিলে পুড়ে যাচ্ছিল। যখন ১১ বৎসর বয়সে ১৯২০ সালে আমাদের বাড়ীতে সে আসে, তখন সুধানাথবাবুর বাড়ীতে বাবার সঙ্গে আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রথম থেকেই সে এই বাড়ীতে বধূরূপে আসুক, এই আমি চেয়েছিলাম ও বাবাকে আমার স্পষ্ট মত জানিয়েছিলাম। এক সঙ্গে ১৩ বৎসর সংসারের সুখ-দুঃখের ভিতর আমাদের জীবন কেটেছিল—যখন সুধা

অকস্মাৎ চলে গেল। বৌদির সঙ্গে ঝগড়া, অভিমান অনেক করেছিলাম। কত সামান্য কথা নিয়ে মনান্তর হত, এখন ভাবলে ছেলেমানুষী মনে হয়। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক ছিল এবং তার মধ্যে কোন তিক্ততা ছিল না। যখন আমার ঘোর বিপদে আমার ছেলেমেয়েদের ভার নিজেই নিল তখন আমি নীরবে তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম, সেই কাল-রাত্রে হাসু—যার বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র—তাকে জড়িয়ে ধরেছিল তার মার মৃতদেহকে দেখে শঙ্কাকুল হয়ে—চল বাড়ী যাই জেঠাইমা। তার কিছুদিন পরে যখন সন্তুর টাইফয়েড হল তখন আমরা আরো জানলাম নিজেদের। তার পূর্বে দেখতাম সব কর্তব্যপালন করছে, কিন্তু ঠিক খোলাখুলি কথা বলতে এগিয়ে আসত না। যখন সন্তুর জীবন-প্রদীপ জ্বলবে কি নিবে যাবে এই কঠিন প্রশ্ন আমার মনে জাগছিল, তখন তার জেঠাইমা তাকে বুকে নিয়ে সেবা করেছিল। সন্তু সেরে উঠল, আশ্চর্যভাবে—মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এল। এর পর মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, বৌদির কাছে অপূর্ব স্নেহ ও মমতা পেয়েছি—যা আমার মনকে সবল করেছে।

* * *

মনকে গড়তে চেষ্টা করেছি—নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবের মধ্যে। এই ৪৫ বৎসরে অনেক সম্মান পেলাম সংসারে যার সাধারণ ভাবে দাম খুব বেশী। মানুষ দুঃখ পায় কেন? 'আমি' ও 'আমার' এই দুয়ের প্রবল আকর্ষণেই যত গোলমালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি এই আমিত্ব ও আমারত্ব ভাব কমানো যায়, তাহলে মনে কত শান্তি হয়, তা যে না ভোগ করেছে সে বুঝতে পারে না। এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যদি সবই ছেড়ে দিই ভাগ্যের উপর ও আমি কিছু নই এই ভাবে বিভোর হয়ে থাকি, তাহলে প্রয়োজনকালে পরিপূর্ণ চেষ্টার লাঘব হয়ে পড়ে ও কর্মসাধনে বাধা পড়ে। আমাকে কাজ করান শ্রীভগবান। আমি নিমিত্ত। কাজ তাঁর করতেই হবে—আজ আমাকে দিয়ে, কাল অন্যকে দিয়ে। যখন আমাকে দিয়ে করাবেন, তখন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব এবং সেই কাজ যতটা সম্ভব ভালভাবে করতে চেষ্টা করব। সেখানে ফাঁকি দেব না বা অযত্ন করব না। ফল পাব কি পাব না—এটা তুচ্ছ কথা। চেষ্টা করব তাঁরই নির্ধারিত পথে চলতে। যদি ফল পাই, আমার সাধন পরিপূর্ণতা লাভ করল বুঝব। যদি ফল না পাই, আমার কোন ত্রুটি হয়েছে, এই ধরব। পুনরায় চেষ্টা করব— ও যদি প্রেরণা পাই যে এ কাজ তিনি আমাকে দিয়ে করাবেন না—সে কাজ ছাড়তে দ্বিধা করব না ও অন্য পথ ধরব। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হ'ল—আমিত্ব ভাবকে ছাড়তে হবে—তা না হলে শান্তি নেই।

আমি যে সব বিষয়ে এইভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পেরেছি তা স্বীকার করি না। চেষ্টা করেছি বিপদে-আপদে এই চিন্তাকে আঁকড়ে ধরতে। যেখানে পরাজয় হয়েছে সেখানে মনকে বুঝিয়েছি যে পরাজয়ে গ্লানি নেই—হয় আমার সেবার ভুল হয়েছে অথবা যে পথে চলেছি সেটা তাঁর ঈপ্সিত পথ নয়। আমি বড় কাজ করলাম—আমি মস্ত লোক—এই ভুল ধারণাকে মন থেকে সরাতে না পারলে ভবিষ্যৎ

অন্ধকারময়। আজ অসুস্থ শরীর নিয়ে এই নির্জন স্থানে মনকে পরীক্ষা করে দেখার আনন্দ আছে। জীবনে যা সাফল্য পেয়েছি সেটা তাঁর অনুগ্রহ, যেখানে সফলতা পাইনি, যদি চেষ্টার ভুল না হয়ে থাকে, সেই চেষ্টাই আনন্দদায়ক। আর যদি চেষ্টায় গলদ থাকে, তাহলে ত আমি নিজেই দোষী।

জীবনে সব চেয়ে আনন্দদায়ক কি? অগাধ অর্থ, প্রচুর দৈহিক ভোগবিলাসিতার জীবন, দায়িত্বহীন জীবন—এই কি কাম্য? ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যারা এইভাবে দিনযাপন করেছে, তাদের সুখ অতি অল্পস্থায়ী হয়েছে। অর্থের অনটনে সুখ ও শান্তি থাকে না—এটা ঠিক। আমি নিজেই মাঝে মাঝে এই বিষয়ে ভুক্তভোগী। কিন্তু অর্থের অধিক প্রচুরতা কিছু নয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদি থাকবে—তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আপন আদর্শমত তাদের গড়ে তুলতে পারা যাবে। বিলাসিতার জীবন নয়—তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী জীবন কাটাতে পারা যাবে। মানব-সেবা যেভাবেই হোক না কেন—পরোপকার সাধন করতে পারা যাবে। যত বেশী এই কাজের সুযোগ পাওয়া যায়, ততই সৌভাগ্য বলতে হবে। নানা দেশ ভ্রমণ ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানবসমাজের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান। জীবন গড়ে উঠবে সম্পূর্ণ সাম্য ও একতার ভিত্তির উপর। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে না, ছোট করে দেখবে না—জাতি, ধর্ম বা কাজকর্মের ভিন্নতার উপর নির্ভর করে একজন অপরজনকে ছোট বলে মনে করবে না। আমি দেখেছি ক'দিন বাড়িতে যে মেথর ও মেথরানী আসে তাদের কার্যনীতি। একদিন তারা না এলে বাড়িঘর দুর্গন্ধে ভরে যায়। অথচ তারা এসে আমাদের ময়লা ফেলবে, আর তাদেরই আমরা অস্পৃশ্য বলব। নোংরা কোন জিনিস বা মানুষ আমি ভালবাসি না। কিন্তু তারাই যদি পরিষ্কার হয়ে আসে, তাদের সঙ্গে একাসনে বসতে দ্বিধাবোধ করব না। সংস্কার কতদূর মানুষকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা আমাদের সমাজে পরস্পর ব্যবহারের ভিতর দিয়ে বুঝতে পারি।

এখন রাত প্রায় সাড়ে ৯টা। পাশের ঘরে মা এসে শুয়ে পড়লেন। চারদিকে কি গভীর শান্তিময় নিস্তব্ধতা। ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করছে—সে শব্দও মনে হয় খুব জোরে শোনা যাচ্ছে। মনকে জিজ্ঞাসা করছি—কেন তার এত ছটফটানি হয়? ভগবানকে ডাকতে শিখিনি প্রাণখুলে—এটা আমার একটা মস্ত অভাব। ভগবানে বিশ্বাস করি। তিনি কে, কোন দেবতার মধ্যে আছেন তা জানি না। জানতেও চাই না।

কোন দেবতা-বিশেষের ভক্ত নই। তবে যারা কোন না কোন দেবতাকে পুজো করে তাদেরও ভুল বুঝি না। ভগবান যিনিই হোন্, এই বিশ্বের সৃষ্টি ও নিধনকর্তা যিনিই হোন্, তাঁকে যখন ভক্ত ডাকে সে হয়ত চায় একটা কোন প্রতীক সামনে রাখতে। সেই প্রতীক সাহায্য করে মনকে সংযত করতে ও মনের একাগ্রতা আনতে। যদি সেই প্রতীককে সর্বস্ব বলে মনে করি, তাহলে ঠাকুর যিনি হোন্,—লুকিয়ে হাসেন নিশ্চয়। কিন্তু যদি প্রতীকের ভিতর দিয়ে তাঁকে স্মরণ করে তৃপ্তি পাই, তাহলে আমার কাজ ত সারা হল। আসল কথা, প্রাণখুলে ডাকা চাই। আমরা তাঁকে ডাকি কখন? যখন বিপদে পড়ি, ছেলের অসুখ, নিজের বিপদ, চাকরি গেল, লোক-

সান হল, সম্পত্তি যায়—তখন আর কি করা যাবে? দাও পূজো, ডাক ভগবানকে। কিন্তু তাঁকে ক'জন ডাকে বিনা বিপদের সময়? ক'জন মনে করে যখন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রচুর থাকে ও অভাবের ব্যথা মনকে আলোড়িত করে না—তাঁকে ডাকা চাই অযাচিত-ভাবে—নির্লিপ্ত ভাবে—নিঃস্বার্থ ভাবে। ক'দিন চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। সাজসরঞ্জামে প্রয়োজন নাই—পরিবেশন করতে হবে ভক্তিসুধা—তাই তাঁকে খাইয়ে তৃপ্তি পাব নিজের মনে। কি বলে ডাকি, কি ভাবে ডাকি—এতে কিছু এসে যায় না। ডাকি শুধু—ওগো দয়াময়, তুমি শুধু দেখা দাও আমার অন্তরের মধ্যে। আমি তোমার কাছে কিছু চাই না নিজের জন্য। শুধু তুমি আমাকে স্থান দাও তোমার পায়ের নীচে। তুলে নাও ডেকে নাও—তোমাকে ডাকবার মত আকুলতা দাও, শক্তি দাও। অনেক পাপ-অন্যায় জীবনে করেছি, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি সাময়িক সুখের জন্য। তোমার নিজের অগোচর কিছু নাই। ক্ষমা কর তুমি সব বুঝে। আর এমন প্রেরণা দাও যেন আর ভুলপথে না যাই। আমিত্ব ভাব—আমারত্ব গৌরব ও গর্ব নষ্ট কর। যে কাজ জীবনের অবশিষ্ট সময়ে করাতে চাও, ভালভাবে করাও, যেন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। আর যদি কোন কাজ না করাতে চাও, দুঃখ নাই। সম্মান আর চাই না। তোমার পদপ্রান্তে আশ্রয় দাও, কোন অজানা দেশে নিয়ে যাও ও মনে শান্তির বারি পূর্ণ করে দাও। জান তুমি জীবনে কে ও কাদের উপর এখন স্নেহ ও ভালবাসা আছে। তাদের কাছ থেকে দাবী কিছু করি না। তাদের মঙ্গল কামনা করি। মন বড় ব্যস্ত হয় জানি দেখবার জন্য—কিন্তু আজ মনকে সংযত করতে চেষ্টা করছি। এই সংসারের অসারতা বুঝতে পারছি। আজ আছি, কাল নেই—এই ত নিত্য-খেলা। এই নিয়ে এত মাতামাতি কেন? ক্ষণিকের পথিক আমরা—যতটা সময় এখানে থাকি, যদি কাদা-মাটি আর নোংরামিতে ডুবে থাকি সর্ব-ক্ষণ, তাহলে আর পশুর সঙ্গে আমার প্রভেদ কি? ঘরে বসে রোজ দেখি কুকুর গরুর বিচিত্র খেলা, যদি মানুষ যে তার আপন আত্মার সন্ধান রাখে, যে তার ভগবানকে জানতে পারে—সেও সব ভুলে এই নিকৃষ্ট জীবন নিয়ে ডুবে থাকতে চায়—তার চেয়ে দুঃখের কি হতে পারে?

হে ঠাকুর—তুমি নূতন প্রাণের সাড়া আমার ভিতর দাও। শুধু তোমাকে ডাকবার শক্তি দাও—এই মোর প্রার্থনা। আজ রাত্রে বিদায় নিলাম, এই চিন্তা নিয়ে। মঙ্গলময় মঙ্গলবাতি জ্বালিয়ে দিন সকলের অন্তরে। মনে দ্বেষ বা মলিনতা রাখতে চাই না। মনে মনে বুঝি আমার জীবনপ্রদীপ সহসা একদিন নিবে যাবে। তাতে আমার দুঃখ নেই। শুধু তার আগে মনকে প্রস্তুত করতে চাই ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

*　　　*　　　*

৯।১।৫৬

দু'দিন আবার শরীর খারাপ হয়েছে। আটদিন বেশ ছিলাম, কোন ব্যথা অনুভব করিনি। কাল সকালে অল্প ব্যথা হল, বেশিক্ষণ ছিল না। বৈকালেও একটু হয়েছিল। আজ সারাদিন বেশ ছিলাম। খাটে বসে বৈকালের চিঠিপত্র লিখছি, সেই সময় ব্যথা এল। পাঁচ মিনিট ছিল, তার খানিকক্ষণ অসহ্য বেদনা। নিঃশ্বাস টানতে পারি না। কেন এমন হয় জানি না। পেটে বায়ু হয়ে হার্টের উপর ঘা মারে, এই কি হবে? যথাসাধ্য সাবধানে আছি—খাই কম, যা খাই তা পরিপাক করার জন্য ক'রকমের ওষুধও খাই। তাতেও যদি এই অবস্থা দাঁড়ায়, স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটবে কি ক'রে? কোন্ দিন হয়ত এই ব্যথাই কালব্যথার রূপ নিয়ে আসতে পারে—হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত। তখন এবারের মত খেলা শেষ। যাদের খুব ভালবাসি তাদের কাছে পেতে ইচ্ছা হওয়া খুব স্বাভাবিক। যাকে অসুখের সময় কাছে পেলে মন শান্ত হয়, ভাবনামুক্ত হয়, কষ্টের লাঘব হয়, সেও দূরে থাকে। এও একটা পরীক্ষা। জীবনে হয়ত বহু কষ্ট ভোগ একাই করতে হবে—ভগবান তাই ধীরে ধীরে তৈরী করে তুলছেন। যা নেই, তা পাব না: পাবার আশাও করব না। যা আছে তাও হয়ত না পাবার সম্ভাবনা এবং না পেলেও নিজেকে একরকম চালিয়ে নিতে হবে। মার জন্য কষ্ট হয়। তাঁর বয়স হয়েছে—একা আছেন আমার কাছে। একটু অসুখ হয়েছে বললে এমন করে দাঁড়ান, এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে আমার দুঃখ লাগে বড়। তাঁরই বা শান্তি কোথায়? এখন 'ছোঁয়া গেল' বলে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সংসারের ঝঞ্ঝাট থেকে তিনি ছুটি নিয়ে নিজের পূজা-অর্চনা নিয়ে মনের আনন্দ ভোগ করুন।

আজ ক্লান্ত লাগছে—লিখতে ইচ্ছা করছে অনেক কথা। কিন্তু লেখার সামর্থ্য কম। শরৎ বসাকের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। গত রবিবার কালিম্পঙ্ থেকে ফেরার পথে শিলিগুড়ি ছাড়ার পর হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। জলপাইগুড়িতে ট্রেন পৌঁছবার আগেই মৃত্যু হয়। সঙ্গে স্ত্রী আর দুই ছেলে ছিলেন। এ প্রকারের মৃত্যু—যে যায় তাঁর পক্ষে খুবই প্রেয়। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর পক্ষে খুব অসহনীয় যন্ত্রণা হয়েছিল। এই ত জীবন। সুস্থ সবল মানুষ শীতের ছুটিতে আরামে পাহাড়ে বেড়িয়ে বাড়ি আসার সময় অকস্মাৎ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসরের উপর। বেশ ভালভাবেই জীবন কাটিয়ে গেলেন। বন্ধুভাবে সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে নানা দেশ ঘুরে, শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কর্মজীবনে ব্যাপৃত থেকে চিরবিদায় নিলেন। তেমন দেশের কোন বড় কাজের সঙ্গে নিজেকে বোধ হয় কখনও জড়াতে পারেননি সে ইচ্ছা বা অবসর হয়ত হয়নি। যত দিন যাবে, এমনই জগতের খেলা—যে ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিচ্ছবি লোকের মন থেকে সরে যাবে। অমন এস. এন.

ব্যানার্জী—যিনি একদিন কোর্টে না গেলে হাইকোর্ট কানা হয়ে যেত—বড় বড় মক্কেলরা দিশেহারা হয়ে পড়ত—তিনি চলে গেছেন আজ প্রায় দু' বছর। ক'জন আজ তাঁর কথা ভাবে বা তাঁর অভাব বোধ করে ?

আজ একটু লিখে রাখি গত দু মাসের ইতিহাস। যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি জীবনের এই অধ্যায় ততই ভাল।

মেহেরচাঁদ খান্নার কথা লিখেছি। আর একজন হলেন মহেশ্বর দয়াল শেঠ। ইনি আউধ্ সভার সভাপতি। আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও খাতির করেন। হিন্দুসভার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক বৎসর—এবং তখন নিজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। ইনি কিছুদিন থেকে দোটানার মধ্যে পড়েছেন। প্রায় বলেন, কংগ্রেসে যাব। আমাকে বলেছিলেন যখন ১৯৪৪ সালে অতিথি হয়ে লক্ষ্মৌতে তাঁর বাড়ীতে আমরা ছিলাম—যে সাভারকার তাঁর বিরুদ্ধে, তিনি হিন্দুসভাকে সেবা করতে চান কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন না। সে সুযোগ আমি সভাপতি হয়ে তাঁকে ১৯৪৫ সালে প্রথমে দিয়েছিলাম—তখন সাভারকার-দলের অনেকের আপত্তি ছিল, তাঁকে সন্দেহের চক্ষে তারা দেখত। আমি কিন্তু বিশ্বাস করে তাঁকে সকল দিক থেকে সমর্থন করলাম ও নিখিল ভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে co-opt করে নিলাম। যুক্তপ্রদেশের মহন্ত দিগ্‌বিজয় নাথ (গোরক্ষপুর) নির্ভীক ও হৃদয়বান হিন্দুনেতা। তিনি মহেশ্বর দয়ালের পূর্ণ সহায়ক। যা হোক্ গত বৎসর আউধ হিন্দুসভার প্রকৃত কাজ কিছুই হল না। যুবকেরা যারা হিন্দু মনোভাবাপন্ন, তারা অনেকে মহেশ্বর দয়ালকে দোষ দিত। তাঁর কাজের কোন বাধা ছিল না, অথচ কাজ হত না। তিনি বলতে লাগলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়। করলেও পরাজয় সুনিশ্চিত। প্রথমে তিনি নানাভাবে নির্বাচন ব্যাপারে বাধা দিলেন। পরে যখন তাঁকে বলা হল যে তিনি প্রয়োজন মনে করলে কংগ্রেসে চলে যেতে পারেন, তখন তিনি বল্লেন যে তিনি হিন্দুসভার কাজ একমন দিয়ে করবেন। পূজার ছুটিতে নির্মল তাঁর সঙ্গে যুক্তপ্রদেশে খানিক ঘুরেছিল এবং বলে যে তিনি তখন বাস্তবিক মহাসভাকে প্রবল ও জয়ী করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক একজন প্রাদেশিক সভাপতি এইভাবে নিজেকে দ্বিধার মধ্যে রেখে কাজ করলে শুধু যে সেই প্রদেশের ক্ষতি হয় তা নয়, সারা ভারতের উপর একটা ছায়াপাত পড়ে।

আজ আর লিখতে পারছি না—আবার একটু কষ্ট হচ্ছে। কি করে কতদিনে সারব জানি না। আর পারি না এইভাবে জীবন কাটাতে!

৭-১০ মিনিট, সন্ধ্যা।

১০।১
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা

কাল লিখতে লিখতে উঠে যেতে হল। বুকের ব্যথা অল্পই হয়েছিল। হঠাৎ কাঁপুনি এল। এরকম পূর্বে কখনও হয়নি। চাদর মুড়ি দিয়ে ইজিচেয়ারে বসলাম—কিন্তু থাকতে পারলাম না। শরীর বড় খারাপ লাগছিল। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। লেপ, কম্বল, মোটা চাদর, সব সমেত ৫/৬টা, গায়ে পট্টুর জামা, পায়ে মোজা, গরম জলের ব্যাগ—কিছুতেই যেন কিছু হল না। ডাক্তার মজুমদারকে ডেকে পাঠালাম। তিনি বললেন ম্যালেরিয়া জ্বর আসার আগে এরকম হয়। কখনও ম্যালেরিয়া আমার হয়নি যদিও কত জায়গায় ঘুরেছি।

রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত এইরকম চলল। তখনও গা থেকে লেপ কম্বলের বোঝা নামাতে ইচ্ছা করছিল না। রাত ১২টার পর কমল। তবে সারারাত মাথার কষ্ট ও গায়ে অসহ্য ব্যথা বোধ করলাম। ঘুম নেই শেষরাত পর্যন্ত। হয়ত Vitamin B injection বেশী dose দেওয়ার জন্য হয়ে থাকবে—ডাক্তারবাবু বললেন।

আজ সকালে শরীর খুব দুর্বল লাগছিল—মাথা ভার হয়ে আছে। তবে জ্বর ছিল না। ক্ষুধা নেই। সারাদিন শুয়ে শুয়ে কাটল। ডাক্তারবাবু দুবার এলেন। কাল যে pulse rate বেড়ে ৮৫ হয়েছিল, আজ আবার নেমে ৬৪। এখন টেবিলের ধারে বসেছি। বাইরে চাঁদের আলো ফুটেছে—ভেতরে অন্ধকার। শীত আজ অনেক কম। দিন কাটছে বেশ—এ দুর্ভোগ কতকাল সইতে হবে কে জানে। আরো বেশী যে সইতে হবে না তাই বা কে বলতে পারে।

যোগেশবাবু বৈকালে এলেন। হরিদাস মজুমদার সকালে এসেছিলেন। কতকগুলো ইংরেজী ও বাংলা বই কলকাতা থেকে আজ এল। বৌদির আজ কোন চিঠি নেই। সে আসবে বলে মনে হয় না। এলে সেখানে অনেকের অনেক অসুবিধা। এখানে আমার একার সুবিধার কথাই ভাবি আমি। এটা তো স্বার্থপরতার লক্ষণ। আজ আর ভাবিনি একথা। কাল রাত্রে অসুখে কষ্ট হচ্ছিল যখন কত কথা মনে ওঠে। মার খুব কষ্ট। কাল শুতে যেতে চান্ না। আমার ঘরে মাটিতে শুয়ে থাকবেন বলেন। আমি বারণ করলাম। তাঁকে একা এখানে রেখে খুবই চিন্তিত করে ফেলি। নিশীথ আজ চিঠি লিখেছে। বুয়া শনিবার আসানসোলে আসতে পারে—সন্তু রবিবার মধুপুরে নিয়ে আসবে। কিন্তু তার পুরাতন চাকর আসেনি—তার ভাগ্নেও কলকাতায় চলে গেছে। এক্ষেত্রে বুয়া চলে এলে তাকে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। টেলিগ্রাম করে দিলাম যেন তাড়াতাড়ি বুয়াকে এখানে না আনে। দিদিভাইকে কাছে পেলে আমার খুব ভাল লাগবে মনে জানি। কিন্তু আর অন্যকে আমার জন্য অসুবিধায় ফেলতে চাই না। তারা কি করবে শেষ পর্যন্ত জানি না।

গত দুমাসের ইতিহাসের কথা আবার লিখি। যুক্তপ্রদেশের কথাও লিখেছি। বিহারেও খুব গোলমাল দেখলাম। কোন এমন প্রাদেশিক নেতা নেই যিনি সবদিক সামলে চলতে পারেন। রায় সাহেব অরোরা লোক ভাল ছিলেন কিন্তু সংগ্রামশীল নন মোটেই। তিনি অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়লেন। সেক্রেটারী ডাঃ ত্রিপাঠী কথা বড় বড় বলেন কিন্তু খুব কাজের লোক বলে মনে হত না। এখন ত তিনি না বলে কয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। কুমার সদানন্দ সিংহের অনেক গুণ দেখেছি। কিন্তু তিনি দ্বারভাঙ্গার সেক্রেটারী হয়ে তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তিনি একটা বিরাট জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন কিনা সন্দেহ। যাহোক তিনি খাঁটি লোক এবং মিথ্যাশ্রয়ী নন। বিহারে কংগ্রেস খুবই শক্তিশালী, তার উপর আমাদের লোকেদের মধ্যে তেমন একতার বাঁধন নেই। সুতরাং আমি বিহার থেকে খুব তেমন ফল আশা করিনি। আসামে ত কিছুই আমাদের ছিল না বল্লে হয়। উড়িষ্যা আরো খারাপ। অন্ধ্রদেশের সভাপতি রেড্ডি—যিনি খুব সমারোহ করে আমাকে গত বৎসর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিছলেন—তিনি বোধ হয় সরে পড়েছেন। চিঠির জবাবও দেন না। মাদ্রাজে পঞ্চনাথন খুব ভাল লোক তবে তাঁর কাজ খুব বেশী এগিয়ে যেতে পারে না। তামিলনাড় এ সবই ফাঁকিবাজী। ডাঃ নাইডুকে বিশ্বাস কেউ বড় একটা করত না—এখন তিনি ত কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। C. P. Berar-এ কাজ কিছু হয়েছিল। কিন্তু মহাকোশলে কিছু হয়নি। জব্বলপুরেও ঝগড়া লেগেই আছে। মহারাষ্ট্রে কিছু কাজও হয়েছে মানুষও আছেন। বিশেষ করে পুণায় এখনও তিলকপন্থী একদল আছেন যাঁরা নিজেরা খুবই হিন্দুমনোভাবাপন্ন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনেক যুবককে এই ভাবে প্রণোদিত করেছেন। পুণাসহর এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলি দেখলে আনন্দ ও গৌরব বোধ হয়। তিলকের পৌত্র জয়ন্ত হয়ত একদিন মানুষ হয়ে উঠতে পারেন। বম্বেতে ধামধেরে খুব বিশ্বাসী লোক, কিন্তু তাঁর কার্যক্ষমতা কম। রাজা নারায়ণলাল বনসীলাল হিন্দুপ্রেমিক—কিন্তু বড় প্রতিষ্ঠান নিজে হাতে গড়বার মত শক্তি নেই। পুণা বম্বেতে সাভারকারকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন না এমন আছেন অনেকে। তাঁরা হিন্দুসভাপন্থী, কিন্তু উগ্র সাভারকারী নয়। আবার একদল আছে যারা সাভারকারিজম্ সৃষ্টি করছে। সাভারকার নিজে বড় বাইরে যান না। ইলেকশন্ নিয়ে কিছু করতে রাজীও হলেন না। গুজরাট ঝগড়ার বারুদখানা। দপ্ করে জ্বলে উঠলেই হল—তবে সে জ্বলা ভাল কাজের জন্য নয়, নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করার জন্য। সিন্ধু দেশে ভোজরাজ আজওয়ানী কথা খুব বলেন কিন্তু কতটা কাজের পথ খুঁজে পাবেন তা জানি না। তবে কিছু লোক আছে যারা বাস্তবিক হিন্দুসভার সমর্থক।

এই ত মোটামুটি অখণ্ড ভারতের ছবি। কংগ্রেস নেতারা জেল থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকটি কাজ করলেন যার ফলে সাধারণ হিন্দুদের মনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সংশয় ছিল তা সরে যেতে লাগল। জহরলাল, প্যাটেল প্রমুখ নেতারা ১৯৪২ সালের

ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে লোকেরা অহিংসক ছিল কি হিংসাবাদের বশবর্তী হয়ে গোলমালের সৃষ্টি করেছিল এ প্রশ্ন গান্ধীজির মত তাঁরা তুললেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পর অস্ত্রশস্ত্রহীন ভারতবাসী এ ভাবে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেনি। তাদের বীরত্ব, ত্যাগ, দুঃখ, লাঞ্ছনা—এ সবের জন্য নেতারা তাদের বরণ করলেন, অভিনন্দন করলেন। এই প্রকার প্রচারে একটা নতুন সাড়া পড়ল। তারপর পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তাঁরা জোরগলায় সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। যে ভাষা প্রয়োগ করে তাঁরা—বিশেষ করে প্যাটেল ও নেহেরু—জিন্না ও লীগকে আক্রমণ করতে লাগলেন তাতে অনেকেই মনে করলেন যে কংগ্রেস তার পুরাতন মুসলিম তোষণ নীতি ও জিন্নার পদলেহন-নীতি সত্যি এবার ত্যাগ করলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বল্লেও তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণতার দোহাই দিয়ে ভারতকে খণ্ডিত করার সম্ভাবনা ধামাচাপা দিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু খবরের কাগজের মালিকেরা এই কথার প্রকৃত আলোচনা ত করলেই না—বরং লোকের চোখে ধূলা দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করতে থাকল। আর দেশের মানুষও—বিশেষ করে স্বাধীনতার জন্য পাগল হিন্দু—এ বিষয়ে তলিয়ে দেখার চেষ্টাও করলে না। পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ করবে না, এই কথা বার বার জোরের সঙ্গে বলায় সাধারণ লোকেরা বলতে থাকল যে কংগ্রেস হিন্দুসভার এই ক বছরের প্রচারিত নীতিকে স্বীকার করে নিল—সুতরাং আর হিন্দুসভার পৃথকভাবে রাজনৈতিক কাজের প্রয়োজনীয়তা কি?

তারপর এল আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার। গভর্মেণ্ট কি কুক্ষণে এত বড় ভুল করে বসলেন জানি না। এই ফৌজের কাহিনীর কথা ও ছবি নানা দিক দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা ভারতময়। নেহেরু লাহোরের এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি সুভাষ বসু জাপানীদের সাহায্যে সৈন্যদল নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসেন, তিনি একা তরবারি হাতে তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে যাবেন। যখন কংগ্রেস নেতারা দেখলেন যে সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী সারা দেশকে আলোড়িত করছে তাঁরা এই ব্যাপারকেই সব চেয়ে বড় চোখে দেখতে লাগলেন। নেহেরু চট্ করে সুর বদলে ফেললেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি সুভাষ করেন নি। তিনি যাবার পূর্বে ভারতীয় সৈন্যেরা নিজেদের সংঘবদ্ধ করে জাপানীদের সাহায্য নিয়ে ভারত জয় করার স্বপ্ন দেখছিল। তবে তেমন বিরাট নেতৃত্ব তখন তাদের মধ্যে ছিল না। সুভাষ সেই অভাব মোচন করেন—তাঁর বিশেষ সহায়তা নিশ্চয় করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। সুভাষের পরিকল্পনা যে মহান ছিল তার কোন সন্দেহ নেই। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় সৈন্যদের তিনি একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে—এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠে ভারতীয় সৈন্যরা ভারতকে স্বাধীন করবে এই আশায় ও উদ্দীপনায় তিনি সকলকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। জয় হিন্দ্ ডাক দিয়ে দেশমাতৃকার বেদীর তলায় আত্মাহুতি দেবার জন্য এত বড় আহ্বান ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় না। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হল না—এটা দুঃখের কথা। কিন্তু পথ তাঁরা দেখিয়ে গেলেন এবং যদি কখনও ভারত স্বাধীন হয়, এই

পথেই হবে। যদি স্বাধীন ভারত তার স্বাধীনতা রাখতে চায়, এই পথই তার অবলম্বন করতে হবে—এই ধ্রুব সত্য। চরকা ঘুরিয়ে কাপড় দেওয়া যেতে পারে, আর্থিক দুঃখ কিছু মোচন করা সম্ভব হতে পারে—কিন্তু চরকা ও non-violence দ্বারা এ যুগে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতা পাওয়া বা রাখা সম্ভব নয়।

কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে military revolt—সামরিক বিদ্রোহে বিশ্বাস করে না। তারা সামরিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না যুদ্ধের সময়। তারা দেশকে যে আহ্বান দিয়েছিল, দেশবাসী তা শুনলে কেউ ভারতীয় ফৌজএ যোগদান করত না। হিন্দু-সভা ঠিক এর বিপরীত কথা প্রচার করে। তারা স্বীকার করে নেয় যে এ যুদ্ধে জোর করে ভারতকে নামানো হয়েছে—এবং যতদিন ভারত স্বাধীনতা না পাচ্ছে, এ যুদ্ধের আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করা বাতুলতা। কিন্তু ভারতীয়রা বিশেষ হিন্দুরা যাতে সামরিক বিদ্যায়—জলে স্থলে ও আকাশে—সম্পূর্ণ পারদর্শী হয়ে ওঠে—এর প্রয়োজনীয়তা খুব জোর গলায় হিন্দুসভা প্রচার করেছিল। আমি প্রকাশ্য সভায় বার বার এই কথাই বলেছিলাম যে ইংরাজ দায়ে পড়ে এই শিক্ষা আজ দিচ্ছে—হয়ত ইংরাজের হয়ে এই বিদ্যা অনুযায়ী আমাদের ছেলে-মেয়েরা লড়াই করবে। তবে এমন দিন আসবেই আসবে, যখন এই সব লক্ষ লক্ষ ভারতের সন্তান যারা সমরবিদ্যায় আধুনিক শিক্ষালাভ করেছে—এই শিক্ষার সাহায্য নিয়ে এই বিদ্যার দ্বারাই ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারবে ও দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি চিরদিনের মত দূর করতে পারবে। ঘটনাচক্রে সুভাষ আমাদেরই জীবদ্দশায় এই সত্য প্রমাণিত করে দিলেন। তবে যদি কংগ্রেসনীতি যুদ্ধের সময় দেশবাসীরা গ্রহণ করত, তাহলে তারা ভারতীয় ফৌজে যোগদান করত না এবং সুভাষ মানুষ ও মালমসলা পেতেন না, যার সাহায্যে তিনি তাঁর এই অপূর্ব আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতেন।

তবু কংগ্রেস আই-এন্-এ বিচার নিয়ে, তাদের কথা ও কাহিনী নিয়ে কি প্রবল বন্যাই না আনল দেশময়! লোকে ভাবল না, বুঝল না যে একসঙ্গে তারা গান্ধীর জয় ও সুভাষের জয় বলতে পারে না—দুইজনের নীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কংগ্রেস নেতারা ধাপ্পা দিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এই সুযোগ নিয়ে নির্বাচনের তরী সহজে ভাসিয়ে দিলেন ও তীরে নিয়ে হাজির করলেন।

আর একটি হল—কর্মীর সংখ্যা ও সংবাদপত্র। হাজার হাজার নারীপুরুষ যাঁরা কংগ্রেসের নামে জেলে ছিলেন, তাঁরা সদলে বেরিয়ে এলেন ও তাঁদের একমাত্র কাম্য হল কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করা। সংবাদপত্রেরা ব্যবসায়ের খাতিরে যেদিকে বাতাস বহে সেই দিকে নিজেদের চালিত করে। সত্যমিথ্যার খাতির নেই—ইংরাজ যা defence of India rules-এ পারে নি, বিপক্ষ দলের কথা চেপে রেখে তাকে ভেঙে-চুরে তারা বিকৃত জনমত গঠন করতে লেগে গেল। তার চমৎকার পরিচয় দিল কলকাতার হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকা। আমাদের প্রচারের অভাবে সব কাজই নষ্ট হতে লাগল।

আমাদের মধ্যেও ভাঙন ধরতে লাগল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বন্যার সামনে যেমন

ঘর-দুয়ার ভেসে যায়, সেইরকম কংগ্রেসের বিরোধী যারা দাঁড়িয়েছিল তারা সরে যেতে লাগল। কতক লোক স্বার্থের খাতিরে হিন্দুসভার নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা সরে পড়া বুদ্ধিমানের পরিচয় বলে মনে করল। হিন্দুসভাপন্থী কিছু লোকও সরে দাঁড়াল—না জিজ্ঞাসা করে বা অনুমোদন না নিয়ে। কাউকে লোভ দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল। মোট কথা আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখলাম চারদিকে। জীবনে হার-জিতটাই বড় কথা নয়। দুটো দল থাকলে দুজনেই জিততে পারে না। সত্য কি এবং সেই সত্যের উপর বিশ্বাস কতটা পরিমাণে আছে এই আসল কথা। কংগ্রেস মুসলমান কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী দাঁড় করালেন না—দু'একটি ছাড়া। যেখানে কংগ্রেস নামে মুসলমান জয়ী হলেন, সে হল যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র ও হিন্দুর ভোটের সংখ্যা বেশী। জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও অন্য নামে মুসলমান দাঁড়াল লীগের বিরোধিতা করে। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য সহযোগিতা কংগ্রেস করতে দ্বিধাবোধ করল না। কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরে জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে কোন রকম মিলন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হল। যদি কংগ্রেস লীগকে পরাজিত করে দেখাতে পারত যে বাস্তবিক মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেস প্রভাব আছে তাহলে অন্য কথা হত। কিন্তু মুসলমান, এমন কি শিখদের কাছেও কংগ্রেস পরাজিত হল। হিন্দুদের ভোট নিয়েই কংগ্রেস ব্যবস্থাপরিষদে প্রবেশ করতে পারে, অথচ হিন্দুর ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে কংগ্রেস অক্ষম এবং নিজেদের হিন্দু-প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতেও রাজী নয়। এর চেয়ে হিন্দুর দুর্ভাগ্য কি আর হতে পারে। তার রাজনৈতিক শক্তিকে লাঘব করতে, নষ্ট করতে ইংরাজ-মুসলমানে এক বিরাট চক্রান্ত ফেঁদে বসেছে। কিন্তু হিন্দু তার নিজের কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে চায় না। যে প্রতিষ্ঠান আমরা এত বাধা সত্ত্বেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি, তাকে স্বহস্তে ভাঙতে সে আনন্দবোধ করে। এর চেয়ে আত্মঘাতী নীতি আর কি হতে পারে? যে জাতি নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যেতে এত ব্যগ্র, যে জাতির আপন জাতিত্ব-গৌরববোধ নেই, যে নিজের রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা ভাবলে বা বললে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হচ্ছে বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়, সে জাতির ভবিষ্যৎ কি? শুধু ইংরেজ বা মুসলমানকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ইংরেজ এসেছিল এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভে। সেই লোভ ক্রমে রাজ্যাধিকারে পরিণত হল। তার এত বড় জমিদারী ও লাভের সামগ্রী সে সহজে ছাড়তে চাইবে কেন? মুসলমান এ দেশে তার রাজত্ব বিস্তার করেছিল—৭০০ বৎসর ধরে হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করেছিল, কখনও তাদের সঙ্গে ভাল কখনও মন্দ ব্যবহার করে। যদিও আজ তাদের মধ্যে—বহুসংখ্যক লোক একদিন হিন্দুপরিবারে অন্তর্ভুক্ত ছিল কয়েক পুরুষ পূর্বে, তথাপি তারা আজ হিন্দুবিদ্বেষী। আবার তারা এখানে তাদের রাজত্ব স্থাপিত করবে, এটা তারা ভাববার সাহস রাখে। যতদিন ইংরেজ এখানে প্রভুত্ব করবে, ততদিন হিন্দু মুসলমান দুই পক্ষই ইংরেজের গোলামী করেছে। আজ ইংরেজ চলে গেলে কে বেশী ক্ষমতাশালী হবে—এটা দুপক্ষেরই ভাবা স্বাভাবিক। মুসলমান তৈরী হয়ে উঠছে সেই সময়ে যেন তারা হিন্দুর তাঁবেদাররূপে পরিণত না হয়। যদি হিন্দু

মুসলমান মিলিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখে, যে যার ধর্ম ও আচরণ অনুযায়ী বসবাস করে, তাহলে ত গোলমালের কথা ওঠে না। কিন্তু যদি আবার মুসলমান তার স্বধর্মে অতিরিক্ত নিষ্ঠা দেখিয়ে হিন্দুর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে প্রয়োগ করে, তখন হিন্দু কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সেটা চিন্তা করে দেখেও না। একটা civil war ছাড়া হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না। Civil war আমরা চাই না—কিন্তু যদি অপর পক্ষ তৈরী হয়ে ওঠে আর আমরা প্রস্তুত না থাকি, তাহলে আমরাই ঠক্‌ব শেষ পর্যন্ত। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার কোন মীমাংসা করতে পারে নি, পারবেও না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর বোঝাপড়া করে শেষ হবে—বন্ধুভাবে মিলন হবে, অথবা সংঘর্ষের মধ্যে আপন আপন শক্তি পরীক্ষার পর আপোষ হবে। আপোষ যদি না হয়, যে অধিক শক্তিশালী, সেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। একটা প্রতিষ্ঠান যে হিন্দুর সহায়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে অথচ হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করার কথা চিন্তা করা বা বলা পাপ বলে মনে করে, সেই প্রতিষ্ঠান কি করে লড়তে পারে আর এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করাই, ইসলামের ধ্বজাকে বাড়িয়ে তোলাই তার একমাত্র কাম্য মনে করে। এই সামান্য সত্য কথা হিন্দু তার এত বুদ্ধি ও অর্থবল থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারে না, এর চেয়ে দুঃখের কথা কি হতে পারে? মুসলমান ধর্মের ভিতর এক অদ্ভুত একতা আছে —সাম্যবাদ আছে, যা হিন্দু তার নিজের ধর্মাচরণের মধ্যে সহজে পায় না। নানা জাতি ও বর্ণভেদ, প্রাদেশিকতা—এইসব কারণে এক হিন্দু অপর হিন্দুর জন্য সেরূপ সহানুভূতি বোধ করে না, যা বোধ করে কোন মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইএর জন্য —তা সে পৃথিবীর বা ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে আসুক না কেন। ভারতের সব হিন্দু এক—যতদিন না এই বোধ আমাদের ভিতর দৃঢ়ভাবে জন্মাবে, ততদিন হিন্দুর রাষ্ট্র বা তার জাতিগত প্রাধান্য এ দেশে স্থাপিত হতে পারবে না। সামাজিক, অর্থ নৈতিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেদের না নিয়ে যেতে পারলে, এই বিরাট হিন্দুত্ব বোধ জাগবে না। হিন্দুসভার সামনে এই বৃহৎ কাজ রয়েছে যা সাধন করতে অনেক মালমস্‌লার প্রয়োজন। বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচার, সামাজিক কুনীতির ও সংকীর্ণতার সংশোধন, সাম্যবাদের উপর ধর্মের আসল ভিত্তি স্থাপন, শিক্ষাপ্রসার —এ সব না হলে হিন্দু জাগরণ সম্ভব হবে না। শুধু ব্যক্তিগত আর্থিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি—এই করে হিন্দু জগতে টিঁকে থাকতে পারবে না। নূতন করে বাঁচতে হবে, জাতিকে গড়ে তুলতে হবে, দরকার হলে অপরের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য কেড়ে নিতে হবে—এই রকম—এগিয়ে চলার তীব্র একাগ্রতা আজ ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে—শুধু তাদের নিন্দা করে লাভ কি? একটা জীবন্ত জাতি হয়ে ওঠবার এই আগ্রহ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি—কিন্তু শেখবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ক'জন?

যা হোক আসল কথা থেকে খানিকটা দূরে এসে পড়লাম। নির্বাচন যুদ্ধ লাগল এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে হিন্দুসভার শক্তি অন্য প্রদেশের চেয়ে

বেশী। সুতরাং এখানে সকলে আশা করেছিলেন কিছু ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু এবার হাওয়া উঠল অন্য রকমের। ঝড়ের সামনে তুফানের সামনে যেমন নৌকা টলমল করে. সেই অবস্থা আমাদের হল। সকলে মাথা স্থির রাখতে পারলেন না।

দেবেনবাবু গোড়া থেকে জোর করে কাজে নামলেন না। তিনি Mayor হিসাবে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। আর নির্বাচনে খুব মন দিবার ইচ্ছাও ছিল না। সনৎবাবুর Calcutta suburbs থেকে প্রথমে দাঁড়াবার কথা ছিল। শরৎবাবুর সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব করা ঠিক হবে না বলে আমি Calcutta suburbs থেকে দাঁড়াব—আর সনৎবাবু কলকাতা থেকে দাঁড়াবেন. এই ঠিক হল। সনৎবাবু নিজে খুব আগ্রহের সঙ্গে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। কিন্তু এই স্থির হবার পর তাঁর মত পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁর বাড়ী থেকে ঘোর আপত্তি ওঠায় তিনি নিজের নাম প্রত্যাহার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে বারংবার বুঝিয়ে বল্লাম—তিনি কিছুদিনের জন্য সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরৎবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না—এ জানিয়ে দিলেন। তাঁর শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন না ও নামও তুলে নিলেন।

দেবেনবাবুর অবস্থা আরো খারাপ হল। তাঁর কেন্দ্রের সব জায়গা থেকে তাগিদ আসতে লাগল—তিনি কেন কাজে নামলেন না। অথচ তাঁর কোন সাড়া নেই।

সবচেয়ে মুশকিল হল আমার নিজের নির্বাচন নিয়ে। ২৪ পরগণা. হুগলী, হাওড়া—এই তিন জিলার মধ্যে ৪৪টি মিউনিসিপ্যাল সহর নিয়ে আমার কেন্দ্র। ৩৬০০০ ভোটার। আমাকে জানানো হয়েছিল যে এই কেন্দ্রে কাজের সুবিধা হবে। হাওড়া যে অত খারাপ জায়গা এ ধারণা আমারও ছিল না। এক হাওড়ায় ৮০০০-এর উপর ভোট। কংগ্রেসের এখানে বেশী জোর ছিল—সব চেয়ে জোর কংগ্রেসের মিথ্যা ভোট দেওয়ার বিরাট আয়োজন। হিন্দুসভার কোন তেমন শক্তি আমার কেন্দ্রের কোথাও বড় ছিল না। যা হোক্ কাজ আরম্ভ হল। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজারের মিথ্যা প্রচার ও আমার উপর গালিবর্ষণ চলতে লাগল। নির্বাচনের সময় এরকম কিছু হবেই হবে। তবে মিথ্যা রটনার একটা সীমা আছে। তাও এরা অতিক্রম করলে। আমি দেশদ্রোহী, স্বার্থান্বেষী, হিন্দুসভা বাংলার কোন ভাল কাজ করেনি, লীগের মত এরাও দেশের শত্রু, ১৯৪২ সালে দেশের জাগরণের সময় হিন্দুসভা গভর্মেণ্টকে সাহায্য করেছিল—ইত্যাদি নানারকমের মিথ্যা জোর গলায় প্রচারিত হতে লাগল। আমার উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন বেশী ফুটে উঠল। আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন হুগলীর কংগ্রেস নেতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেস থেকে প্রচার হতে লাগল যে আজ ব্যক্তি কে বড় সেটা আসল প্রশ্ন নয়, প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বজায় রাখতে হবে, তাই শ্যামাপ্রসাদকে মারা চাই। আমি গত ছ' বৎসরে যা কিছু বাংলার ও হিন্দুর জন্য করেছিলাম তার কোন প্রতিদান চাই নি। কিন্তু সে সব কাজের কোন আজ মূল্য রহিল না। দেশে সবার চেয়ে বড় কথা হল—কি করে আমাকে ধ্বংস করা যায়—শরৎবাবু বল্লেন এই হল সারা ভারতের মধ্যে Key fight! কি যুক্তি ও বুদ্ধি!

জিন্নার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নামে কাউকে দাঁড় করাবার সাহস বা সুবিধা হল না। আর গত তিন-চার বৎসর যে কংগ্রেস ও তার নেতাদের সম্মান রাখবার জন্য সব দিক দিয়ে চেষ্টা করেছি, সেই কংগ্রেস উঠে পড়ে লাগলেন আমার পরাজয়ের জন্য।

আমি প্রথমে আমার কেন্দ্রের ভিতর বেশী ঘোরাফেরা করি নি। আমার কর্মীরা ঘুরছিল। পরে আমিও বার হলাম। নানাদিক থেকে সাড়া পেলাম। এমন অনেকে এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে, যাঁরা হিন্দুসভার লোক নন্, কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে আমাকে তাঁরা আন্তরিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফল দেখতে চান। আবার অনেককে দেখলাম সরে দাঁড়াতে। নাম এখানে লিখতে চাই না তাঁদের। অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছি—নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করিনি। আজ যখন কংগ্রেস থেকে বাধা এল শুধু দলগত প্রশ্ন তুলে, তখন এমন অনেক লোক যারা আমার অযাচিত সাহায্য পেয়ে বড় হয়েছে, তারাও বিরোধিতা করতে লাগল। হিন্দুসভার খুব সমর্থন দেখলাম না। তবে ব্যক্তি হিসাবে আমার বিগত কর্মজীবনের কথা স্মরণ করে—অনেক দিক থেকে সমর্থনের সংবাদ আসতে লাগল। যাঁদের বয়স হয়েছে, যাঁরা বোঝেন বাংলার প্রশ্ন কি, তাঁরা অবাক হলেন কংগ্রেসের বিরোধিতা দেখে। যারা বয়সে কম, নবীন উৎসাহ যাদের, কংগ্রেসের নামে যারা ক্ষেপে ওঠে তারা বেঁকে দাঁড়াল। কলকাতায় মিটিং হল দুটো বড। একটা I N A নিয়ে। সেখানে আমি Congressএর nonviolence আর I N A-র আদর্শ—এই দুয়ের অমিলতার কথা বল্লাম। সকলে খুব প্রশংসা করলেন। তারপর ইলেকশন্ মিটিং একটা হল। ৪০।৫০ হাজার লোক। সেখানে আমার যা বক্তব্য তা বল্লাম—কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে। যে সব লোক আজ সুবিধাবাদী হয়ে কংগ্রেসভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাকে দেশদ্রোহী বলে গালাগালি করছেন, তাঁরা ১৯৪২ সালের ঘটনার সময় কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বা জেলে গিয়ে আবার দাসখত লিখে কেমন করে বার হয়েছিলেন ও সাধু সেজে বসেছিলেন সেই সব কথা কিছু কিছু বল্লাম। দেশে শরৎবাবু ও আমি দুজনেই থাকতে পারি ও সেবা করতে পারি—এই কথা জানালাম। যদি বাংলা আমাকে না চায়, যদি হিন্দুরা বলে আমার সেবার প্রয়োজন নেই, আমি আমার পথ খুঁজে নেব। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না যে আমি ছাড়া দেশ চলবে না। দিয়েছি আমার যা দেয়—আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি, বিনা দ্বিধায় দিয়েছি, প্রতিদান আশা না করে দিয়েছি; আজ যদি আমার দ্বারা কোন সেবার প্রয়োজন না থাকে, তাতে আমি মাথা খুঁড়ে মরব কেন? এও আমি হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারি। কেননা আমার সেবার মধ্যে স্বার্থের লেশ ছিল না। সব বল্লাম। সকলেই খুব ভাল হয়েছে বল্লেন। নির্বাচন যুদ্ধ জোর ভাবেই চলতে লাগল। আমি একদিন সকালে গেলাম হাওড়ায়, সেখানে অফিস খোলার ব্যবস্থা হল। কিন্তু আবহাওয়া খুব ভাল লাগল না। অনেকেই বল্লেন—হাওড়ার লোককে বিশ্বাস করা যায় না। তারা মুখে বলবে এক আর কাজে করবে এক। তবুও অনেক হাওড়াবাসীকে দেখলাম যারা আন্তরিকভাবে আমার স্বপক্ষে কাজ করতে উৎসুক। বেহালায় গেলাম, খিদিরপুর গেলাম—বেশ ভালই কাজ

হল। একদিন হুগলী, বাঁশবেড়িয়া যাবার পথে অনেকগুলি জায়গায় নামতে নামতে গেলাম। কাজ চলছে ভালই মনে হল। আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে আরো উৎসাহ বাড়ল কর্মীদের মধ্যে। বাঁশবেড়িয়ায় ভাল সভা হল। হুগলীতে খুব বড় মিটিং হল। কংগ্রেসের ধ্বজা নিয়ে একদল ছেলে এসেছিল—উদ্দেশ্য ছিল একটু গোলযোগ। একটু বাধারও সৃষ্টি করেছিল। আমি বক্তৃতা দিতে উঠলাম—সব কথাই স্পষ্ট বল্লাম জোর করে। তাতে ফল হল ভালই। হাওয়া বদলে গেল। এই ভাবে চারদিকে জোর কাজ চলতে লাগল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম দুটো জিনিস। প্রথম আমার যে সমর্থন আসছিল সেটাতে ব্যক্তিগত অনুরাগের নিদর্শন বেশী ছিল। আর দ্বিতীয়তঃ আমি নিজে না তাগিদ দিয়ে সব দেখলে কাজের যথেষ্ট গোলমাল হচ্ছিল। এরই ফল হাতে হাতে মিলল ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

২২শে নভেম্বর ভোরে বেরিয়ে গেলাম দেবেনবাবুর (মেয়রের) সঙ্গে বারাসত, বসিরহাট, টাকী, বাদুড়িয়া—এই সব জায়গায় যাব বলে। বারাসতে কুচো ছিল। সে খুবই যত্ন করে তার পরিচিত লোকদের ডেকেছিল। কুটুন অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করলে। আমার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে সব সময়েই। এখন ভাল চাকুরী হয়েছে—আমার নির্বাচন নিয়ে বেশী দরদ দেখায় নি। তা না দেখাক্, অনিচ্ছায় মানুষকে জোর করে সাহায্য করতে বলব কেন? কিন্তু যেদিন বারাসতে গেলাম, সে বাড়ীতে ছিল। উপর থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে একবার দেখাও করলে না। এতটা আমি ভাবতে পারিনি। যাক্, অনেকেই এলেন সব জায়গায়—খুব সাড়া পড়ে গেল। টাকীতে কয়েকজন ছেলে আমার বিরুদ্ধে খানিক চীৎকার করে কংগ্রেসের জয়গান করল। সব জায়গায় বড় মিটিং করে বাড়ী ফিরলাম, তখন প্রায় রাত ৯টা বাজে। শরীর অসম্ভব রকমের ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। শুনলাম সেদিন কলকাতায় খুব মারামারি হয়েছে—গুলি পর্যন্ত চলেছে। বৈকাল থেকে ছেলেরা আমাকে খুঁজেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ছেলেরা মিটিং ও শোভাযাত্রা করে। ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে শোভা-যাত্রা যাবার সময় পুলিশ বাধা দেয়। শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্ট্রীট দিয়ে লালবাজার ও লালদিঘীর পাশ হয়ে যাবার সংকল্প করেছিল। পুলিশ বলে সেটা prohibited area, ছেলেরা তা জানত না বলে ও মানতে স্বীকার করে না। এই নিয়ে গোলমাল সৃষ্টি হয়। লাঠি চলে, গুলি চলে ও অনেকগুলি লোক হত ও আহত হয়। নানা রকমের বিবরণ শোনা যেতে লাগল—কিন্তু সঠিক কথা কেউ বলতে পারল না। আমি রাধাবিনোদ পালকে টেলিফোন করে বল্লাম যে ছাত্রদের এই বিপদে আমাদের ঘটনাস্থলে যাওয়া উচিত। তিনি বিধান রায়কেও খবর দিলেন। আমি ডাঃ পালের বাড়ীতে গেলাম—রাত তখন প্রায় সাড়ে ৯টা। সারাদিনের ঘোরা ও পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধোবার সময় হল না। শরীর টেনে চলবার মত শক্তি ছিল না। ডাঃ পাল শুনলাম বিধানবাবুর বাড়ীর দিকে চলে গেছেন। আমি মেডিক্যাল কলেজে গেলাম। গেটে খুব ভীড়। আমাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। ভিতরে গেলাম—খুব চাঞ্চল্য দেখলাম চারদিকে। নানা গুজব রটছে। আমি প্রিন্সিপাল

লিনটন সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি তাঁর বাড়ীতে চলে গিছলেন। নেমে এলেন তখনই। তাঁর দিক থেকে বলার বিশেষ কিছু ছিল না। যথাসাধ্য শুশ্রূষার চেষ্টা করছেন বল্লেন। বাহিরে আত্মীয়স্বজনেরা কে ভিতরে আছেন তার সংবাদ পাচ্ছিল না, বা ভিতরে এসে দেখবার অনুমতি পাচ্ছিল না। আমি এই কথা বলাতে তিনি বল্লেন যে পুলিশে বাধা দিচ্ছে বলে তিনি ভিতরে আসতে দিতে পারছেন না। তাঁর দিক থেকে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। যাতে গেটের উপর দাঁড়িয়ে হতাহতদের নাম অন্ততঃ পড়ে শোনানো হয়, তার ব্যবস্থা করা হল। এমন সময় ডাঃ পাল ও রায় এলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গভর্মেন্ট হাউসে টেলিফোন করা হল। কি ব্যাপার ঘটেছে এবং যাতে আর কিছু না হয় এই বলার উদ্দেশ্য ছিল। Tyson সাহেবের সঙ্গে কথা হল ডাঃ রায়ের। এই সময় খবর পেলাম যে ধর্মতলা স্ট্রীটে তখনও অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। বহু সহস্র ছাত্র সেখানে বসে আছে রাস্তার উপর। তার সামনে দাঁড়িয়ে লাঠিসোঁটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশ। আমাদের সেখানে যাবার জন্য সবাই অনুরোধ করলে। বিধানবাবু বাড়ী গেলেন, জরুরী এক কেস তখন তাঁর বাড়ীতে দেখতে হবে! ডাঃ পাল আর আমি গেলাম। ধর্মতলার মোড়ে মোটর যেতে পুলিশ এসে আটক দিল। তারপর চিনতে পেরে ছেড়ে দিল। ওছাই মোল্লার দোকানের কাছে মোড়ের উপর দেখলাম রণসজ্জা। পুলিশ বহুসংখ্যক, তারা সাজসজ্জা নিয়ে প্রস্তুত। সামনে ছেলের দল—চীৎকার করছে—সব মাটিতে স্থির হয়ে বসে আছে। শুনলাম লাটসাহেব সেখানে উপস্থিত। আমরা এসেছি শুনে তিনি এগিয়ে এলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন ছেলেদের বলতে তারা যেন এখন রাস্তা থেকে উঠে বাড়ী চলে যায়। আমি ছেলেদের কাছে এগিয়ে গেলাম। তারা বিপুল ধ্বনি করে চেঁচিয়ে উঠল। শুনলাম বৈকাল থেকে তারা শরৎ বোস ও আমাকে খবর দিতে বলেছিল। শরৎ বোস আসতে অস্বীকার করেছেন। তিনি এক লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—ছেলেদের ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করে ও তাদের শান্ত ছেলের মত বাড়ী ফিরতে। কাদের প্ররোচনায় নাকি এইসব গণ্ডগোল হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল শরৎ বোসকে ফাঁদে ফেলতে। তিনি তাই এলেন না। আমি মুখে কিছু বল্লাম না—কিন্তু অবাক হলাম শরৎবাবুর নেতৃত্বের অভিনয় দেখে। বড় বড় বক্তৃতা করে ছেলেদের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে আহ্বান করে, তাদের মাতিয়ে তুলে, যখন তারা সত্যিকারের গুলির সামনে বুক পেতে দিল, গুলি হজম করল, গুলি খেয়েও পথ ছাড়ল না—তখন বাণী এল নেতার যে তোমরা ভুল করছ, এখন সব বাড়ী ফিরে যাও। চমৎকার দায়িত্ববোধ! ছেলেরা ঠিক করেছিল কিনা, সে কথা বিচার করার সময় তখন ছিল না। তখন তারা একটা বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল—যাঁরা নেতৃত্বের দোহাই দেন তাঁদের তখন উচিত সেখানে ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়ানো। আমি বীণা দাসের সঙ্গে কথা বললাম। শুনলাম শরৎবাবুর বাণীকে ছেলেরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল—সে কাগজগুলো দেখলাম যুগান্তরের রিপোর্টার সুশীলের কাছে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এলেন, তাঁর সঙ্গে কথা হল। তিনি শরৎবাবুর

ব্যবহারে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীতে গিছলেন তাঁকে আনতে। সেখানে পারিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে নেতা মহারাজ বসে ছিলেন—তাঁরা বল্লেন যে তাঁরা শরৎবাবুকে এই বিপদের মধ্যে যেতে দিতে পারেন না। বাংলায় আর নেতা নেই—শরৎবাবু সেখানে গেলে কোন অজুহাতে হয়ত তাঁরই মাথায় লাঠির ঘা বা গুলির আঘাত পড়বে। এত বড় একটা বিপদের সম্ভাবনা যেখানে সেখানে শরৎবাবু যান কি ভাবে! ইত্যাদি। এই বেলুন ফাটার মত শরৎ বোসের নেতৃত্বের ভণ্ডামি ধরা পড়ল—প্রভেদ তাঁর সঙ্গে আর সুভাষের কতটা তাও বুঝতে পারা গেল। কিরণ-শঙ্কর রায়কে তিনি ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও কিছু করতে পারেন নি।

যা হোক্ ছেলেরা নড়তে অস্বীকার করলে। তারা যে পথে যাবার জন্য যাত্রা করেছিল, সেই পথে তারা যাবেই—তাদের সহযাত্রীরা প্রাণ দিয়েছে হাসতে হাসতে, তারা তাদের অপমান করতে পারে না। তখন তারা বাস্তবিকই অটল হয়ে ছিল। কোনরূপ মারামারি বা গোলমাল করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না—শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে নিষিদ্ধ পথের খানিকটা যদি আমরা যেতে পারি, তাহলে Curzon Park-এ গিয়ে আমরা সভা করে চলে যেতে পারি। আমি Casey সাহেবকে, Commissioner of Police Ray সাহেবকে অনুরোধ করলাম যে ছেলেরা যে পথে যেতে চায়, তাদের যেতে দেওয়া হউক। তারা শান্তিপূর্ণভাবে যাবে, কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু তাঁরাও অটল—কেন না তাঁরা prestige ভাঙতে চান না—প্রাণ যায় তাও স্বীকার। এইভাবে দুপক্ষে টানাটানি চলতে থাকল। দেখলাম শ্বেতাঙ্গ পুলিশ এক দল আছে, তাদের হাত যেন কামড়াচ্ছিল—লাটসাহেব চলে গেলে একটু সুবিধা পেলে তারা একবার নিরস্ত্র জনতার উপর তাদের পাশবিক শক্তির প্রভাব ভাল করে দেখিয়ে দিতে পারে। ছেলেরা এবং পুলিশের কোন কোন লোক আমায় চলে আসতে মানা করেন। আমার উপস্থিতিতে অন্ততঃ আর প্রাণ-হানির সম্ভাবনা থাকবে না। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীও—কে জানত যে বেচারী তার পরদিনই জীবনলীলা শেষ করবেন—এই মত প্রকাশ করলেন। তিনিও অস্থির হয়ে ঘুরছিলেন।

খানিক পরে দেখলাম সুরেশ মজুমদার আর দু-একজন কংগ্রেসের লোকেরা এলেন। তাঁদের camp-এ তখন খবর পোঁছেছে যে আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। আমার কোন Political উদ্দেশ্য ছিল না—আমি চেয়েছিলাম এই বিপদের সময় দলা-দলি ভুলে কোনরকমে ছেলেদের বাঁচাই। এই ভেবে শরৎবাবুকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করলাম ক'বার—বায়স্কোপের অফিস থেকে। কিন্তু কোন সাড়াই পেলাম না। রাত তিনটা পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে সব রকমে যাতে কোন গোলমাল না হয়। তাই দেখে বাড়ী ফিরলাম। শরীরের এমন অবস্থা যে আর গাড়ী থেকে নামতে পারি না। ডাঃ পালও অত রাত পর্যন্ত তাঁর গাড়ীতে বসেছিলেন, কখনো রাস্তায় ঘুরছিলেন। আমাকে একলা রেখে তিনি চলে আসতে রাজী হন নি। এইভাবে সে রাত কাটল।

আজ এখন রাত সাড়ে আটটা। লেখা আজকের মত এখানে বন্ধ করলাম। আজ বৌদির কোন চিঠি পাইনি—দু'দিন চিঠি এল না কেন জানি না। এখানে আসার কোন খবর নেই। আর আমার কথা ভাবিও না। এ কটা দিন কাটল এখানে। এই-ভাবে কতদিন আরো কাটবে জানি না।

শরীর একটু আজ ভাল। কিন্তু জোর পাই না যেন। কত কথা কলমের মুখে আসে, কিন্তু সব লিখতে হয়ত পারি না। ভগবানকে কত ডাকছি এ ক'দিন—একটু শান্তি যেন মনে পাই মনে হয়। আরো ডাকবার শক্তি চাই—যে ডাকের মধ্যে নিজের জন্য চাওয়ার কাকুতি থাকবে না—শুধু মিনতি থাকবে তাঁর দিকে মন ঢেলে দেবার মত সাহস ও শক্তি। তাঁরই কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে লেখা শেষ করি। কে জানে হয়ত এই রকম কোন রাত্রে লেখার পর আর হয়ত দিনের আলো আমার চোখের সামনে খুলবে না। তাতে আর দুঃখ নেই। তবে তার আগে যদি মন ঢেলে দিতে পারি তাঁরই কৃপার উপর, সেইটেই হবে সব চেয়ে আনন্দের। সে সৌভাগ্য হবে কি আমার!

১৩ই জানুয়ারী
রবিবার রাত ৯টা

কাল আর লেখা হয়নি। আজও হয়ত বেশী হবে না, কারণ ডাঃ মজুমদার আসবেন রক্ত পরীক্ষা করতে এবং রাত ১০টার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে বলেছেন।

কাল বড়দা হঠাৎ সন্ধ্যার সময় এল। সন্তু এল আসানসোল থেকে ওই ট্রেনে। সতীশবাবুও একই সময়ে ঝাঁঝা থেকে এসে হাজির। সন্তু আসবে কাল জানতাম।***

ক'দিন খালি ডেকেছি ঠাকুরকে—আকুল হয়ে, রাত্রে চোখের জলের মধ্যে;—আমাকে তুমি আশ্রয় দাও; যদি নিতে চাও, আজই নাও, তাতে আমার একটুও দুঃখ লাগবে না, আনন্দে নিজের হাতে জীবনপ্রদীপ নিবিয়ে দেব; কিন্তু যে কটা দিন এখানে আরো তুমি আমাকে রাখতে চাও, মনে শান্তি দাও, তোমার উপর বিশ্বাস রাখতে দাও, ভাবতে দাও যে তুমি আমার আছ, তুমি অনাথের সম্বল, ভিক্ষুকের রাজা, যার কেউ নেই তার তুমি বান্ধব। পথ-হারার তুমি পথিক, দৃষ্টি-হারার তুমি চোখ, মূর্খের তুমি বুদ্ধি, তুমি দীনবন্ধু। কত আনন্দের ভাব এনে দেয় এই চিন্তার মধ্য থেকে। কিন্তু সবসময়ই কি পারি মনকে এইভাবে শান্ত, সংযত ও তাঁর বিশ্বাসে সবল রাখতে? পারি না। এসে পড়ে চিন্তারাশি, অভিমান দুর্জয় মূর্তি নিয়ে আসে, আর ভাবি সত্যিই কেন এত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই আজ রাত্রে আবার ঠাকুরকে ডাকছি—ওগো

দয়াময়, তুমি এস নাও আমাকে, পথ দেখিয়ে দাও, চোখ খুলে দাও। তোমাতে লীন হওয়ার মত অনাবিল শান্তি আর কিছুতেই নেই—এই আমাকে বুঝিয়ে দাও। কারুর উপর রাগ, দ্বেষ বা অভিমান রাখতে চাই না। এই জীবনে যার কাছে যা পেয়েছি, তাই আমাকে ধন্য করেছে। যার কাছ থেকে আর একটু পেলে মন শীতল হত, সে ছিল না বলে তার উপর আজ কোন রাগ, অভিমান নেই। সবাইকে ঠাকুর মঙ্গল করুন—এই সত্যিকারের চিন্তা আজ আমাকে পূর্ণ করে রাখুক।

১৪ই জানুয়ারী
রাত আটটা

দুদিন একটু ভাল আছি। আজ দুবেলা বেড়িয়েছি। খাওয়া একটু বেড়েছে। সকালে ডাক্তারবাবুর বাড়ী থেকে পরিজ আসে। দুপুরে দুতিন রকমের রান্না যোগেশবাবুর বাড়ি থেকে আসে। বৈকালে জ্ঞানবাবুর বাড়ী থেকে মিষ্টি আসে অল্প, একদিন অন্তর ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যায় খাবার আয়োজন হয়। এইভাবে সাতঘাটের জল কুড়িয়ে খাওয়া—তাছাড়া বাড়ীতে খাবার ত তৈরী হয়ই। আজ বুধবার ও শুক্রবারের লেখা বৌদির চিঠি পেলাম। এবার একরকম লেখাই আছে যে আসা এখন হবে না। হাসু অন্তু চিঠি লিখছে এবার রোজই। তারা খুব যে ব্যস্ত হয় বুঝতে পারি। অন্তুর জন্য আমার ভাবনা বেশী। এমনি লেখাপড়ার উপর ওর খুব ঝোঁক নেই—কিন্তু বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। আজ যে কাগজ কলকাতা থেকে এল তাতে দেখলাম আমার অসুখের কথা লেখা আছে। এভাবে কাগজে খবর না দিলেই পারত। দিন কাটছে একের পর এক। এখনও ঠিক করতে পারি না ফিরে গিয়ে কিভাবে জীবন কাটবে। আর এইসব গোলমাল আর টানাটানি ভাল লাগে না। কিন্তু এখনও কতদিন বাঁচব তা জানি না—এমন কাজ হাতে নিতে হবে যার দ্বারা লোকের মঙ্গল হয়, অথচ ঠিক আমার মনের মত হয়। এই বয়স পর্যন্ত হাতে পয়সা রাখার চেষ্টা করিনি—তার অভাবও বোধ করি যথেষ্ট। ফেরার আগে মন স্থির করতে হবে।

আজ আবার গত দুমাসের ঘটনা যা খানিক লিখে রেখেছি তা শেষ করার চেষ্টা করি।

কলকাতায় গুলি চলার দিন রাত ৩টা পর্যন্ত ধর্মতলা স্ট্রীটে কাটিয়ে বাড়ী এলাম। তার পরদিন সকালে ইউনিভার্সিটিতে ১০টায় ডাঃ পালের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য গেলাম—স্কুল কলেজ যেন বন্ধ থাকে ক'দিন। তা নাহলে আরো গোলমাল হতে পারে। সেই ব্যবস্থা করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। যেসব ছেলেরা আহত হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে দেখলাম—তাদের বিষয়ে সংবাদ নিলাম। কলেজ ও

হাসপাতাল কম্পাউণ্ড লোকে লোকারণ্য। হাসপাতালে ঢোকবার জন্য সবাই ব্যাকুল। ডাক্তারেরা আমাদের বলতে বল্লেন সকলকে বুঝিয়ে দিতে যেন তারা রোগীদের দেখার চেষ্টা না করে—অত ভীড় সামলান কঠিন হবে, আর তা' সেটা রোগীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক হবে না। বুঝিয়ে বললে সকলে শান্ত হয়ে শুনল। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, তাঁর ভাইপো রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে গুলিতে প্রথম মারা গেছে, তার দেহ তখনও পাওয়া যায়নি—পুলিশ দেরী করছে। তাঁকে আর তাঁর সঙ্গে দুজন ছিলেন, তাঁদের নিয়ে ইউনিভার্সিটি গেলাম। হেঁটে ওইটুকু পথ গেলাম। তখনই খুব ভীড় চারদিকে। ছেলের দল বন্যায় বাঁধ ভাঙার মত তরতর করে এগিয়ে আসছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেদের দল আসছে দেখলাম। ধর্মতলা স্ট্রীটের ছেলেরা ভোরের দিকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট হয়ে চলে গিছল এ খবর পেয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটি থেকে পুলিশে টেলিফোন করলাম। হরিদাসবাবু আর হরিচরণ এলেন, তাঁদেরও পাঠিয়ে দিলাম।

বাড়ী এসে খেতে প্রায় ১টা বাজল। বিশ্রাম করার সময় পাইনি। শুনলাম ছেলেমেয়ের দল হাজারে হাজারে সব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জড় হচ্ছে। খানিক পরে খবর এল যে তারা সব ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যে পথে কাল তারা যেতে গিয়ে গুলি খেয়েছিল, সেই পথ দিয়েই চলছে। একটু পরেই খবর এল যে পুলিশ জনতাকে আটকেছে ও গুলি চলার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কর্পোরেশন থেকে খবর এল যে এখনই সেখানে যাওয়া দরকার, অবস্থা খুব সঙ্গীন। শরৎবাবুর কথা আমি জিজ্ঞাসা করাতে জবাব পেলাম যে তাঁর খবর পাওয়া যাচ্ছে না, বোধহয় তিনি কোর্টে কোন কেসে আটকে পড়েছেন। পরে শুনলাম তিনি ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের এক ধারে গিয়ে কিছু বলেছিলেন, কিন্তু কাল তাঁর না আসার দরুণ ছেলেদের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি ধর্মতলা স্ট্রীটে যাব বলে তৈরী হলাম। রামেশ্বর ব্যানার্জীর দেহ নিয়ে যাবার ছাড়পত্র হরিচরণ পুলিশ অফিস থেকে আমার কাছে এনে দিল। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মীরা দত্তগুপ্ত তার বাবা ও মাকে মোটর করে নিয়ে আমার বাড়ীতে এলেন। মর্গে গিয়ে একবার ছেলের মৃতদেহ দেখবার জন্য হতভাগ্য পিতামাতার এই যাত্রা। রাস্তায় গেলাম তাঁদের গাড়ীর কাছে। অবাক হলাম তাঁদের—বিশেষ ক'রে মাকে দেখে। খুব সহজ ভাবে এই আকস্মিক বিপদকে তাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছেন দেখলাম। দেশের জন্য ছেলে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে—এতে শোকের কান্না তাঁরা কাঁদতে চান না। ছাড়পত্র মীরার হাতে দিলাম। নীহারেন্দু আমার সঙ্গে ধর্মতলায় চলল। সেখানে গিয়ে দেখি বিরাট ও সঙ্গীন ব্যাপার। লক্ষাধিক লোক সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে—সবাই নিষিদ্ধ পথে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাস্তার মাঝখানে পুলিস কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে। ইংরেজের গুলিগোলা সবই সাজান রয়েছে—নিরস্ত্র জনতার উপর চালিয়ে শক্তির মহিমা প্রচার করতে যেন শশব্যস্ত। কংগ্রেসের নলিনাক্ষ আর দু'একজনকে দেখলাম। শরৎবাবু বলে দিয়েছেন ছেলেদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরে যেতে, কিন্তু তারা যাবে না

কিছুতেই—প্রাণ যায় ক্ষতি নেই। পুলিস কমিশনারের হুমকির ভয় তাদের নেই একটুও। আমাকে তিনি বল্লেন পুলিস লরীর উপরে উঠে ছেলেদের বুঝিয়ে বলতে। আমি উঠে জনতার পুরোপুরি আন্দাজ পেলাম—সে যেন বিশাল সমুদ্র আর মানুষ সব যেন ক্ষেপে আছে। আমি কমিশনার সাহেবকে লরীর উপর তুলে দেখালাম—বল্লাম, "তুমি এদের যে পথে এরা চায় যেতে দাও। যদি বাধা দাও, অমনি বাধায় পারবে না! মেশিনগান চালাতে হবে—আর হাজারে হাজারে লোক প্রাণ দেবে হাসতে হাসতে। জালীওয়ানালাবাগের চেয়ে বেশী মানুষ মারতে হবে—তবু এদের হটাতে পারবে না। আর এখন যদি এরা শান্তভাবে চলে যায়, আমি এদের বলে দেব সব রামেশ্বরের মৃতদেহ সৎকারের জন্য কেওড়াতলায় যাবে।" পুলিশ কমিশনার একটু ভেবে দেখবার জন্য নেমে গেলেন। ছেলের দলও তখন ক্ষিপ্তপ্রায়। তারা সব এগিয়ে চলল। আমি তখন তাদেরই মাঝে পুলিস লরীর উপর। তখন কেন গুলি চালাল না জানি না। চালালে আমার সামনে আমার মাথার উপর দিয়ে চালাতে হত। কমিশনারও মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে কাজ করলেন। পরে রটান হয়, শরৎ বসুই গভর্নরের সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে ছেলেদের যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেদিন সকালে, তার আগের দিনের রাত্রে গভর্নরের সঙ্গে আমার আকস্মিক সাক্ষাৎ ও স্টেটসম্যানে ছবি বেরুন—এই দুয়ের বিকৃত টীকা করে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে গভর্নরের সঙ্গে handshake করতে তাঁর ব্যস্ততা নেই—এই রকম স্বাধীনচেতা নেতা যে সেই লাটসাহেবের সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে আবার কিছু অনুরোধ করলেন—এও একটা ভাববার কথা। যাহোক আমার নিজের বাহাদুরী নেবার এই ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছা মোটেই ছিল না। ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে তার আগের দিনের গুলি খাওয়ার তেজ বজায় রাখল। সেখান থেকে আমি morgue-এ চলে এলাম। সেখানে Azizul Hauqe করোনার খুব ভাল ব্যবহার করেন। রামেশ্বরের বাপ-মাকে তাঁদের আদরের পুত্রকে দেখাবার ব্যবস্থা করলাম। সেই বিকৃত ও ভয়াবহ নগ্ন দেহ দেখে আমারই মাথা কেমন করে উঠল। বাপ-মা দেখার আগে নতুন কাপড় আনালাম। তাঁরা দেখলেন তাঁদের বড় আদরের ধনকে—একটুও বিচলিত হলেন না। অদ্ভুত ধৈর্যশক্তি। শব নিয়ে যাওয়া এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে কথা হয়েছিল লরী করে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশ একটা লরী দিল—কিন্তু তাতে নেওয়ার কারও মত হল না। বড় খাট আনার ব্যবস্থা করলাম। ছেলেরাই ঘাড়ে তুলে নিল। আমার মোটরে loudspeaker লাগান ছিল—সেটা খুব কাজে দিল। তার এক পাদানির উপর পচু দাঁড়িয়ে ভীড় সামলাতে লাগল। কথা বেশ শোনা গেল—আর লোকেরাও শুনল। এইভাবে আমরা শবদেহ নিয়ে চললাম। ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরে ছেলের দলও এসে জুটল। তখন আমরা cordon করে procession নিয়ে চলেছি। সে কি বিরাট জনতা। দু'তিন লক্ষ লোক চলল—কোন চিৎকার নেই, গোলমাল নেই; অতি ধীর শান্তভাবে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা পথে চলতে থাকল। আমি হাঁটলাম সারাপথ। ছেলেরা ধরল যে ধর্মতলা

দিয়ে চৌরঙ্গী যেতে হবে। যদিও route কিছু ঠিক করা ছিল না ও আমি পুলিশকে বলেছিলাম চৌরঙ্গী দিয়ে যাব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেদের কথা ঠেলতে পারলাম না। কিছু গোলমাল হল না। সব শান্তভাবে চলতে লাগল। চারদিকে লোকে লোকারণ্য—সব বাড়ী থেকে মানুষ যেন ঝুলে পড়ছে—পুষ্পবৃষ্টি করছে, খই ছড়াচ্ছে—সে কি দৃশ্য—ভোলবার নয়।

এদিকে বৈকাল থেকে শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে খুব গোলমাল সুরু হয়েছে। সেদিন ত চারদিকে হরতাল—হিন্দু মুসলমান সব একজোট। আমাদের procession-এর মধ্যেই হাজার হাজার মুসলমান চলছিল। তার আগের দিনে যারা ইংরেজের গুলি খেয়েছিল তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যা হোক দক্ষিণ কলিকাতায়ও হরতাল। কারও কোন গাড়ী যেতে দেবে না। আমার গাড়ী দুবার আটকাতে এসেছিল; তারপর আমাকে দেখে ছেড়ে দিল। কংগ্রেস, হিন্দুসভার Flag দেখলে গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছিল। Processionএ সব flag-ই উড়ছিল। এ আমি ইচ্ছা করেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। একদিনের জন্যও আমরা দেখাই যে সব flag এক হয়ে যেতে পারে ও সম্মিলিত ভাবে আমরা কোন বৃহৎ ব্যাপারে একবদ্ধ হতে পারি। দক্ষিণ কলকাতায় এক মিলিটারী লরী একটি ছেলেকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে সেই লরীকে আটকায় এবং লরীচালক এক নিগ্রোকে ধরে নিয়ে পুরন্ত লরীর মধ্যে নিক্ষেপ করে। তার পরই আগুন জ্বলল। এদিকে গাড়ী পুড়তে সুরু করল। মিলিটারীরা আপত্তি না করে গাড়ী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। আর অন্যদিকে পুলিশ এসে গুলী চালাতে আরম্ভ করল। কারণে-অকারণে গুলি চালিয়ে কত লোকের প্রাণ গেল—লোক জখম হল। এ সব খবর আমি বৈকালে পাইনি। পথে আসতে আসতে শুনলাম। এই খবর পেয়ে আমাকে হেঁটে আসতে হল—দায়িত্ব ছিল আমার উপর, আমি সেজন্য সরে যেতে পারলাম না। Calcutta Clubএ আসার আগে দেখলাম দূরে আগুন জ্বলছে মাঝে মাঝে। শুনলাম সব লরী পুড়ছে। আমি তখন procession ঘুরিয়ে দিলাম হরিশ মুখুজ্জে রোড দিয়ে। সেখানেও এই ব্যাপার—রামেশ্বরের বাড়ী কালীঘাটের কাছে হরিশ মুখুজ্জে রোডে। আগুনের খেলার পাশ দিয়ে কোন রকমে আমরা কেওড়াতলায় এসে পৌঁছলাম। তখন আমার পা আর চলে না—তলায় ফোস্কা পড়ে গেছে—আর দুদিনের এই খাটুনিতে শরীর যেন আর স্থির রাখতে পারছিলাম না। শ্মশানে লোক সব উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সব ব্যবস্থা করতে বলে আমি বাইরে ঘাটের কাছে বসলাম। বায়স্কোপের ছবির মত সব ঘটনা মনে আসছিল। অনেকে সেখানে এলেন। শরৎ বসু আসেন নি—পরে বেশী রাতে এসেছিলেন। আগুন জ্বলার খানিক পরে প্রায় রাত ১১টায় আমি বাড়ীর দিকে চল্লাম। যাবার পথে আর এক ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র সন্তানকে হাজরা পার্কের কাছে পুলিসের গুলিতে হারিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে গেলাম। তখন মৃতদেহ কোলে নিয়ে ছেলের

মা বসে আছেন। বাপ পাগলের মত ঘুরছেন। সেখানেও দেখলাম অদ্ভুত ধৈর্য। দুঃখ নেই, চোখে জল নেই। ছেলে আমার ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে—রাতটা আমার বুকে থাকুক, কাল সকালে একে নিয়ে যাবেন—এই অশিক্ষিতা, সাধারণ বাঙালী ভদ্র পরিবারের মায়ের কথা। এই দেখে আমি বুঝলাম দেশ কতটা এগিয়ে গেছে—ও বিপ্লব আগতপ্রায়। এখন শুধু এই ভীতিশূন্য চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলার মধ্যে এনে একে ঠিকপথে চালিত করতে পারলে ইংরেজ আর কদিন এদেশে থাকতে পারে! শুনলাম যে খানিক আগে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, যিনি তার আগের রাত্রে তিনটা অবধি আমার সঙ্গে ছিলেন ও পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—তাঁর মোটরের সঙ্গে এক মিলিটারী লরীর ধাক্কা লেগেছে ও তাঁর ড্রাইভার তখনই মারা গেছে। তিনিও খুব সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে খানিক থেকে মারা গেলেন। খবর শুনে যেন সব ভেল্কীবাজী মনে হতে লাগল। এই আছে- এই নেই, লাঠি, গুলি, মোটর লরী,—সবই যেন বিধাতার খেলা চলেছে! বাড়ী এসে রাত ১২টায় শুলাম অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, অথচ তার পরদিনই ভোরে ইলেক্‌শনের ব্যাপারে মোটরে কাঁচড়াপাড়া থেকে আরম্ভ করে বারাকপুর পর্যন্ত ঘোরার কথা।

রাত ১০টা প্রায় বাজে। কি জোছনা-ভরা রাত আর তার ভাবও কি শান্ত। কোথাও একটু শব্দ নেই। একমনে কাজ করবার সময় ও জায়গা এই—কিন্তু সব সময়ে পারি কই ঠিক হয়ে বসতে।

মঙ্গলবার—১৫ জানুয়ারী

শ্মশান থেকে সে রাত্রে ফিরে এসে ঘুম হল না ভাল। এত রকমের চিন্তা এসে মনে আঘাত করতে লাগল। দুদিনের ঘটনা যেন ছবির মত সামনে ভাসছিল। সকাল হল যখন সারা সহরে থমথমে ভাব। আগের দিন হরতাল হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। স্টেশন থেকে ট্রেনও সব চলেনি। লাইনের উপর হাজার হাজার লোক শুয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে একটা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভাব। কোথাও সেটা দুর্দান্ত রূপ নিতে দেখা গেল। উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধ যেন ভেঙ্গে সব চুরমার করেছিল। গাড়ী থামা ত ভাল, ট্রাম, বাস সব আপনা থেকেই বন্ধ। চারদিকে উত্তেজনার মূর্তি। আমি সুশীল চট্টোপাধ্যায়কে (আশুতোষ কলেজ), যে বারাকপুর থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত আমার ইলেকশনের কাজ করছিল, সঙ্গে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন বিশ্রাম নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আগে থেকে যাবার খবর দেওয়া ছিল, না গেলে সব কাজ গোলমাল হতে পারে, এই ভেবে যাওয়া স্থির করলাম। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাওয়া সহজ হয়নি। সকালেই আগুন জ্বলছে পথের মাঝে। ট্রাম বাস বন্ধ, পথে মোটর নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। যাহোক চলে গেলাম বিনা বাধায়। যেখানে আটকাতে এল, চিনতে পেরে ছেড়ে দিল। সারাদিন ঘুরলাম, বক্তৃতা দিলাম, অনবরত লোকের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালাম। কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, ভাটপাড়া, নৈহাটী, জগদ্দল, শ্যামনগর, ইছাপুর সব জায়গায় বিপুলভাবে সম্বর্ধনা হল। এক নৈহাটীতে একটু খারাপ দেখলাম। কোন কাজই হয়নি। সেদিন আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ডে কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় আমি যা করেছি তার কিছুমাত্র উল্লেখও ছিল না। যারা চাক্ষুষ দেখেছিল আমি যা করেছিলাম তারা এই অভূতপূর্ব নির্লজ্জতা ও মিথ্যাবাদের বহর দেখে অবাক্ হল। সব জায়গায় কাজ প্রায় শেষ করে এসেছিলাম। ইছাপুরে বিরাট মিটিং হল। তারপরই শরীর খারাপ অল্প বোধ হয়। হঠাৎ মনে হল যেন পড়ে যাচ্ছি ও শরীরে কোন যেন ভার নেই। এত হালকা বোধ হতে লাগল যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। পাশের লোকের উপর ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর বুকে ব্যথা আরম্ভ হল। তখন মোটরে টিটাগড় যাচ্ছি। সে কি অসহ্য বেদনা, সে রকম আগে কখনও হয় নি। বুঝলাম যে এবার কিছু বেশী রকম আক্রমণ হয়েছে। রায় বাহাদুর তারকনাথ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে যাবার কথা ছিল। সেখান থেকে মিটিংএ যাব। তখন রাত প্রায় ৯টা। দু'তিন হাজার লোক অপেক্ষা করছেন। কোন রকমে তাঁর বাড়ীতে নেমেই শুয়ে পড়লাম ও ডাক্তার ডাকতে বল্লাম। শরীর তখন এত খারাপ লাগছিল যে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। সুশীলকে বল্লাম কলকাতায় টেলিফোন করে বাড়ীতে খবর দিতে। অসুখের কথা বিশেষ করে না বলা হয়। শরীর খুব ভাল নেই তাই আজ রাত্রে বাড়ী ফিরব না—এই বলতে বল্লাম। সুশীল টেলিফোনে বড়দার সঙ্গে কথা বলে জেরায় অসুখের কথা বলে ফেলে। বাড়ীতেও সব খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিধান বাবুকে খবর দেয়—ইন্দু বসুকে বলে।

হৈ-হৈ ব্যাপার কলকাতায়। খবর এমনভাবে রটেছিল যে পরে শুনলাম, কোন খবরের কাগজের অফিসে টেলিফোন করে অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আমি মারা গেছি, এ খবর সত্য কিনা! টিটাগড়ে ডাক্তার এসে দেখলেন, ঔষধ দিলেন; খানিক পরে ব্যথা কমল তবে খুবই দুর্বল। রাত প্রায় ১১টার পর বড়দা, বিজু, পচু, বৌদি ইন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। আমি আর রাত কাটাতে বাড়ীর বাহিরে রাজী হলাম না। আস্তে আস্তে মোটরে করে চলে গেলাম। রাত প্রায় ১টায় বাড়ী পৌঁছলাম। শরীর তখন খুবই খারাপ লাগছিল—এতটা দুর্বল অনেকদিন বোধ করিনি। তার পরদিন সব ডাক্তাররা এলেন। বললেন, সম্পূর্ণ বিশ্রাম ছাড়া উপায় নেই—যদি বাঁচতে চাই। এখন কথা শুনলে রক্ষা হতে পারে। তা না হলে হয়ত চিরদিন পঙ্গু হয়ে থাকতে হতে পারে। ইলেকশন্ নিয়ে কি হবে তাই নিয়ে মতান্তর খুব। ডাক্তারেরা—বিশেষ ডাঃ রায় বলেন যে, কোন রকম উত্তেজনার কাজ করা চলবে না। ইলেকশনের দিন ১১ই ডিসেম্বর। ১৫ দিন বাড়ীর বাহিরে আমাকে যেতে দেবেন না—ইলেকশন হোক্ আর না হোক্। শনিবার আমার অসুখ হল। রবিবার অনেক মিটিং ঠিক করা ছিল উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর এই সব জায়গায়। আমার যাওয়া ত হল না। নির্মলও ভয়ে সরে পড়ল, কেননা তার আগের সপ্তাহে

হাওড়ার মিটিং-এ গোলমাল করে কংগ্রেসের লোকেরা দুর্ব্যবহার করে, অপমানিত করে। দেবেনবাবু মেয়র শ্রীরামপুর গেলেন, কোন গোলমালই সেখানে হল না। সেই খবর শুনে নির্মল উত্তরপাড়ায় হাজির হল। আমার নিজের পক্ষে বেশী দেখাশুনা বাড়ী বসেও সম্ভব হল না ; কিছু কাজ করছিলাম, কিন্তু হঠাৎ relapse হল।

ডাক্তাররা তখন মারমূর্তি ধরলেন। এভাবে আত্মহত্যা করে লাভ কি ? একটুও কাজ আমাকে তারা করতে দেবেন না। অন্য নেতারা ইলেকশনের দায়িত্ব নিতে নারাজ। আমি নির্মল আর দেবেনবাবুকে বল্লাম তারা যদি কাজের ভার নেয়, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। হারজিত্ প্রশ্ন নয়। তবে আমি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি। আমি নিজে নির্বাচন-প্রার্থী, আমার অসুস্থতার জন্য যদি আমি নিজে না কাজ করতে পারি, অন্য কেউ এসে আমার কাজ করে দিক্ এ আমার কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু দায়িত্ব নিতে কেউ এগিয়ে এল না। নিজের মনেও যথেষ্ট ধিক্কার এসে যাচ্ছিল। যে আদর্শ নিয়ে গত ক'বছর কাজ করতে এগিয়ে গিছলাম, কে যেন এসে তাতে সজোরে আঘাত করল। কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি স্বার্থপরতা, কি চাতুরী চারদিকে। আমি নিজেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে জোর করে স্থাপিত করতে কখনও চাই নি। যদি আমার দ্বারা কোন সেবা সম্ভব হবে না—এই লোকের ধারণা হয়, আমি জোর করে নিজেকে নেতার আসনে বসাতে চাই না। যাই হোক্ শেষ অবধি শরীরের অবস্থার জন্য নিজের কাজ নিজে সামলাতে পারলাম না—আর অপরে এসে দায়িত্ব নিতে রাজী হল না—তখন আমার নির্বাচন সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ান ছাড়া উপায় ছিল না।

এর মধ্যে এক ব্যক্তির ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে পড়লাম। আমার অসুখের ভিতর সে আমারই নামে চারদিকে টেলিগ্রাম পাঠাল আমাকে না জানিয়ে—যে সবাই তাকে সাহায্য করে যাও, খরচ করে যাও, পরে আমার কাছে হিসেব পাঠাবে। যা টাকা দেবার কথা ছিল আমি তাকে দিয়েছিলাম। তারপর সে এইভাবে আমার নাম সহি করে চারদিকে টেলিগ্রাম পাঠাত পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চারদিকে দেখলাম খালি টাকার দাবী আর চাতুরী। কর্মীদের ভিতর সবাই যে এইরকম তা বলি না—অনেকে ছিলেন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বেশী নয় ও সকলেরও কর্মকুশলতা বেশী ছিল না। ইলেকশন্ থেকে সরে দাঁড়াতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে তা বুঝলাম—কিন্তু তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। অনেক কর্মীরা হতাশ হলেন—তাঁদের কাজে খুব বাধার সৃষ্টি হল। কিন্তু ভবিতব্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলাম।

অসুখ চলতেই থাকল। এর মধ্যে গান্ধীজী, প্যাটেল, নেহেরু সব কলকাতায় এলেন। মহা হৈচৈ ব্যাপার। লোক হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে জড় হতে লাগল। বন্যার মত ঝড়ের মত, কলকাতা আলোকিত হতে লাগল। নেহেরু, প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রফি আমেদ কিড্ওয়াই সব এলেন আমাকে দেখতে। অনেকে

অনুরোধ করলেন যে আমার কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত। যে পার্থক্য কংগ্রেসের সঙ্গে আছে তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি কংগ্রেসে যেতে পারি না—লোকে সে কথা বুঝতে চায় না। সবই চলে হুজুগের মধ্য দিয়ে—যখন যেটার ডাক পড়ে যায় —সেই ডাকে সাড়া দেওয়াই সাধারণ মানুষের নীতি। যাহোক অসুখ কমতে লাগল। গান্ধীজি ইতিমধ্যে হিন্দীতে চিঠি লিখে শরীর বিষয়ে খবর নিলেন। আমি বাংলাতে তাঁকে উত্তর দিলাম। সারা ভারতের ইলেকশনের খবর আসতে লাগল। কোথাও হিন্দুসভা জিততে পারল না। কংগ্রেসও একটি মুসলমান আসন পেল না। অর্থাৎ প্রমাণ হল যে হিন্দুরা কংগ্রেস চায় ও মুসলমানেরা লিগ চায়—অথচ কংগ্রেস কখনও নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলবে না বা হিন্দুর জন্য দাবী জানাতে অগ্রসর হবে না। হিন্দু তার পথ বেছে নিয়েছে—এখন সে ঠিক করল কি ভুল করল তা প্রমাণ হবে সময় গেলে। এর মধ্যে যদি হিন্দুসভা সত্যিকারের কর্মী নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তাহলে তার মাথা তোলবার মত সুযোগ আবার আসবেই আসবে।

কিন্তু নেতৃত্ব করার ইচ্ছা বা শক্তি কোনটাই আমার আর নেই। এমন কাজ করতে চাই যা আমাকে জীবনের শেষ কয়েক বৎসর দ্বন্দ্ব ও ঝগড়ার বাহিরে রাখবে—কোন গঠনশীল কাজের ভিতর দিয়ে, যাতে হিন্দুজাতি তার লুপ্ত গৌরবের সন্ধান পায়, নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই। All India Hindu Mahasabha Working Committeeর মিটিং কলকাতায় ডিসেম্বর মাসে ডাকলাম। ভোপাটকারকে Acting President করা হল আমাকে আপাততঃ ছুটি দেবার জন্য। বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যে রকম শক্তি আছে সেইভাবেই প্রাদেশিক নির্বাচনে হিন্দুসভা নামবে এই স্থির হল। প্যাটেলের সঙ্গে কথা হল চিঠি লেখা হল—কংগ্রেসের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া সম্ভব হল না। তাঁরা ভাবেন হিন্দুসভার পিছনে তেমন জনমত নেই। তা প্রমাণ হল কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন নিয়ে। সুতরাং এখন তাঁরা মিটাতে চাইবেন কেন?

২১শে ডিসেম্বর এখানে এলাম। তার আগে চার পাঁচ দিনের জন্য জামসেদপুরে বুয়ার কাছে ছিলাম। দিদিভাইকে বড় ভাল লাগল। সঙ্গে প্রথমে বৌদি আসবে এই কথা ছিল—অসুখের সময় এই সে নিজেই কতবার বলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আসা হল না। মা সঙ্গে এলেন। কেনোর বৌ মা একা আসবেন বলে সঙ্গে এল। অন্তু দিন পনের ছিল। সেও চলে গেছে গত সোমবার। এই হল গত দুমাসের জীবনের ইতিহাস। অনেক কথা আরো লিখতে পারা যেত—কিন্তু সারাংশ এই লিখে রাখলাম। জীবনের ভবিষ্যতের উপর গত দু মাসের ঘটনাবলী ও চিন্তার ধারা অনেক কিছু রেখাপাত করবে এ আমি বেশ বুঝতে পারি।

এখন রাত প্রায় সাড়ে ৯টা বাজল। শরীর ক্লান্ত লাগছে। মনও আজ বৈকাল থেকে কেমন ভাঙা হয়ে আছে। আজ বিদায় নিলাম এইখানে। এই খাতায় এর পরে নিত্য ঘটনার বা চিন্তার কথা লিখে রাখব।

Death means parting with all regrets and the thought of it gives one a strange sensation of timelessness.

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও অনেকটা ছেড়েছি, তা বলে রাখা দরকার। ১৯২৪ সাল থেকে ২২ বৎসর অক্লান্ত সেবা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপুষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। এবার Syndicate-এর নির্বাচনে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি। বড়দা আমার স্থানে গেছে। Assembly নির্বাচনেও আমি না দাঁড়িয়ে বড়দা যাক্ এই তাকে বলে দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পরে লেখবার ইচ্ছা আছে।

আজকের মত শেষ করি এখানে।

১৬ই বুধবার
রাত ৮টা

আরো একটা দিন কাটল এখানে। আজ রাতে খানিক পড়লাম—সারাদিন লেখা বেশী হয়নি। মধুপুরে শান্তিময় জ্যোছনা-ভরা সন্ধ্যায় মনে পড়ে এখানে আগে কত ঘটনা ঘটেছে যা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘনিষ্ঠভাবে। এই বাড়িতে ৩৪ বৎসর আসছি—১৯১২ সাল থেকে। এই সময়ে কত লোক এখানে এসেছে, কত আনন্দে এখানে দিনের পর দিন কেটেছে—তাই আজ সন্ধ্যা থেকে মনে পড়ছে।

১৯১২ সাল। তখন ১১ বছর বয়স। নতুন বাড়ি হল—সে কি আনন্দ! সব গড়ে উঠছে নতুন করে—ঘর, আসবাব, আলো, বাতি, বাগান, গাছ আরো কত কি। তখন ঠাকুমা আছেন, বাবা আছেন, দিদি আছেন—আমরা সাত ভাই বোন। আসতেন সঙ্গে বহুবল্লভ শাস্ত্রী—কি খাইয়ে লোক ছিলেন, একাদশীর দিন লুচি চাই, তবে যদি মাংস হল, তার ঝোলে লুচি না ডুবলে পেট খালি থাকত। গল্প করতে খুব ওস্তাদ ছিলেন। নাক ডাকত তাঁর অপরূপ ভাবে। সেই নানা শব্দকারী নাসিকাধ্বনি ও তার সঙ্গে মুখের অপূর্ব ব্যাদান এই দেখতে তখন কত বিস্ময় ও স্ফূর্তি লাগত। বাড়ি যেবার তৈরী হল, সেবার পূজার সময় আমরা বিজয় কুণ্ডুর নিজের বাড়িতে ছিলাম। শাস্ত্রীজী বিজয়বাবুর বড় খাট ভেঙে রাত্রে বিছানা সমেত মাটিতে আশ্রয় নিলেন। সে কি ভূমিকম্পের মত শব্দ ও বাড়ির সব লোকের একত্র হওয়া! প্রথম ভয়, তারপর হাসি। লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল তাঁর, ওজনে অন্তত সাড়ে তিন মণ—সেই প্রকাণ্ড শরীরকে, তাঁর বিশাল দাড়িকে—সব অক্ষত রেখে টেনে তোলা রাত্রের আবছায়া অন্ধকারে এক রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার হয়েছিল। বিরাজবাবুরা ছিলেন পাথরচাপটির এক বাড়িতে।

তাঁর এক কন্যার মৃত্যু হল এখানে এসে। সে দুঃখের কথাও মনে পড়ে। কুণ্ডু বাংলার এক নম্বর বাড়িতে হাওড়ার এক ডেপুটি এসে রাত্রে আত্মহত্যা করলেন—গলায় দড়ি দিয়ে—কি গোলমাল সকালবেলা!

ইচ্ছা করছিল একবার দেখে আসতে। কিন্তু বাবার ধমকের ভয়ে সাহস হল না।

গৃহপ্রবেশ হবে এই আনন্দে সবাই আমরা তখন অস্থির। গৃহপ্রবেশ হল। হেঁটে আসা হল সবাই মিলে। বাড়ির মালিক আসবেন সবার আগে—এক গরুর লেজ ধরে আসতে হয়। ঠাকুমার ওপর এই ভার পড়ল। শান্ত গরু—যে লেজ ধরলে পালাবে না, শিঙ নিয়ে তেড়ে আসবে না বা বিরক্ত হবে না—এ যোগাড় করাও সহজ হয়নি। বাড়ি তখন সব তৈরী হয়নি। গৃহপ্রবেশে খাওয়া হল। কত লোক এলেন, মধুপুর ভেঙে এল। কলকাতা থেকেও অনেকে এলেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই চলে গেছেন। সেই আরম্ভ হল এ বাড়ির সঙ্গে পরিচয়। আর ৩৪ বছর ধরে সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, মধুপুরে এসেছি, আশ্রয় পেয়েছি, আরাম পেয়েছি। বড়দিনের ছুটিতে, গ্রীষ্মের ছুটিতে, পূজার ছুটিতে—আসার তখন ধুম কি! নতুনের নতুনত্ব —তার দামই ছিল আলাদা! কি যত্ন করে বাগান সাজিয়ে তোলবার আগ্রহ! বাবা আনলেন যেখানে থেকে ভাল ফলের চারা পাওয়া যায় সব খোঁজ নিয়ে। কত ফুলের গাছ এল, কত বই এল। বাড়ির সব জায়গায় জলের পাইপ বসল, কল লাগানো হল—যদিও ভাল pump-এর অভাবে সে সব কাজেই এল না এই ৩৪ বছরে। মনে পড়ে. গরমের সময় স্কুল ছুটি হলে এখানে আসার ধুম। প্রথম বছর ঠাকুমা ছিলেন—তাঁর বাত, আকন্দপাতার গাছ বসল, চালতা ভালবাসতেন, চালতা গাছ লাগানো হল। সে চালতা হবার আগেই তিনি চলে গেলেন—আজও সেই চালতার অম্বল খেয়েছি ও এই গল্প মার কাছে শুনেছি। মাস্টারমশাইরা সব আসতেন—হরেনবাবু, পণ্ডিতমশাই, মুকুন্দবাবু, কখনও কখনও সতীশবাবু, হেডমাস্টার সতীশবাবু, আরো অনেকে। গরমের সময় জল হত যেন বরফ। সেই কুঁজো জল ভরে সব দুপুরে গায়ে ঢালা হল—শরীর ঠাণ্ডা করবার জন্যে। সে কি স্ফূর্তি! দুপুরে পশ্চিমে বাতাস দিত কি শব্দ করে, ঠিক যেন ঝড় বইছে। পড়া হত, গল্প হত, বেড়ানো হত। দুধ তখন ছিল গরমের সময় টাকায় ১২ থেকে ১৬ সের। পূজার সময় হত টাকায় আট সের।

বাড়িতে সব খাবার তৈরী হত—সবাই আমরা ভোজনপটু। সপ্তাহের শেষে বাবা আসতেন দুদিনের জন্য পাঞ্জাব মেলে। তাঁর বিছানা পাতা থাকত। আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম—কিন্তু প্রায়ই মধুপুরের গাড়ির শব্দ, ঘুম-পাওয়া-ঘোড়াকে চালকের সশব্দ তাড়না—এ দূর থেকে শোনা যেত। বাড়িতে গেট খোলার আওয়াজ আসত, যেমন এখনও আসে—ঘরের মধ্যে শুয়ে আমরা শুনতাম। আনন্দে সব মন ভরে উঠত—বাবা এলেন। এত ভাল লাগত দুটো দিন—একজন মানুষের বাড়িতে থাকা আর না থাকার প্রভেদ যেন জ্বলন্ত হয়ে উঠত। আবার রবিবার সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যেতেন—তখন সবই ম্লান হয়ে যেত আপনা থেকে। পূজার সময় বছরের পর বছর যখন আসা হয়েছে, তখন অন্য ব্যাপার হত। কত লোক আসত, যেত,—সারাদিন বাড়ি গমগম করছে। বাইরে পাথরের সীটে লোক ভরে যেত। সে কি গল্প বলা ও শোনার ধুম! আমরা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতাম—নিজের মনে মনে কখনও, কখনও বা বাবাকে শোনাবার জন্য। একটু বড় হলে বাবা সব পুরাতন গল্প বলতেন

—তাঁর জীবনের ইতিহাস। সব কথা হয়ত সেভাবে মনে নেই আজ—কিন্তু মোটা-মুটি কথা মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। লোক এলেই তাদের খাওয়ানো চাই—এই ছিল বাবার অভ্যাস। কিছু মিষ্টি না খাইয়ে তিনি যেন তৃপ্তি পেতেন না। একবার পিসেমহাশয় এলেন, ক'দিন থাকলেন। কলকাতা থেকে তৈরী হয়ে সব খাট এসেছে, তার পালিশ ভাল হয়নি তখনও। পালিশ এল, কিন্তু মিস্ত্রী আসতে দেরী হতে লাগল। বাবা সবাইকে ডাক দিলেন—খাট পালিশ নিজেরাই করব। নিজেই আরম্ভ করলেন - শিরীষ কাগজ পালিশ নিয়ে সবাই কাড়াকাড়ি—বুড়ো ছেলে সব হৈ-হৈ ব্যাপার। দিদি ছিল বাড়ির আসল কর্ত্রী। আমাদের যা কিছু চাই বাবার কাছে, দিদিকে ধরলেই সব আদায় হত। কি লক্ষ্মী বোন ছিল আমাদের, দুঃখভরা জীবন তার, আমাদের নিয়েই তার সব সময় কাটত।

বাবার বন্ধুরা কেউ কেউ আসতেন। বিরাজবাবু কখনও এলেন না—মেয়ে মারা গেল ব'লে। হীরালাল বাঁড়ুজ্যে—জেঠামশাই বলে আমরা ডাকতাম—অমন গল্প বলার লোক দ্বিতীয় ছিল না। বাইরে খুব বাবু—আতর, গোলাপজল না ব্যবহার করলে তিনি বের হতেন না। কুঁচোনো কাপড়, বালাপোষ গায়ে দিয়ে সুপুরুষ চেহারা—তিনি ঘুরতেন। দশ বৎসর অন্তর তাঁর স্নান করা অভ্যাস ছিল। বাবা শীতকালে তাঁকে পাতকুয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে—মালীকে ইসারা করে তিনি কিছু বুঝবার আগেই তাঁর মাথায় এক বালতি জল ঢালিয়ে দিলেন। তখন তাঁর গায়ে ওভারকোট, বালাপোষ, আরো কত জামা পরা। তারপর ভদ্রলোক ভয়ে মারা যান আর কি! যা হোক, এমন কিছু হল না।

নাপিত ঠিকমত আসত না—ভৃগু ছিল তার নাম—কখনও আসত, কখনও আসত না। সতীশ বসু একবার বললেন যে বাবার দাড়ি কামিয়ে দেবেন। যোগেন মজুমদার তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন। শেষে খানিকটা কামিয়ে তাঁরা বললেন যে ক্ষুর আর চলছে না, তাঁদের হাত কাঁপছে। তখন অর্ধেক মাত্র কামানো হয়েছে। মহা মুস্কিল ব্যাপার। বাবার তাতে রাগ নেই—খুব হাসছেন। ডাকা হল কাকাবাবুকে (সতীশ মুখো) তাঁর হাত বেশ পাকা ছিল—তিনি কোন রকমে শেষরক্ষা করলেন।

তখন খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা ছিল মধুপুরে। দুধ, মাছ, মাখন, তেল, ঘি—সব জিনিস প্রচুর পাওয়া যেত—দাম সস্তা ও জিনিসও খুব ভাল। মিছরি দিয়ে সকালে এক এক তাল মাখন খাওয়া সবার বরাদ্দ ছিল। যোগেন মজুমদার, সতীশ বোসের চুরুট সিগারেট খেতে প্রায় পায়খানায় ছুটতে হত—না হয় অকারণে স্টেশনে যাচ্ছি বলে পালাতে হত। সাপের ভয় সন্ধ্যাবেলা—একটু দেরী করে বাড়ি ফিরলেই বাবার ধমক, তা সে যারই দেরী হোক না কেন। খাওয়া হত সবাই একসঙ্গে দালানে বসে—প্রথম আসন ছিল বাবার। সেই ছিল তাঁর আনন্দ। আর জোর করে বেশী খাবার পাতে দেওয়া এবং কিছুতেই যেন নষ্ট না হয় বলে ধমক দেওয়া হত। হেঁটে বেড়ানোই বেশী হত। গাড়ি চড়ার সুবিধা ছিল না ও মোটর এখানে আনার খুব বিরুদ্ধে ছিলেন বাবা। একবার এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে মোটর এনে মধুপুরের

রাস্তায় খুব ধুলো উড়িয়ে বেড়াতেন—মেয়েছেলেদের বেড়ানো বিপদজনক হয়ে উঠল। একদিন আমাদের বাড়ির কাছে সেই মোটর আসতে খুব ধমক লাগালেন বাবা। সে ভদ্রলোক লজ্জায় আর এদিকে গাড়ি আনতেন না। আমরা আর একবার গরমের সময় ছিলাম এখানে, আর একজন মোটর-প্রেমিক মোটরের ধুলোয় আমাদের অস্থির করে তোলেন। আমাদের ধমকানি দেবার বয়স বা সুযোগ ছিল না। আমরা সবাই মিলে পাড়ার অন্য লোকেদের সঙ্গে একজোট হয়ে সন্ধ্যার পর মোটর যখন বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেল—রাস্তায় বোতল-ভাঙা-কাঁচ ছড়িয়ে রাখলাম। বাড়ির একটু দূরে এই অপকার্য করে রাখা হল। মোটর এল ধুলো উড়িয়ে, আরোহীরা খুব আমোদে চলেছেন; হঠাৎ টায়ার ফাটার শব্দ—যেন কে গুলি ছুঁড়েছে। দুটো টায়ার গেল আর গাড়ি-চড়াও কিছুদিনের জন্য থামল।

যোগেন মজুমদারকে চোখ বন্ধ করে থাকতে বলে হাঁ করিয়ে রেখে, গরম রসগোল্লা তাঁর মুখে না দিয়ে নিজের মুখে ছেড়ে দিতাম। রাত্রে উড়ে বামুনকে জব্দ করার জন্য তার টিকি খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হল একবার। সবাই মিলে এইসব খেলা চলত। মহেন্দ্রবাবু (মুখোপাধ্যায়) আমাদের বুড়ো মাস্টারমশায় ছিলেন। ৬০-এর উপরে বয়স। বড় অমায়িক লোক ছিলেন, আর আমাদের প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তিনি সঙ্গে না এলে ছেলেবেলায় মধুপুরে আসা জমত না। শীতকালে তাঁর চোখে ফ্লানেল বেঁধে তিনি ঘুমোতেন। একবার ঘুমিয়ে আছেন আর বাইরের দরজায় টোকা মেরে আমরা ভাঙা গলায় ডাকছি—'বাবু, টেলিগ্রাম'। তাঁর তখন আধ-ঘুমন্ত অবস্থা। না উঠেই একটু বিকৃত স্বরে—"কে—কে—বাবু টেলিগ্রাম" নিজেই আস্তে আস্তে খানিকক্ষণ বলতে লাগলেন। আমরা সব হেসেই অস্থির। ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৫—চার বছর এইভাবে গেল। ১৯১৪ সালে ঠাকুরমা চলে গেলেন। সেবার তাঁর ঘর খালি; খুবই ফাঁকা লাগত।

বছরে একবার পাথরোল যাওয়া হত—রক্তের নদী বয়ে যেত—পাথরোলের মন্দিরের ভাঙা পাথরের মেজের উপর। মুড়ি আসত মাঝে মাঝে। বাড়িতে গোঁড়ামি খুব ছিল। মাংসরান্না আলাদা হত—পেঁয়াজ দেওয়া নিষিদ্ধ—বাজারের মাংস আসত না। দূরে নদীর ধারে এক মন্দির ছিল। গরুর গাড়ি করে একবার যাওয়া হল। ফেরার পথে দিদি পা মচকে পড়ে গেলেন। ক'সপ্তাহ শয্যাশায়ী। ভয়ে বাড়ি আসতে পারি না—কে এসে বাবাকে খবর দিয়ে প্রথম ধমক খাবে।

১৯১৬ সালে বুড়োর বিবাহ হল ফেব্রুয়ারী মাসে। সেবার দিদির খুব অসুখ—পেটের গোলমাল। কলকাতার চিকিৎসকেরা কিছু পারলেন না। এলাহাবাদের অবিনাশ বাঁড়ুয্যে ডাক্তার এলেন। বেঁটে মানুষ, দাড়ি ছিল অল্প—বুদ্ধি যেন চোখ মুখ দিয়ে ফেটে বের হচ্ছে। বাবার অগাধ বিশ্বাস তাঁর উপর ছিল। আগেও বাড়িতে খুব কঠিন অসুখ গেছে—বড়দার, বিজুর—সারিয়েছিলেন। তিনি খাওয়াতেন দুধ—steamএ জ্বাল দিয়ে সেই হজম করার জন্য ঔষধ দেওয়া হত। কয়েকদিনের মধ্যে দিদির অসুখ কমের দিকে গেল। পুজোর ছুটিও এসে গেল। তাঁর কথামত সবাই

আমরা এলাহাবাদে গেলাম। সেবার প্রথম আগ্রা যাই। খুব ভাল লেগেছিল সব দেখে। গৌরাঙ্গ বাঁড়ুয্যে (যিনি ১৯২৮ সালে গৌহাটিতে নৌকায় চড়ে ডুবে গেলেন সপরিবারে), আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এলাহাবাদে সত্যকাকার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাব হল। তাঁর গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। আগ্রাতে এক বাগানবাড়িতে আমাদের ওঠবার ব্যবস্থা হয়। বিরাজবাবু সঙ্গে ছিলেন। সন্ধ্যায় সেই বাড়িতে পেঁছে গৌরাঙ্গবাবু অন্ধকারে ছুটলেন বাথরুমে। কমোড বসানো ছিল ঘরে—তবে অন্ধকারে লক্ষ্য করেন নি যে তার তিনটি মাত্র পা ছিল। তার উপর তিনি উঠে বসেছিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে উলটে পড়ে গেলেন। চিৎকার-ধ্বনি আমাদের কানে এল। তখন তিনি মাখামাখি অবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন। সেই শীতের সন্ধ্যায় বেচারী স্নান করে ভদ্র সাজলেন। আগ্রা থেকে আমরা ফতেপুর শিকরী দেখতে গেলাম। একা চড়ে আচনেরা স্টেশনে ট্রেন ধরা হল। প্রায় ১২/১৪ মাইল একা চড়া। বিরাজবাবুর হিন্দীতে খুব দখল ছিল না। তিনি বসতে পারছিলেন না—বললেন—“আরে বাবা, তুমরা গাড়িতে পাছামে বেদনা হো গিয়া।” রসিক চালক উত্তর দিল—“হুজুর, ডালিম ত নেই হুয়া।” কি হাসি আমাদের তখন এবং পরেও এই গল্প নিয়ে! কাশীও বেড়ানো হল কদিনের জন্য। সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন। এঁর বিষয়ে অনেক গল্প আছে, সে আর এক সময় লিখব। তবে কাশীতে তাঁর খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলাম। পণ্ডিত মানুষ হিসাবে তাঁকে খুব গোঁড়া বলে মনে করতাম। ১৯১৩ সালে আমার নিজের উপনয়ন হয় এবং গোঁড়া হিন্দু হলে কি ভাবে শুদ্ধ আচার-বিচার মেনে চলতে হয়, তার বেশ ধারণা ছিল। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে খাওয়া যে কোন পণ্ডিত মানুষের চলতে পারে তা আমার বোধগম্য ছিল না। একদিন গঙ্গার ধারে ঘাটে বেড়াবার সময় কচুরীগলি থেকে গরম তৈরী কিছু খাবার বিদ্যাভূষণ কিনলেন। বাড়ি ফিরে সব খাওয়া হবে এই আমি ভাবলাম। গঙ্গার ধারে বেশ বাতাস দিচ্ছিল—সেখানে অন্ধকারের আড়ালে তিনি বেশ নির্বিবাদে সব খেতে শুরু করলেন। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিকের কি হল—তিনি হেসে উত্তর দিলেন, বিশ্বনাথের দেশে ওসব কিছু দরকার হয় না। যা হোক, অনেকদিন পরে কাশীতে সেবার এসে আমরা বেড়ালাম খুব। বিদ্যাভূষণের সম্পর্কে কাশীতে আরো একটা ঘটনা ঘটে। কাশীতে এসে অনেকেই কিছু না কিছু দান করে যান। বিদ্যাভূষণের নস্য না হলে এক মিনিট চলত না। তিনি খুব বীরত্বের সঙ্গে প্রচার করলেন যে কাশীতে এসে তিনি নস্য-দান করা স্থির করেছেন। এটা খুব একটা বড় রকমের ত্যাগ—সে বিষয়ে কারুর মনে সন্দেহ ছিল না। তারপর দু'দিন আমরা কাশীতে ছিলাম, তাঁকে নস্য ব্যবহার করতে দেখিনি। যাবার দিন ট্রেন হার্ডিং ব্রীজ পার না হতেই তিনি প্রকাণ্ড নস্যের টিপ নিয়ে নাকে প্রবেশ করালেন—মুখ একটু হাঁ করে ও চোখ একটু বুজে। এরূপ করার কারণ বোধহয় ছিল পুরোদমে আনন্দভোগ করা।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি করলেন?' তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবে, না চিন্তা করে উত্তর দিলেন—'কেন, আমি বলেছিলাম যে যতদিন কাশীতে

থাকব, ততদিন কাশীর নস্য নেব না। এখন কাশী ত্যাগ করলাম, আর কথা রাখার কোন প্রশ্ন ওঠে না।' তখন আমার ১৫ বছর বয়স। বিদ্যাভূষণকে চিনতে শুরু করেছি—গোড়াপত্তন বেশ ভালভাবেই হয়েছিল।

যা হোক, এলাহাবাদে ফিরে গেলাম আমরা আগ্রা কাশী ঘুরে। কথা হল দিদিকে নিয়ে মধুপুরে কিছুদিন থাকতে হবে। আমার ১৯১৬ সালে Matric দেবার কথা। কিন্তু তখন আমার বয়স ১৬ হয়নি। ১৯১৭ সালেও ১৬ হবে না মার্চ মাসে। তাই ১৯১৮ সালের আগে ম্যাট্রিক দেওয়া হবে না। ষোল বছরের আইন অনুযায়ী দু বছর ম্যাট্রিক ক্লাসে আটকে থাকার কথা। ইংরাজী পড়া, ফরাসী পড়া —এই সব তখন চলছে। আমিই থাকব দিদিকে নিয়ে এই কথা হল। সঙ্গে মুকুন্দবাবু মাস্টার থাকবেন। খুব নিজেকে বড় বলে মনে করলাম—কেননা এই বয়সে দায়িত্ব দিয়ে বাবা আমাকেই রাখলেন মধুপুরের বাড়িতে—সবাই-এর উপর তদারক করতে। নভেম্বর মাসের গোড়ায় এখানে আমরা এলাম। আর মার্চ মাসে কলকাতা ফিরলাম। সেই একটানা চার মাস থাকা হল এখানে শীতের সময়। খুব ভাল লেগেছিল, বেড়ানো হত, খানিক পড়া হত, সময় কোথা দিয়ে কাটত জানি না। ১৯১৭ সালে প্রশ্নপত্র দুবার বেরিয়ে গেল। পরীক্ষা আবার হল—যাদের বয়স কম ছিল তারাও এই ফাঁকে পরীক্ষা দিতে পারল। আমিও তার সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম। ভাল করে সব পড়া হয়নি—কেননা সেবার পরীক্ষা দেবার কথা মনেও আনতে পারিনি। যা হোক, দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়ে পাস করলাম। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন এল। আমরা বাবার সঙ্গে অক্টোবর মাসে বম্বে গেলাম। সেবার মধুপুরে বেশী আসা হয়নি। ঈস্টারের ছুটিতে পুরী যাওয়া হল—রাসবিহারীবাবুর বাড়িতে আমরা উঠলাম। ১৯১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সিমলা পাহাড় ঘুরে এলাম বাবার সঙ্গে। প্রমথ ও কাকা ছিল সঙ্গে। সেখানেও অনেক কিছু লেখার মত দেখেছিলাম। সেসব কথা এ খাতায় লিখব না। ১৯১৭-১৮ নানা দেশ ঘোরা হল। ১৯১৮ সালে বাবা মহীশুর গেলেন Convocationএ বক্তৃতা দিতে। আমার ১৯১৯ সালে আই. এ. পরীক্ষা। বড়দিনের ছুটিতে দিদি, বুড়া, পচু, নন্টু, কত্তিদাদার বৌ—আমরা খুব আমোদে এখানে কিছুদিন কাটালাম। মধুপুরের ঝরণা দেখা তখন একটা ফ্যাশন ছিল। সব নাম সেখানে লেখা হত। জানি না, এই ২৮ ২৯ বৎসরে সে-সব লেখা জলে ধুয়ে-মুছে গেছে কিনা। ১৯১৯ সালে আই-এ পরীক্ষা দিয়ে দার্জিলিঙ যাওয়া হল—স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট লেখা সম্পর্কে। সেখানেও অনেক কিছু ঘটনা ঘটে। পুজোয় মধুপুরে আসা হল। সেবার বড়দা এম-এ পাস করল। পুজোর আগে একবার—এম-এ পরীক্ষা শেষ হলেই ক'দিনের জন্য এখানে বেড়াতে আসা হল। এসে বড়দার অল্প জ্বর হল। বিদ্যাভূষণ ও আমি সঙ্গে ছিলাম। মধুপুরের সুবিখ্যাত ডাক্তার তখন হরিচরণ ঘোষ—লম্বা দাড়ি, খুব শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন, দরকারমত এলোপ্যাথী, কবিরাজী, হোমিও—সবই চিকিৎসা করতেন। তিনি এসে জ্বর দেখলেন ও বললেন—(আজও আমার মনে আছে), "শুষ্ক

চর্মে রস্‌টকস্‌ দেওয়া বিধেয়।" জ্বর ছাড়ে না দেখে বিদ্যাভূষণ স্থির করলেন বাবাকে খবর দেওয়া উচিত। পাছে চিঠি পেলে তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, স্থির হল যে আমরা দু'জনে রোগীকে এখানে একা চাকরের ও ডাক্তারের জিম্মায় রেখে কলকাতা চলে যাব। তাই করাও হল। বাবা ত শুনে ও আমাদের চলে আসতে দেখে অবাক্‌। খুব বকতে লাগলেন যে কি করে রোগীকে ওভাবে রেখে আমরা চলে এলাম। তিনি নিজেই চলে এলেন, ডাঃ অবিনাশ ব্যানার্জি এলেন। যা হোক্‌, ভাবনার কিছু ছিল না।

তখন আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। ১৯১০ সাল থেকে আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশীর আগে কোথাও যাওয়া সম্ভব হত না। পূজা কলকাতায় শেষ করে তারপর বেরনো হত।

১৯২০ সালে ঊষার বিবাহ। তারপর বড়দার বিবাহ। অনেক মেয়ে দেখা হয়। বৌদিকে পছন্দ দিদি আর আমি বিশেষ করে করি। ১৯২০ সালে কাশী যাওয়া হল। সেবার বাবা অস্থায়ী ভাবে চীফ জাস্টিস হলেন—খুব হৈ-চৈ হল। নতুন বৌ আসতে না আসতে এটা ঘটল বলে বৌকে সবাই খুব আদর করতে লাগল। বাড়িতে বৌদি এসেছে—সবাই তাকে কাছে টানতে লাগল। কাশীতে সেবার পূজো হল। কি আনন্দে দিনগুলো কেটেছিল—এখন মনে পড়লেও চোখে জল আসে। সে সব দিন ও মানুষ কোথায় গেল! বৌদির সঙ্গে খুব ভাব হল তখন থেকে—কোলে মাথা রেখে কত গল্প বলতাম ও শুনতাম। ১৯২১ সালে জুলাই মাসে নীলু এল—কত আনন্দ! ১৯২১ সালে মধুপুরে পূজা হল। সেই শেষ পূজা। মধুপুর পূজার ধুমে মেতে উঠেছিল।

১৯২২ সালে ১৬ই এপ্রিল আমার বিবাহ হল। তারপরই বড়দার অসুখের জন্য ডেরাডুন গেলাম। সেই বছর পূজা বন্ধ হয়। মার অসুখ হল পূজার সময়। কোথাও আর যাওয়া হল না। বড়দিনের ছুটিতে মধুপুরে আসা হল। আমার শ্বশুরমশায় এলেন। সুধা এল—আমরা শুতাম যে ঘরে এখন বড়দার শ্বশুরমশায় থাকেন সেই ঘরে। ক'দিন খুব আমোদে কাটল। হঠাৎ বুড়ার জ্বর হল। একটু বাঁকা রকমের জ্বর। তাকে নিয়ে সবাই আমরা ১লা জানুয়ারী কলকাতা চললাম দুপুরের এক্‌স্‌-প্রেসে। সঙ্গে ডাক্তার। পথে আসানসোল আসবার আগে দিদির হঠাৎ পেটে ব্যথা হল—অসহ্য যন্ত্রণা। আমরা আসানসোলে আমাদের গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম। মন বড় খারাপ হয়ে গেল তার কষ্ট দেখে। কলকাতায় পৌঁছে সে কি কাণ্ড! দোতলায় বড় ঘরে দিদিকে রাখা হল। তার পাশের ঘরে বুড়া। দিদির অসুখ বেড়েই চলল। ডাক্তার সবাই এলেন। কেউ কিছু করতে পারলেন না। ৫ই জানুয়ারী ভোরে সব শেষ। দরজা খুলে দাও আমি যাব—এই কথা। শেষ অবধি জ্ঞান ছিল। বাবার পায়ে হাত রেখে বললে, আপনাকে জীবনে কষ্টই দিলাম, সুখী করতে পারিনি। সে কি সাংঘাতিক রাত। আমরা দিদি ছাড়া সংসারের কিছুই জানতাম না। বড় হয়েও সব ছিল দিদির সঙ্গে জড়ানো। দুই বউ, দুই ভগ্নীপতি পেয়ে

দিদিরও মন খুব ভাল ছিল। বুড়োর ছেলে নন্টুকে তার কাছে রেখে নিজের ছেলের মতই মানুষ করছিল। দুবার বিধবা হয়ে তার জীবনে শান্তি ছিল না। কিন্তু বাবার সব চেয়ে আদরের ছিল দিদি। পাছে কখনও তার মনে কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগে, তিনি এটা সবাইকে বেশ বুঝতে দিয়েছিলেন যে সংসারের কর্ত্রী হল দিদি। টাকা তার হাতে, কাজের ব্যবস্থা তার হাতে—বাবার কিছুই চলত না—রাণীমা না হলে। সংসারের লক্ষ্মী সে-ই ছিল। যদিও তার জীবনের দীপ নিবে যাওয়ায় তার শান্তি হল, কিন্তু সংসারে সেই যে ভাঙন ধরল, তা আর কিছুতেই জোড়া লাগল না।

সেবার পূজার সময় মাকে নিয়ে বড়দা গেল সব তীর্থস্থান ঘুরে আসতে। মা একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। বাবা বাইরে কোন শোক বা দুঃখ দেখাতেন না; তাঁর প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। কিন্তু তাঁর ভিতরটা যে আস্তে আস্তে পুড়ে যাচ্ছিল, তা বেশ বোঝা যেত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দেহে ভাঙ্গন ধরল। অনেক দিন দেখেছি, রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারতেন না। সারাদিন সমানে খেটেছেন—আর গভীর রাতে বারান্দায় পায়চারি করছেন। দিদির শোকই তাঁর কাল হল। সেবার হাইকোর্ট থেকে তিনি এক মাসের জন্য ছুটি নিলেন। সবাই আমরা পুরী গেলাম। আমার সেবার ল' পরীক্ষা। কিছুদিনের জন্য আমিও পুরীতে ছিলাম। সুধা ছিল আমার সঙ্গে। সেই প্রথম গভীর পরিচয় তার সঙ্গে—অনেকদিন বাইরে থাকা একসঙ্গে। সমুদ্রের ধারে বেড়ানো হত, কত রাত পর্যন্ত কত গল্প হত। সন্তু এসেছে—সেইখানে তার সূত্রপাত হল বুঝতে পারলাম। সেবার পূজার ছুটিতে বাবা এলেন মধুপুরে। মা গেছেন তীর্থ করতে। সুধা মজঃফরপুরে তার জেঠামশায়ের কাছে গেল। আমি বাবার সঙ্গে এলাম। বউদি এল সংসারের ভার নিয়ে। ছোট বৌ—তখন থেকে তার উপর দায়িত্ব পড়ল। তখন উপেন ঠাকুর ছিল—কিছু দেখতে হত না। যদিও তার দোষও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু সেবা করতে অদ্বিতীয় ছিল সে। বেনুয়া এসেছিল। আমি প্রায় বাবার কাছেই থাকতাম। কত গল্প বলতেন—পূর্বদিনের কথা। শুনতে খুব ভাল লাগত। বেড়াতাম একসঙ্গে। হায়, তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে ১৯২৪ সালের মে মাসে তাঁকে হারাব!

বৌদি মধুপুরে খেলা করতে গিয়ে দোতলায় পড়ে গেল। খানিকক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে ছিল। শরীরে খুব আঘাত লেগেছিল, আমরা ত ভয় পেয়েছিলাম খুব। যা হোক, অল্পের উপর দিয়ে গেল। কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। সে মধুপুর আর আগের মত ছিল না। যেন একটা নিরানন্দের ছায়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক দিদি না থাকায় সবই যেন অন্ধকার। সেবার বড়দিনের ছুটিতে কোথাও আর আসা হল না। জানুয়ারী মাসে বাবা জজিয়তী ৬০ বৎসর হবার ক'মাস আগেই ছেড়ে দিলেন। ডুমরাওঁ কেসে ব্রীফ নিলেন। আড়াই লক্ষ টাকা ফী। প্রমথ, বড়দা, রূপেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা চলে গেলেন। কিছুদিন পরে পচুর টাইফয়েড হল। সে কি সর্বনেশে দিনগুলো! বাবা প্রতি সপ্তাহের শেষে আসতেন। দেখতাম শরীর ভেঙে যাচ্ছে। মুখে কিছু বলতেন না—কিন্তু সূর্য

দুবছে ধীরে ধীরে বেশ বোঝা যেত। পচুর জীবন নিয়ে টানাটানি। বহু কষ্টে বেঁচে উঠল। মা এসময় এক স্বপ্ন দেখে কেঁদে আকুল। বাবা তখন কয়দিনের জন্য পাটনা থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। মা দেখলেন যেন দিদি এসেছে আর বলছে যে "আমি যে একলা থাকতে পারি না; বেশ তোমার ছেলেকে নেব না, তবে আর একজনকে নিয়ে যাব এ বলে রাখছি।" কে সেই একজন এই ভেবে মার কান্না! আমার বেশ আজও মনে আছে—বাবা সকালে বেড়িয়ে এসে মার পূজার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মা কাঁদছেন। সন্তু হল ১৫ই এপ্রিল—২, বিহারীলাল চক্রবর্তী স্ট্রীটে। বাবার প্রথম নাতি—তাকে দেখে কোলে নিয়ে কত তাঁর আনন্দ! পচু একটু সেরে উঠতে আমি পুরী গেলাম ক'দিনের জন্য—সঙ্গে সতীশ বসু, মণিবাবু আর নন্টু। তারপর Universities' Conference-এর কাজে সিমলা গেলাম। সঙ্গে Sir C. V. Raman গেলেন। বাবার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পাটনার কেসের জন্য যাওয়া হল না। সিমলা যাবার দিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ওড়িষ্যার মধুসূদন দাস—বাবার তিনি শিক্ষক ছিলেন ও বড় খাতির করতেন তাঁকে। আমি তখন স্টেশনে যাচ্ছি। তিনি কি ভেবে বললেন আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাবেন। মধুসূদন দাস বিদায় নিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল স্টেশনে যাবার, পথে সুধা ও সন্তুকে দেখে যাব। বাবা সঙ্গে আছেন বলে ভাবলাম, যাওয়া আর হল না। সেদিন আর তার আগের দিন অনেক কথা হয়েছিল বাবার সঙ্গে—University নিয়ে, বাড়ির কথা নিয়ে, Library নিয়ে, আমাকে কি ভাবে মানুষ করতে চান—ইত্যাদি কত কথা বারান্দায় তিনতলায় দাঁড়িয়ে বলতেন। সেই বছরই আমাকে ডাঃ হরেন মুখুজ্জের জায়গায় Fellow করেন—Faculty of Arts থেকে। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিখছি—তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী চলছে। যা হোক, স্টেশনে যাবার পথে নিজেই নিয়ে গেলেন সুধার সঙ্গে দেখা করতে। গাড়িতে বসে রইলেন, আর বললেন যেন তাড়াতাড়ি নেমে আসি। স্টেশনে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েও তাঁর কথা শেষ হয় না। কখনও অমন ভাবে কথা বলতেন না বা স্টেশনে আসতেন না কোথাও যাবার সময়। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে এই তাঁর সঙ্গে শেষ কথা, শেষ পায়ে হাত রেখে প্রণাম। গাড়ি ছেড়ে দিল আর আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে যতক্ষণ ট্রেন প্ল্যাট-ফরম না ছাড়ল। একটা অব্যক্ত বেদনায় মন ভরে গিয়েছিল—যেন তাঁর কাছ থেকে দূরে অতিদূরে চলে যাচ্ছি। সিমলায় ক'দিন মাত্র ছিলাম। তাঁর চিঠি, টেলিগ্রাম রোজই আসত। শেষ টেলিগ্রাম: "হঠাৎ জ্বর হয়েছে—no anxiety, bring toys for Nantu and sticks for me।" পরে খবর এল নীলরতনবাবুকে নিয়ে যেন এখনই যাত্রা করি। পথে কাগজে খবর দেখলাম স্যার আশুতোষ চৌধুরী ২৩শে মে মারা গেছেন। পাটনায় পাঞ্জাব মেলে পেঁছিলাম নীলরতনবাবুকে নিয়ে প্রায় ৭টার সময় সন্ধ্যায়। আর ওদিকে তখন ৬-৪৫ মিনিটে সব শেষ হয়ে গেছে। হাসান্ ইমাম, রূপেনবাবু—আরো অনেকে স্টেশনে দাঁড়িয়ে। তখনও মনে আনতে পারছিলাম না যে বাবা নেই। যে বাড়িতে ছিলেন সেখানে আলো তীব্রভাবে জ্বলছে আর অনেক

লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসান্ ইমাম বললেন—"My boy, he is seriously ill."
ঘরের ভিতর ছুটে ঢুকলাম—বারান্দায় সিঁড়িতে উঠতে শব্দ এল—ঠিক তাঁর নাক-ডাকার মত। মনটা যেন মুহূর্তের জন্য আরামে শীতল হল। কিন্তু তখনই ঘরে ঢুকে বুঝলাম সেটা টানা পাখার শব্দ। বাবা শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গীতা আর তুলসীর গাছ। মাটিতে বসে প্রমথ আর বড়দা। সব শেষ।

এত বড় আঘাত জীবনে কখনও পাইনি আর পাবও না। বাবার চেয়ে আপন কাউকে ভাবতে পারিনি, সব আদর্শকে একত্র করে তিনি আমার সামনে ছিলেন। তিনি নেই এ ভাবতেও যেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এইভাবে অকস্মাৎ তিনি চলে যাবেন এ কল্পনাতীত। সেই কালরাত্রে Special train-এ করে তাঁকে নিয়ে আসা হল। মা উঠলেন ঝাঁঝা স্টেশনে। অনাথ ও গৌরাঙ্গর মা সঙ্গে। মা জানতেন না, ভাবতেও পারেন নি যে সব শেষ হয়ে গেছে। সে কি ভয়ংকর রাত্রি! মা পাগলের মত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে চান। এই মধুপুরে Special train এল ভোরবেলায়। কত আনন্দ করে এখানে আসতেন—আর আজ কি ভাবে তাঁকে এখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কলকাতায় পৌঁছে লোকেরা পাগলের মত এসে জুটল। কেউ স্বপ্নেও যা ভাবেনি—অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

১৯২৪ সালের ২৫শে মে থেকে জীবনের গতি সব পরিবর্তন হয়ে গেল। এক রাত্রের মধ্যে সব চাপল্য, খেলাধুলা যেন শেষ হয়ে গেল। নতুন জীবনের অধ্যায় আরম্ভ হল। ২২ বৎসর তাই চলছে।

এ খেলারই বা শেষ কোথায়, আজ ভাবি একলা মধুপুরে বসে!

এখন একটু অন্য কথা লিখে আজকের মত বিদায় নেব।

আরো একটা দিন এখানে কাটল। অনেকটা আজ বেড়িয়েছি। পূর্ণিমা আজ। কি জোছনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে! মন শান্ত আছে। ভগবানকে ডাকছি পথ দেখিয়ে দেবার জন্য। আজ আরো বেশী করে ডাকছি, কেননা এতক্ষণ যাঁদের কথা লিখলাম, তাঁদের অনেককেই তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। এই বাড়ি থেকে তাঁরা কত আনন্দভোগ করেছেন একদিন। আজ তাঁদের স্মৃতি মনে পড়ছে, ভালই লাগছে। এই ত জীবনের খেলা! এই আনন্দস্মৃতি বজায় রাখতে পারলে মনে কত ভাল ভাব জাগে। ঠাকুর, তুমি আমাকে পায়ের কাছে স্থান দাও। আমার মন থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর কর। শিখিয়ে দাও তোমার মধ্যে কি করে মিশিয়ে যেতে পারি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক তুমি—কত ক্ষুদ্র আমরা, কিন্তু কত গর্ব আমাদের! সেই ক্ষুদ্রতা স্মরণ করিয়ে দাও—নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ঘৃণা করব বলে নয়, কিন্তু তোমারই গড়া আমি এই ভেবে গৌরব বোধ করব এবং তোমার মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব। যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, তোমার কাজের ভিতর দিয়ে তোমার মহত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যাব—এর বেশী কিছু চাই না। আমিত্ব, আমারত্ব ভাব একেবারেই চাই নি। এটা আমার, আমাকে অমুক দিল, দিল না—এই দুঃখে কেন মাঝে মাঝে ভেঙে

পড়ি! তুমি আমার, আমি তোমার—তুমি আছ, আর কিছু আমি চাই না—এই ভাবনা যেন আমাকে জড়িয়ে থাকে। শক্তি দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, কপটতা শঠতা ভুলতে দাও, ঠাকুর, তুমি আমার অন্তরের ভিতরে এসে সব মলিনতা তিক্ততা মুছে দাও। তুমি ছাড়া আমার যে গতি নেই, এটা বেশ করে বুঝিয়ে দাও।

২২ জানুয়ারী, বুধবার
রাত আটটা

ক'দিন আর এ খাতায় লেখা হয়নি। গত শনিবার সন্ধ্যায় সন্তু এল। সে আসবে জানতাম, তাকে দেখে মন ভাল বোধ হল। আমাকে কতটা সে ভালবাসে তা এই অসুখের ভিতর দেখলাম। সঙ্গে এবার এক টিন্ ওভালটিন্ কিনে এনেছিল; আমি খেতে ভালবাসি এই জেনে। রবিবার সকালে বেড়িয়ে এসে উপরে উঠেছি, চা খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় বাড়ীতে গাড়ী ঢোকার শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দেখতে গেলাম। উপরে বাক্স, বিছানা দেখে মনে হল বুঝি বৌদি এল। গাড়ী থেকে নিশীথ, বুয়া, দিদিভাই নামল। সেবার ওরা আসবে বলে এল না। এবার আর কোন খবর দেয়নি। সন্তুকে বার্নপুরে চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি পাবার আগেই এখানে শনিবার চলে আসে। নিশীথ বুদ্ধি করে একদিনের ছুটি নিয়ে আসে। সে ঐদিনই এখানে বুয়াকে আনতে পারল! ওদের দেখে, বিশেষ দিদিভাইকে পেয়ে খুব ভাল লাগল। মনে হচ্ছিল এর উপর যদি বৌদি আজ এসে পড়ে, আরো ভাল হবে। কেন জানি না, দুদিন ধরে খালি মনে হয়েছে হঠাৎ সে বুঝি এসে পড়বে। তার আর এবার আসা হয়ে উঠল না। চিঠিতে লিখেছে—কবারই লিখেছে—যে এখানে আসতে খুব ইচ্ছা, কিন্তু হয়ে উঠছে না। দিদিভাই আমাকে ভুলে গিছল—ক'দিনই বা আমি জামসেদপুরে ছিলাম। বেচারীর গালে, গলায় ঘা হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছে। সব মুখ লাল হয়ে আছে। আমার খুব ভাল লাগে তাকে কাছে রাখতে, আদর করতে। ভাব হল আবার খুব শীঘ্রই। বুয়া মেয়েকে খুব যত্ন করে—বাবা, মা, দুজনেই খুব ভালবাসে দেখলাম। দেখে আনন্দ হল। নিশীথ সন্তু সেই রাত্রেই চলে গেল। ট্রেন লেট থাকায় নিশীথকে কলকাতা হয়ে জামসেদপুরে যেতে হল। এই তিনদিন নাতনী নিয়ে সময় কেটেছে তাড়াতাড়ি। এখন আর আমার কাছে আসতে বা থাকতে দিদিভাই কাঁদে না। একজন ভাল ঝি পাওয়া গেছে। জামসেদপুরে ঝি চাকর না থাকায় বুয়ার খুব কষ্ট গেছে। সে সব ঝক্কি মাথায় নিয়ে শান্তভাবে যে চালাতে পারবে তা আমি ভাবতে পারিনি—বেচারী চুপ করেই সবই করেছে—যেমন করা উচিত। দিদিভাই খুব হাসিখুশী হয়েছে—৬টি দাঁতের বেশ ব্যবহার করতেও শিখেছে। তবে সবার কাছে যেতে চায় না। তার দুই দিদিমণির ছবির কাছে গিয়ে খুব দেখলে, নাড়াচাড়া করলে, আদর করলে। আজ সুধা থাকলে কত যে আনন্দ পেত, আর এই নাতনীকে কত আদর করত, তাই বার বার মনে

হচ্ছিল। কলকাতায় গেলে বৌদি ওকে পেয়ে খুসী হবে। সে ত জন্মের সময় থেকে ক মাসই ওকে গড়ে তুলেছিল।

এই ত মায়া বাড়ান। ছোট্ট কচি মেয়েকে আদর করে বুকে তুলে যে স্নেহ আবার জমে ওঠে, তার থেকে ত ছাড়াছাড়ি হবেই। যাহোক্ ওরা সুখে থাকুক, দিদিভাই বড় হয়ে উঠুক, ভাল হোক্, এই কামনা করতে পারি।

কদিন শরীর বেশ ভাল আছে। রোজ দুবেলায় ৫।৬ মাইল করে বেড়ানো হয়। একদিন অন্তর ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রাত্রে খাওয়া হয়। এভাবে আরো কয়েক সপ্তাহ থাকলে উপকার স্থায়ী হত। কিন্তু রবিবার এখান থেকে চলে যাচ্ছি। Parliamentary Delegation-এর পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম, যাঁরা এসেছেন তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি ২৮শে বৈকালে বা ২৯শে সকালে আমার বাড়িতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারি এই খবর দিলাম। এখন আর এখানে ফিরে আসব না। এক মাস ত কাটালাম এইভাবে। মন আর চায় না এখানে থাকতে। আবার কিছুদিন পরে যদি সুবিধা করতে পারি আসব ও তিন সপ্তাহ থাকব। অনেক ভেবেছি এই তিন সপ্তাহ নির্জন প্রবাসে। মন কত কথা বলে, কত প্রশ্ন করে, তার সব জবাব এই নিস্তব্ধ, শান্তিময়, স্মৃতিময় মধুপুরে বসে দিয়েছি ও পেয়েছি। ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়ে তুলব—এই জটিল প্রশ্নের জবাব ঠিক এখনও পারি না দিতে। এক-একবার মনে হয়, সব ছেড়ে চলে যাই। এই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাময় সংসর্গ—যাকে জীবনের উন্নতির শিখর বলে—আর ভাল লাগে না। কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ কথা নিয়ে রেষারেষি, মারামারি—এ আর ভাল লাগে না। মনের আকুলতা, আগ্রহ, ব্যথা, সব কেমন করে একজনের কাছে ধরে দিয়েছি—তাই খালি মনে হয়। মনে শান্তি তখনই আসবে যখন সব কিছু নিঃস্বার্থতার ভিতর দিয়ে দেখতে পারব। আমার যা দেবার আছে তা দিয়েছি, দিতেও কৃপণতা করিনি, করব না। নেওয়ার, না নেওয়ার ভার কি আমার হাতে?

এখানে ভোরে আর সন্ধ্যার আগে বেড়াতে কত ভাল লাগে। লোকালয়ে যেতে ভাল লাগে না। বেশ মাঠের ভিতর দিয়ে, পরিচিত অপরিচিত পথ বেয়ে যেতে যেতে কত কথাই না মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। সেই সূর্য ওঠা থেকে আরম্ভ করে, বাগানের গাছপালা দেখা, বাড়ির পিছনের দিকে নির্জন আঁকাবাঁকা পথগুলিতে বেড়ানো, ছাদে রোদের তাপে স্নান, দুপুরে ঘরে রোদের ভিতর পা ছড়িয়ে বসা, বৈকালে লাইনের ধারে বেড়ানো, সূর্যকে নানা রঙের মধ্যে দিয়ে ডুবতে দেখা, চাঁদের আলো, তারার বিচিত্র রহস্যময় তাকান,—গভীর রাত—এই সবের ভিতরে রোজই কত পুরাতন কাহিনী মনে জেগে উঠত। সে আর লিখে শেষ করা যায় না। এই ঘরে আলোর সামনে বসে কত কথাই ছবির মত এই ঘরের মধ্যে ফুটে ওঠে। সময় যায় নিশ্চিন্ত হয়ে, যা যায় তা ফিরে আসে না সত্যি, কিন্তু মনের কোণে যে ছাপ রেখে যায়, তা ঠিক রাখতে পারলে আনন্দ কখনও ডুবে যায় না; সঙ্গীহীন জীবনও কখনও একাকী বোধ হয় না। এই চিরনতুনের যে আনন্দ তাই মনকে প্রেরণা যোগায়, সাহস দেয়, শান্তির

জলধারায় স্নান করিয়ে দেয়। মনের ভাবের আদান-প্রদান যখন হয় তখন সব যদি এক সুরে বাজে, সে ধ্বনি স্বগীয় ভাবে মনকে বিভোর করে। কিন্তু একা বসে চিন্তা করেও মনকে জাগিয়ে রাখার যে আনন্দ তা যে উপভোগ না করেছে সে বুঝতে পারে না।

সবার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় এই সময় বিশ্বস্রষ্টার অফুরন্ত মহিমা, তাঁর রাজ্যের মন-ভোলানো শোভা, তাঁর প্রেম ও ক্ষমা। আকাশ, বাতাস, মানুষ, প্রকৃতি, সূর্য, চন্দ্র, তারা, ফল ফুল লতা—যা যেখানে দেখি সবই তাঁর দেওয়া। যা আনন্দ পেয়েছি তারই মোহে আবদ্ধ না থেকে যদি সেই সচ্চিদানন্দের নির্বাক বাণীর মধ্যে নিজের প্রেরণা খুঁজে পেতে পারি, তার চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে! কিন্তু সে পাওয়ার সৌভাগ্য এমনি আসে না। মনকে সংযত করে আকুল ভাবে তাঁরই বেদীমূলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে—সে দেওয়ার মধ্যে কোন গর্ব থাকবে না, আমিত্ব থাকবে না, মলিনতা থাকবে না। শুধু মন থেকে বলতে হবে—তুমি নাও, আমাকে টেনে নাও, আর বিপথে চলতে দিও না, সব কিছু তোমার মধ্যে ঢেলে দিতে দাও। এই ফল না চাওয়ার প্রেরণা যখন ডাকের মধ্যে ফুটবে তখন তাঁর সিংহাসন নড়বে, তিনি আশ্রয় দেবেন।

পারি কই সে ভাবে ডাকতে! কিন্তু এই যে ভাবনা মনে জাগছে—যা আগে হয়ত এত জাগত না—যে তাঁকে পাওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই, হয়ত এই ভাবনাই একদিন ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। আকাশে কাল কটা তারা দেখলাম। কি জ্বলজ্বল করছিল—যেন কথা বলবে। খোদাই করা যেন সারা আকাশ। উত্তর-পশ্চিমের দিকে ধ্রুবতারা আছে স্থির হয়ে—বলে, ২০ হাজার বছর পরে তিনি সরে যান। তাই তিনি ধ্রুবতারা। আমার ধ্রুবতারা কি আর কোথায়,—তাই খালি ভেবেছি আকাশের দিকে তাকিয়ে! সব কিছু মঙ্গলময়, সুন্দর, সত্য তা পেয়েছি এরই মধ্যেই—তাকে পূর্ণ বিশ্বাস করে—আদর্শ স্থান দিয়ে বরণ করেছি—এর চেয়ে আর বেশী কি দেবার আছে! ঠাকুরের দান—দক্ষিণেশ্বরের কালীমায়ের দান—সে কখনও বৃথা যায় না। এই বুঝি বলেই—আরো ডাকি দেবতাকে আর বলি আমাকে আশ্রয় দাও, টেনে নাও, তোমার দানের পরিপূর্ণ মর্যাদা রাখতে দাও।

আজ বৈকালে নদীর দিকে বেড়াতে গেলাম। তারা-কুটীরে কি গোলাপ ফুটেছে—পাশের বাড়িতে কি সুন্দর, মিষ্টি-গন্ধ-ফুল ফুটে আছে। ফুল পেতে ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের বাড়ি তারা ডেকে নিয়ে ফুল তুলে হাতে দিল—পায়ের ধুলো নিল। এত গোলাপ—লাল, সাদা, হলদে—এর আদর আমি করি কেমন করে। এ ফুল কোথায় দিলে কেমন সাজে তাই ভাবছি এই রাত্রে; পূজো দেবার মত ফুল পেলাম, কিন্তু সাজানো বা পূজো দেওয়া আজ হল না। আজ আমার বাড়ির বাগান খালি—অন্য বাগানের ফুল এসে মন ভরে ওঠে না তেমন করে।

* * *

হাসি, অন্তুর কথা আজ এত মনে হয়েছে কেন জানি না। তাদের দেখতে বড়

ইচ্ছা করে। হাসুর জন্য ভাল পাত্র চাই—আদরের মধ্য দিয়ে সে মানুষ হয়েছে, কোথায় কার কাছে গিয়ে পড়বে তাই ভাবি। বুয়ার জন্য আর ভাবি না। নিশীথ ভাল ছেলে। অন্তুর ভিতর চাপা। তার ভবিষ্যৎ কোন্ পথে যাবে জানি না।

২৭ জানুয়ারী

ক'দিন এ খাতায় আর লেখা হয়নি। ১৯শে জানুয়ারী নিশীথ হঠাৎ বুয়া ও দিদিভাইকে সঙ্গে নিয়ে এল। এই সাতদিন ছোট্ট নাতনীকে নিয়ে সময় তাড়াতাড়ি ও আনন্দে কেটেছে। সে প্রথম দুদিন আমার কাছে বেশীক্ষণ থাকলে কেঁদে উঠত। কিন্তু শীঘ্রই খুব ভাব হয়ে গেল। দিনের মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কোলে থাকত। সে আসার পর একদিন ছাড়া আর এ খাতায় লেখা হয়নি। অন্য লেখা কিছু কিছু হয়েছে।

আজ মধুপুর থেকে চলে যাব। এই এক মাস এখানে কাটল নানা ভাব ও চিন্তার মধ্যে। যখন এসেছিলাম, পাঁচ মিনিট হাঁটলেই মাথা ঘুরত। শরীর যে কত দুর্বল হয়েছে বেশ বুঝতে পারতাম। প্রথম পনের দিন শরীর ভাল যায় নি। কিন্তু পশ্চিমে বাতাস খুব দিচ্ছে ক'দিন। আরো কিছুদিন এখানে থাকতে পারলে যে ভাল হত তার সন্দেহ নেই। Parliamentary Delegation দেখা করতে চায় বলে টেলিগ্রাম এল। সে একটা যাওয়ার কারণ। অন্য কারণও আছে। আর মন এখানে টিকছে না। একবার সবাইকে দেখতে ইচ্ছা করে বড়। যদি সুবিধা হয় আবার আসব ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে, এবং তখন থাকব ২/৩ সপ্তাহ।

কিভাবে ভবিষ্যতে জীবনযাত্রা চলবে তা ভেবে পাই না। আর রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে চাই না। তাতে কিছু কাজ হয় না। ঝগড়া আর ঝগড়া—এ আর পারি না। যে ক'বছর বাঁচব, যদি নিশ্চিন্তভাবে কিছু কাজ করতে পারি, তারই চেষ্টা দেখব। নিজের আর লোভ নেই—কোন পদ পাবার জন্য। কিন্তু কাজ করবার উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা খুবই আছে। হাতে পয়সা নেই—যার দ্বারা সংসারে সাহায্য করতে পারি আর নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারি। এমন কোন জায়গায় একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে ইচ্ছা করে যেখান থেকে বছরে অন্ততঃ ২৫জন মানুষ বাহির হবে, যারা আজীবন সমাজ সেবার ব্রত নিতে পারবে। জাতিকে ভেঙে গড়ে তোলবার মত বীর কর্মী কোথায়—অথচ শুধু রাজনৈতিক হুজুগে দেশ বাঁচবে না। সেই প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার আরাধনা হবে—শুধু ভাষা শেখবার জন্য নয়, এমন ব্যবস্থা থাকবে যার সাহায্যে এই সংস্কৃতের মধ্যে যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার আজও লুকিয়ে আছে, তার সঠিক বিশ্লেষণ দেশবাসীর আর জগতের কাছে পৌঁছে দেবে। আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির মধ্যে যা কিছু চিরস্থায়ী তা এই সংস্কৃত ভাষায় আজও আবদ্ধ। ইংরেজ বা জার্মান পণ্ডিতেরা ভারতবাসীর কাছে এই আলোকের দীপশিখা জেলে ধরেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী ভারতবাসী তার যথার্থ সমাদর করতে

শিখলে না। এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে। দেশের প্রকৃত মনোভাব যদি দেশীয় আধারের উপর স্থাপিত না হয়, কখনও ভারত তার স্বাধীন সত্তা খুঁজে পাবে না।

কাল সকালে বাড়ি ফিরব। কতদিন পরে যেন যাচ্ছি মনে হয়। দেহ ও মন দুই যদি পরিপূর্ণভাবে সবল ও সুস্থ না হয়, কোন কাজই করা সম্ভব নহে। ঠাকুরকে তাই ডাকি, ধন্যবাদ দিই যা তিনি দিয়েছেন তার জন্য আর বলি—তোমার কাছে অর্ঘ্য দেবার মত শক্তি ও ভক্তি দাও। এবার বুঝেছি যে মনের ও দেহের ক্লেশ ও দৈন্য দূর হয়ে যায় একাগ্রভাবে তাঁকে ডাকতে পারলে। এত আনন্দ বোধ হয়, যার কল্পনা আগেও করতে পারতাম না। কিন্তু ঠিক যথার্থভাবে ডাকতে আজও পারি না। সে পারা না পারার মালিকও তিনি। আগে ত এমনভাবে ডাকার কথা মনে হত না। এবার তাঁর কৃপায় ডাকবার কথা মনে উঠেছে, আবার তাঁরই কৃপায় একদিন ঠিক ডাকের মত ডাকতেও পারব নিশ্চয়। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না—অর্থ নয়, মান নয়, যশ নয়। নিজের কর্মফলানুযায়ী যা পাবার তাই পাব। শুধু চাই তাঁকে আত্ম-নিবেদন করার মত অধিকার। আর যাদের বড় ভালবাসি, যাদের না দেখতে পেলে মনে দুঃখ হয়, তাদের কাছ থেকেও কোন অন্যায় দাবী করে তাদের বিব্রত করতে চাই না। তারা সুখে থাকুক—মনের শান্তিতে যেন ভরে থাকে। এ সংসারে থাকা খেলা-ঘরে থাকার মত। এরই মধ্যে আসল ও ফাঁকি দুইই আছে। আসলের সন্ধান যদি মিলে—যা আমার ভাগ্যে মিলেছে—তাকে ছাড়তে কে চায়? তাঁকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করে সমস্ত শক্তি দিয়ে।

এবার মধুপুরের কাছে বিদায়। এই বাড়িতে, এই ঘরে বসে এক মাস সুখে-দুঃখে কাটালাম—যখন পীড়ায় শরীর অবসন্ন হয়ে ছিল। মা স্নেহ ও সেবা দিয়ে আমাকে সব সময় আগলে থাকতেন। কিন্তু বড় একার মধ্যে দিন কেটেছিল। যা পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করি।

॥ দিনলিপিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় ॥

অন্তু—দেবতোষ ; শ্যামাপ্রসাদবাবুর ছোট ছেলে

অনাথ—অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদের ভগ্নীপতি

অবিনাশ বাঁড়ুয্যে—ডাঃ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ

ইন্দুবাবু—ডাক্তার ইন্দু বসু

ঊষা—শ্যামাপ্রসাদের ছোট বোন রমলা

এস. এন. ব্যানার্জী—ব্যারিস্টার, কলকাতা হাইকোর্ট

কত্তিদাদা—শ্যামাপ্রসাদের পিসতুতো দাদা শিরীষচন্দ্র রায়

কাকা—বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—স্যার আশুতোষের মামাতো ভাই

গৌরাঙ্গ বাঁড়ুয্যে—ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারী, স্নাতকোত্তর বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দেবেন মজুমদার—ক্যাপ্টেন দেবেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার, মধুপুর

নণ্টু—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র

নির্মল—নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার, হাইকোর্টের বিচারপতি, পরে এম. পি.

নিশীথ—নিশীথরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদের বড় জামাই

নীলরতনবাবু—স্যার নীলরতন সরকার (ডাক্তার)

নীলু—নীলিমা, রমাপ্রসাদবাবুর কন্যা

পচু—শ্যামাপ্রসাদের ছোটভাই বামাপ্রসাদ

পিসেমশাই—সতীশচন্দ্র রায়

প্রমথ—শ্যামাপ্রসাদের ভগ্নীপতি প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়দা—রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বড়দার শ্বশুর—ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

বহুবল্লভ শাস্ত্রী—সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

বারিদ—বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়,—স্টেনো টাইপিস্ট

বিজয় কুণ্ডু—বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু—মধুপুরের সম্ভ্রান্ত পুরানো বাসিন্দা ও জমিদার

বিজু—উমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদের সেজ ভাই

বিরাজবাবু—বিরাজমোহন মজুমদার, উকীল : কলিকাতা হাইকোর্ট, ভাইস প্রিন্সিপাল : কলিকাতা ল কলেজ

বুড়ি—অমলা, শ্যামাপ্রসাদের মেজো বোন

বুয়া—সবিতা, শ্যামাপ্রসাদের বড় মেয়ে

বেনুয়া—শ্যামাপ্রসাদের মামাতো ভগ্নীপতি
বৌদি—তারা দেবী, রমাপ্রসাদবাবুর স্ত্রী
মণিবাবু—মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের নাতজামাই
মধুসূদন দাস—স্যার আশুতোষের গৃহশিক্ষক, পরে উড়িষ্যার রূপকার, সংগঠক নেতা ও অন্যতম মন্ত্রী
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গৃহশিক্ষক
যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—ব্যারিস্টার, পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাধাবিনোদ পাল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, উকীল
রাসবিহারীবাবু—ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ
রূপেনবাবু—রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, উকিল (পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ)
শরৎচন্দ্র বসাক—উকীল
শ্বশুরমশাই—ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তী, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—স্যার আশুতোষের জেঠতুত ভাই
সতীশবাবু—অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বসু
সন্তু—অনুতোষ, শ্যামাপ্রসাদের বড় ছেলে
সুধা—শ্যামাপ্রসাদবাবুর পত্নী
হরিচরণ ঘোষ—অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
হরেনবাবু—অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল)
হাসান ইমাম—পাটনার ব্যারিস্টার
হাসু—আরতি, শ্যামাপ্রসাদের ছোট মেয়ে
হীরালাল—হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়—স্যার আশুতোষের বাল্যবন্ধু
হেডমাস্টার—সতীশচন্দ্র বসু ; প্রধান শিক্ষক ঃ মিত্র ইন্সটিটিউশন (ভবানীপুর)

বন্দী-দশায়
শ্যামাপ্রসাদের জীবন-অবসান

শ্যামাপ্রসাদের জীবন অবসান হয় শ্রীনগরে ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন। তিনি তখন সেখানে বিনা-বিচারে কাশ্মীর সরকারের বন্দী। সেদিন সকালে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ আচম্বিতে প্রচারিত হয়। দেশবাসী বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত! সবারই মুখে একই প্রশ্ন,—শ্যামাপ্রসাদ মারা গেছেন! সে কী! তিনি তো কাশ্মীরে বন্দী। যে-কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন তাঁরা তো এই মৃত্যু-সংবাদের আগে তাঁর কোনরকম অসুস্থতার খবরই প্রকাশ করেন নি!

প্রকাশ করেন নি শুধু জনসাধারণে নয়, তাঁর বাড়িতে বা নিকট আত্মীয় পরিজন কাউকেও ঘূণাক্ষরে জানানো হয় নি তাঁর কোন অসুখের কথা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে জানানো হয় একেবারে তাঁর জীবন অবসানের সেই মর্মন্তুদ সংবাদ। তাও কী হৃদয়হীন ভাবে যথাকালে তার বর্ণনা দেওয়া যাবে।

মৃত্যুর পর কাশ্মীর সরকার তাঁদের দুই ডাক্তারের এক 'বুলেটিন্' ছাপান। আর, সপ্তাহ খানেক পরে ২রা জুলাই, কাশ্মীর সরকারের স্বাস্থ্য ও কারা মন্ত্রীর এক বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। সরকারী কেবলমাত্র এই দুটি প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে যে ঘটনাবলির উল্লেখ, তা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি অসমঞ্জস ও বিভ্রান্তিকর। এরপর, কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ভাষণ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অতি-বিলম্বিত এক বিবৃতি থেকেও মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা যথাযথ ঘটনা প্রকাশ পায় না। তাঁরা শুধু স্বকীয় সিদ্ধান্তটুকুই প্রচার করেন। পণ্ডিত নেহরু জানান, যাঁরা এসব ঘটনা জানতে পারেন এমন কয়েকজনকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তিগুলি যে কারা ও তাঁদের দেওয়া তথ্যগুলিই বা কী, তা তিনি প্রকাশ করেন না। এমন কি, শ্যামাপ্রসাদের বাড়ির পরিজনবর্গের কাছেও কোন কিছু অনুসন্ধান করারও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি। ফলে, সঠিক ঘটনাগুলি অপ্রকাশিত থাকায় ও সরকার পক্ষের অস্বাভাবিক গোপনতায় মৃত্যু-প্রসঙ্গ রহস্যঘন হয়ে ওঠে। দেশের চারিদিকে ও দিল্লীর লোকসভায়ও দাবি ওঠে, মৃত্যু সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

এই দাবির বিশেষ আর এক কারণও থাকে।

শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কাশ্মীর থেকে কলকাতায় এলে বন্দীজীবনে তাঁর ব্যবহৃত কাপড়জামা ইত্যাদির সঙ্গে কিছু কাগজপত্রও পাওয়া যায়। সেই কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর হাতে-লেখা কয়েকটি কাগজও ছিল। তাইতে তাঁর বন্দীদশায় অসুস্থতার কিছু কিছু তথ্যাদিও প্রকাশ পায়। এ ছাড়া, কাশ্মীরে বন্দী থাকাকালে বাড়িতে যে-কয়েকটি চিঠিপত্র এসেছিল, তা থেকেও তাঁর বন্দীজীবনের প্রকৃত অবস্থা কিছুটা প্রকট হয়। শ্যামাপ্রসাদের স্বহস্তে লেখা তথ্যগুলি কাশ্মীর সরকারের ও পণ্ডিত নেহরুর প্রচারিত বিবৃতির অনেকাংশেই সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই পরিবেশে তদন্ত কমিটি গঠনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিচারের জন্য গভর্নমেণ্টের

তরফের তথ্যগুলি, শ্যামাপ্রসাদের হাতে-লেখা কাগজের বিবরণ, তাঁর সহবন্দীদের বিবৃতি, কাশ্মীর সরকারের ডাক্তারদের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে ভারতের বিচক্ষণ চিকিৎসকদের অভিমত প্রভৃতি সাজিয়ে ইংরেজিতে এক পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়। সারা দেশে সেগুলি বহুল প্রচার লাভ করে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর অনমনীয় জেদের ফলে দেশবাসীর সেই তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি অগ্রাহ্য হয়। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণও দেশবাসীর মনে রহস্যাবৃতই থেকে যায়।

এতোকাল পরে, এখন এ-সবই পুরানো ঘটনা। তবুও, এখনও বহু লোকের মনে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানবার অদম্য কৌতূহল, অসীম আগ্রহ। কিন্তু, সব ঘটনা ত কারুরই জানা নেই। তবে, অধুনা-লুপ্ত সেই ইংরেজি পুস্তিকায় যে সব তথ্যাবলি প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে তাঁর বন্দীজীবনের ও মৃত্যু-কালের যে ছবি পাওয়া যায় এবং সরকারী বিবৃতি থেকে তা যে কতো বিপরীত,—এখন বাঙলাতে সেই কাহিনী আবার বিবৃত হোল।

॥ এক ॥

গ্রেপ্তারের পূর্বপট

কী কারণে ও কীভাবে গ্রেপ্তার করা এবং ভারত সরকারের এ সম্পর্কে আচরণ

কাশ্মীর প্রদেশ স্বাধীন ভারতের অংশভুক্ত হলেও ভারতীয় সংবিধানে কয়েকটি বিশেষ আইন সেই রাজ্যে ও রাজ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য থাকে এবং কাশ্মীরের অনেকখানি অংশ পাকিস্তানের কবলিতও হয়। ফলে, কাশ্মীর ভারতেরই অঙ্গভুক্ত অংশ হয়েও যেন এক স্বতন্ত্র রাজ্যের রূপ নেয়। এমন কি, ভারতীয়দেরও কাশ্মীর প্রবেশ করতে হলে ভারত সরকারের পারমিট বা অনুমতিপত্র নেবার আইনও প্রবর্তিত হয়। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'-এর দাবিতে জম্মু-কাশ্মীরে রাজনৈতিক আন্দোলনও চলে। আন্দোলনকারীদের প্রতি শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর সরকারের নানান্ অমানুষিক নির্যাতন ইত্যাদির সংবাদ দিল্লীতে আসতে থাকে।

শ্যামাপ্রসাদ তখন ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি। লোকসভার নির্বাচিত সভ্য। সেখানে বিরোধীদলের নেতৃস্বরূপ। কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়, কিন্তু তাতে সেখানকার সঠিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে উভয়পক্ষের মতান্তর প্রকাশ পায়। অবশেষে, ৮-৫-৫৩ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানান, তিনি নিজে কাশ্মীরে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি দেখার ও শান্তিস্থাপন করা সম্ভব হলে তারও চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রওনা

হচ্ছেন, শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করারও তাঁর আগ্রহ জানান। (পরিশিষ্ট ২গ) পণ্ডিত নেহরুকেও সেই টেলিগ্রামের একটি কপি পাঠান।

যাত্রাপথে ৯ই মে শেখ আবদুল্লার টেলিগ্রামের উত্তর শ্যামাপ্রসাদ পান। শেখ আবদুল্লা তাঁকে কাশ্মীরে আসতে সরাসরি নিষেধ করেন না, শুধু জানান, আমার মতে এখনকার অবস্থায় এ-রাজ্যে আপনার আসার পরিকল্পনা সময়োপযোগী নয় ও ফলদায়ক হবে না। (পরি ২গ)

পণ্ডিত নেহরু কোন কিছু জানান না।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁর যাত্রাপথে এগিয়ে চলেন। তাঁর মনে সংশয় থাকে, ভারত সরকার হয়ত তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে বাধা দেবে, সে-রাজ্যে ঢুকতেই দেবে না।

এ-অনুমানের যথেষ্ট কারণও থাকে। সে সময় কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে **ভারত সরকারের** অনুমতিপত্র—'পারমিট্' নেবার আইন বলবৎ ছিল। শ্যামাপ্রসাদ সেই অনুমতিপত্র ব্যতিরেকেই কাশ্মীরে প্রবেশ করতে চলেছেন, তাই ভারত সরকার আইনতঃ বাধা দিতে পারেন।

এই কারণবশতই, শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পর জনসাধারণেরও ধারণা জন্মায়, 'পারমিট্' আইন অমান্যের জন্যই তাঁকে বন্দী করা হয়।

কিন্তু, প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সেই আইন অমান্যের কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ভারত সরকারের প্রবর্তিত সে-আইন অমান্য করলে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ছিল ভারত সরকারের, আর তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাশ্মীর সরকারের হাতে এবং গ্রেপ্তারী পরওয়ানাগুলি (পরি ২গ) থেকে পরিষ্কার দেখা যায় কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের Public Security Act-এর বিশেষ ধারা অনুযায়ী তাঁকে বন্দী করা হচ্ছে। পারমিট্ আইন অমান্যের কোন উল্লেখই সেখানে নেই, থাকার কথাও নয়। অপর দিকে, যে-ভারত সরকারের নিকট থেকে কাশ্মীর প্রবেশে বাধা পাওয়ার বা গ্রেপ্তার হওয়ার কথা, তাঁরা তাঁকে কাশ্মীর প্রবেশকালে গ্রেপ্তার তো করলেনই না, বরং তাঁর কাশ্মীর প্রবেশে তাঁকে অযাচিত সাহায্যদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সে-ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, তাঁর সহ-বন্দী গুরুদত্ত বৈদ-এর বিবৃতিতে (পরি-১ ছ[১])। তিনি বলেন, ১১ই মে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গীরা পাঠানকোট পৌঁছান। সেখান থেকে কাশ্মীর অভিমুখে রওনা হওয়ার আগে গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে শ্যামাপ্রসাদকে জানান, সরকারের নির্দেশ পেয়েছেন, তাঁদের কারও 'পারমিট্' না থাকলেও যেন কাশ্মীরে যেতে দেওয়া হয়। তারপর, তিনি তাঁদের কাশ্মীর যাত্রার সুবিধার জন্য যানবাহনাদি দিয়ে সাহায্য করতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমন কি, তাঁর একজন অফিসার শ্যামাপ্রসাদের কয়েক-জন সঙ্গীকে তাঁর জীপ্-এ করে মাধোপুর চেক্পোস্ট পর্যন্ত নিয়ে চলেন। সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য অফিসাররাও তখন উপস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেট শ্যাসাপ্রসাদের শুভযাত্রা কামনা করে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

এই মাধোপুর চেক্‌পোস্ট রাভি নদীর ধারে। আর, সেই নদীই হোল জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা। ভারত সরকারের সেই অফিসাররা—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি—যখন নদীর এপারে দাঁড়িয়ে, এবং শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নদীর সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তখন লক্ষ্য করা যায়, সেতুর মাঝামাঝি কাশ্মীর সরকারের পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। সেইখানে পেঁছুতেই কাথুয়া (জম্মু)-র পুলিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেনট, কাশ্মীরের চীফ্‌ সেক্রেটারী ও Inspector General of Police-এর আগে-থেকে-সই-করে-আনা দুটি অর্ডার দেখিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে তখনি গ্রেপ্তার করে। প্রথম অর্ডারের তারিখ এক দিন আগেকার—অর্থাৎ ১০ই মে। তাতে হুকুম করা হয়েছে, তিনি যেন কাশ্মীর রাজ্যের কোন অঞ্চলে প্রবেশ না করেন অথবা থাকেন। দ্বিতীয় অর্ডারটি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা—১১ই মে তারিখের, ঐ S. P.-র কাছেই আগে-থেকে-সই-করিয়ে-আনা—তৈরিই ছিল, সেইটিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দিয়েই তাঁকে তখনি গ্রেপ্তার করা হয়। স্পষ্টই দেখা যায়, যে-সময়ে ঐ অর্ডারগুলি সই করা, সে সময়ে যে কারণ উল্লেখ করে অর্ডার লেখা, সেসব কারণের অস্তিত্বই ছিল না এবং স্বাক্ষরকারী অফিসার দুজন গ্রেপ্তারের সময় উপস্থিতও ছিলেন না। সেই গ্রেপ্তারী-পরওয়ানায় লেখা, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তির হানিকর কাজে শ্যামাপ্রসাদ লিপ্ত ও উদ্যত ; তাঁর সেই কাজের প্রতিরোধের জন্যেই তাঁকে বন্দী করা হোল।

কাশ্মীর সরকারের Inspector General of Police-এর স্বাক্ষরিত আরও এক হুকুমনামা প্রস্তুত ছিল। তাতে শ্রীনগরের কেন্দ্রীয় জেলখানার সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্‌কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শ্রীনগরের সেন্ট্রাল কারাগারে শ্যামাপ্রসাদকে যেন দু'মাস বন্দী করে রাখা হয়। প্রথম দুটি পরওয়ানা জম্মু-কাশ্মীর সরকারের Public Security Act (জনসাধারণের নিরাপত্তা আইন)-এর ৩ ও ৪ ধারা বলে জারি করা। (পরি ২গ)

এইভাবেই ভারত সরকারের সুস্পষ্ট সহায়তায় কাশ্মীর সরকারের হাতে শ্যামাপ্রসাদ বন্দী হোলেন।

কিন্তু, 'দুমাস' উল্লেখ করে বন্দী রাখা কেন ?

এই সূত্রে লক্ষণীয়, প্রথমতঃ—পণ্ডিত নেহরু ইংলণ্ডে রাণীর রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগ দিতে ভারতের বাইরে যাবেন এবং এই বন্দী করার দুমাসের মধ্যে তাঁর ফেরবার কথা। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকদিন আগে শ্যামাপ্রসাদকে দিল্লীতেও গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু, সুপ্রীম কোর্টের আদেশে (haveas corpus দরখাস্তের ফলে) তিনি মুক্তিলাভ করেন। আর, কাশ্মীর রাজ্য ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের আওতার বাইরে। তাই, মনে করা স্বাভাবিকই যে, কাশ্মীরে তাঁকে প্রবেশ করতে দিয়ে সেইখানে বন্দী করে রাখা,—যতোদিন পণ্ডিত নেহরু ভারতের বাইরে থাকবেন।

এই সম্পর্কে পরবর্তী কয়েকটি ঘটনায় মনের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করার পর কাশ্মীর সরকারও অর্ডিনান্স প্রচার করে আইন করেন, কাশ্মীর

প্রবেশের জন্য কাশ্মীর সরকারেরও 'পারমিট্'প্রয়োজন। শ্যামাপ্রসাদকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, সে-আইন ছিল না, তাঁকে কোন্ আইন-বলে বন্দী করা হয় গ্রেপ্তারী পরওয়ানা-তেই দেখা যায়। তবুও, তাঁর গ্রেপ্তারের পরই মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বেতার ভাষণে প্রচার করেন, 'পারমিট্' আইন অমান্য করে কাশ্মীর প্রবেশের জন্যই তাঁকে বন্দী করা হয়েছে! শেখ আবদুল্লা এই অসত্য প্রচারে সেইখানেই ক্ষান্ত হন নি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরেও ২৫শে জুন তারিখে এক ভাষণে তাঁকে বন্দী রাখার সেই অলীক কারণই আবার প্রচার করেন এবং অনুশোচনা প্রকাশ করে বলেন, 'পারমিট্' আইনের বাধা-নিষেধ আমাদের কাছে কিছুটা অসুবিধাজনক হলেও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমাদের মেনে নিতেই হয়, কেননা সেই দেশের প্রতিরক্ষা প্রত্যেক ভার-তীয়েরই অবশ্যকরণীয়। (পরি-১ ঙ)

অতএব, দেখা যায়, কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেন, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্যই শ্যামাপ্রসাদকে তাঁরা গ্রেপ্তার করে রাখেন!

এরপরও আরও এক ঘটনা লক্ষণীয়।

শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তারের আগে দিল্লীতে তাঁর বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা-ভঙ্গের অনু-যোগে একটা ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন ছিল। অনুমান করা হচ্ছিল, তাঁর গ্রেপ্তারের পর কাশ্মীর সরকার দিল্লীর সেই মামলায় বিচারের সম্মুখীন হবার জন্যে তাঁকে দিল্লীতে চলে আসতে দেবে। কেননা, প্রকৃতই যদি শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীরে প্রবেশ ও সেখানে থাকা কাশ্মীর সরকার অবাঞ্ছিতই মনে করেন, তাঁকে কাশ্মীর থেকে বার করে দেওয়ার এই তো সহজ সুযোগ। কিন্তু, দিল্লীর বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট যখন কাশ্মীর সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীকে তাঁর কোর্টের সেই ফৌজদারী মামলায় শ্যামা-প্রসাদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্যে তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন, কাশ্মীর সরকার দিল্লী ম্যাজিস্ট্রেটের সে অনুরোধ রক্ষায় অসম্মতি প্রকাশ করে উত্তর দেন, সময় এখন অল্প, বিচারকালে শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতি প্রয়োজন যদি হয়-ই তখন ব্যবস্থাদি করা যাবে।

ইতিমধ্যে দিল্লীর স্থানীয় সরকারও তৎপর হলেন, পাছে এই উপলক্ষে শ্যামা-প্রসাদ দিল্লী ফিরে আসেন। তাঁরাই সেই ফৌজদারী মামলার prosecutors—অভি-শংসক। তাঁদের পক্ষের শেষ এক সাক্ষী পুলিশ সাব্ইন্স্পেকটরের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মামলার শুনানীর দেরি করতে থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেট অসুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন্। নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্থানীয় সিভিল সার্জেনকে দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য সাক্ষীকে পাঠিয়ে দেন। ২রা জুন সিভিল সার্জেনের রিপোর্ট আসে, সাক্ষীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সেই তারিখেরই এক অর্ডারে ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, কাশ্মীর সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী তাঁকে জানিয়েছেন যে ডাক্তার মুখার্জিকে তাঁর কোর্টে অদূর ভবিষ্যতে হাজির হতে দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মামলাটিও মুলতবি রাখা হয়—১৫ই জুলাই এ, শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীরে বন্দীকাল ১৩ই জুলাই অবধি, ধারণা থাকায় (১১ই মে তিনি বন্দী হন)।

কাশ্মীর সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের গোপন বোঝাপড়ার বিষয় আরও প্রকট হয়ে পড়ে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শেখ আবদুল্লার দেওয়া বিবৃতিতে। তিনি পরিষ্কার স্বীকার করে ফেলেন, পণ্ডিত নেহরু ভারতে ফিরে এলেই শ্যামাপ্রসাদকে দিল্লী পাঠিয়ে দেবার কথা তাঁর সরকার ভেবেছিল (পরি ১ঙ)। আবার পণ্ডিত নেহরুও ভারতে ফিরে এসে এই কথারই সমর্থন করে বলেন, কাশ্মীর সরকার কদিন পরেই তাঁকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু তা হওয়ার নয়, শোচনীয় বিয়োগান্ত ঘটনাটি ঘটে গেল, মুক্তি তাঁর হোল, তবে অন্যভাবে। (পরি ১ চ)

গ্রেপ্তারের পরেই শ্যামাপ্রসাদ তাঁর এক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে এই সম্পর্কে যে অভিমত তখনি লিখে যান, পরবর্তী ঘটনাবলিও তাঁর সেই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন করে। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সেই 'নোটে' লেখেন, যেভাবে ভারত সরকারের অফিসাররা তাঁর কাশ্মীর প্রবেশ সুগম্য করেন তাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়। (পরি ২খ) বন্দী হওয়ার পর ১২ই মে তাঁর এক চিঠিতেও তিনি লেখেন, ভারত সরকার বিনা পারমিটে আমাকে আসতে দিলেও কাল আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।…বিচিত্র পরিবেশে আমার কাশ্মীরে স্থিতি পরিকল্পিত হয়েছে।

অতএব, দেখা যায়, কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করলেও এতে ভারত সরকারের ষড়যন্ত্র ছিল, সাধারণের এই সন্দেহ, শ্যামাপ্রসাদের নিজের লিখিত অভিমতেও প্রতিফলিত হয়। (এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের লিখিত নোটগুলি ও কাশ্মীর হাইকোর্টে তাঁর বে-আইনী অবরোধের বিরুদ্ধে দরখাস্ত আদি পরি ২ খ-তে দ্রষ্টব্য)

॥ দুই ॥

গ্রেপ্তারের পরবর্তী ঘটনাবলী

এই বিষয়ে কাশ্মীর সরকারের তরফে একমাত্র বিবৃতি সেখানকার গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য ও কারা মন্ত্রী পণ্ডিত শ্যামলাল শরফের (পরি ১গ)।

শ্যামাপ্রসাদকে সেই রাভি-সেতুর উপর ১১ই মে গ্রেপ্তার করার পর জীপ্-এ বসিয়ে শ্যামাপ্রসাদের আপত্তি সত্ত্বেও কীভাবে রাত দু'টা পর্যন্ত কাশ্মীর হিমালয়ের সেই সু-উচ্চ পার্বত্য প্রদেশ দিয়ে তাঁকে যেতে বাধ্য করা হয়,—মন্ত্রীর ঐ বিবৃতিতে তার কোন উল্লেখই নেই। শ্রীনগর পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' মাইল পথ হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে কীভাবে তাঁকে সামান্য বিশ্রামের অবসর দিয়ে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, সেই বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সহবন্দী সঙ্গী গুরুদত্ত বৈদ (পরি ১ছ১)

(ক)

বন্দী-জীবনে শ্যামাপ্রসাদের "সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধিব্যবস্থা"

("comforts & amenities")

১ঃ **সাব্-জেল**

মন্ত্রী মহাশয় এই "ছবির মত ভিল্যা" ও সেখানকার সবরকম আরামপ্রদ ব্যবস্থাদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সব আয়োজন ডাঃ মুখার্জির সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু সরকারী এই ব্যাখ্যান যে কতোখানি অসত্য তা নিম্নলিখিত ঘটনাবলীর বিবরণে দেখা যাবে।

এই সূত্রে লক্ষণীয়, তাঁর বৌদিদিকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের ২৫শে মে ও ৪ঠা জুন তারিখের চিঠি দুখানির এখান-ওখান থেকে নেওয়া টুকরা অংশ উদ্ধৃতি চিহ্ন লাগিয়ে তুলে ধরেছেন,—সেগুলি কিন্তু সঠিক উদ্ধৃতি নয়। কয়েকটি লাইন—বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিকও—বাদ দিয়েছেন। সেইরকম কতকগুলি লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে যথাস্থানে এর পরে উল্লেখ করা যাবে। আরও এক কথা, শ্রীটেকচাঁদ ডাঃ মুখার্জির 'একান্ত সচিব' (প্রাইভেট সেক্রেটারী) ছিলেন না, সহ-বন্দী মাত্র ছিলেন।

(i) যে বাংলোয় শ্যামাপ্রসাদকে বন্দী রাখা হয়, তা আয়তনে ক্ষুদ্র, কম্পাউণ্ডও অপরিসর। তাঁরা তিনজন বন্দী ছিলেন, চারজনেরও সেখানে জায়গা ছিল না। তাই, ১৯শে জুন যখন পণ্ডিত ডোগরা এলেন, ঘরের মধ্যে তাঁকে স্থান

দেবার জন্যে কম্‌পাউণ্ডে একটা তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করে সহবন্দীদের একজন সেইখানে গিয়ে থাকেন।

(ii) ঘরের বাইরে বেড়াবার মত যথেষ্ট জায়গা ছিল না। বেড়াতে না পেরে শ্যামাপ্রসাদ ক্ষুধাবোধ হারাতে থাকেন। কম্‌পাউণ্ডের বাইরে ঘণ্টাখানেকের জন্যও বেড়াতে দেওয়ার অনুমতি তিনি চাইলেও তা দেওয়া হয় না। মন্ত্রীর বিবৃতিতে রয়েছে, অফিসাররা এ-বিষয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কবে দেওয়া হয় তার উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে, শ্যামাপ্রসাদ সে অনুমতি কখনও পান্‌নি। সহ-বন্দী বৈদ-এর বিবরণে দেখা যায়, পুলিশকে মৌখিকভাবে নাকি বলা হয়েছিল, তাঁকে বাইরে যেতে দিতে, কিন্তু লিখিত কোন আদেশ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে বাইরে কখনও যেতে দেয় নি। (পরি ১ ছ১)।

(iii) সেই 'ভিল্যা' যে "সাব্‌-জেলে" পরিণত হয় তা সরকারও স্বীকার করেন এবং কর্নেল চোপরাও তাকে তাই বলেই উল্লেখ করেছেন।
দশ-বারোজন সশস্ত্র প্রহরী দিনরাত সেখানে পাহারায় থাকত।

(iv) বাড়িটায় একটিমাত্র শৌচাগার ছিল, এবং সেখানে যাতায়াত করতে হোত শ্যামাপ্রসাদের থাকার ঘরের ভিতর দিয়ে এবং সেইভাবেই তাঁর সহ-বন্দী দুজনকে ব্যবহারও করতে হোত,—অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের ঘরখানি 'প্যাসেজ'-এ পরিণত হয়।

(v) মন্ত্রী বলেছেন, একটা টেলিফোন ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। এটি সম্পূর্ণ এক মিথ্যা ধারণা গড়ে তোলবার চেষ্টা। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, শ্যামাপ্রসাদের ব্যবহারের জন্যেই সেই টেলিফোন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় বৈদ্‌-এর বিবৃতি থেকে,—ঐ সাব্‌-জেলের সবচেয়ে নিকটবর্তী টেলিফোন ছিল জল সরবরাহ অফিস্‌ বাড়িতে (Water Works Office Building)। সাব্‌-জেল থেকে কিছু দূরে এবং কম্‌পাউণ্ডের বাইরে থাকায় শ্যামাপ্রসাদ ও সহ-বন্দীদের অগম্য স্থানে এবং তাঁদের ব্যবহারের জন্যও নয়। তা ছাড়া, অফিসের সময়টুকু ছাড়া সে টেলিফোন ঘর বন্ধই থাকত। (পরি ১ ছ১)

(vi) মন্ত্রী জীপ্‌-এর ব্যবস্থাও ছিল, বলেছেন। কিন্তু, সে-জীপ্‌ ছিল শ্যামাপ্রসাদের সুবিধার্থে নয়, সুপারইন্‌টেনডেন্টের নিজের 'দায়িত্ব পালনের কাজ করতে এবং তাঁর দৈনিক পরিদর্শনে আসা-যাওয়ার জন্যে।
(যে-বন্দীর কম্‌পাউণ্ডের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ, যেতে দেওয়াও হয় না, তাঁরই সুবিধার্থে বাইরে আর এক বাড়িতে টেলিফোন থাকা এবং জীপ্‌-এর ব্যবস্থা রাখার কাহিনী যেমন কৌতুকাবহ তেমনি বিচিত্র !)

এইবার, শ্যামাপ্রসাদের লেখা চিঠিপত্রের নিম্ন-উদ্‌ধৃত অংশগুলি থেকে এই সম্পর্কে তাঁর দেওয়া কী ছবি পাওয়া যায়, দেখা যাক্‌।

পত্র : তাং ১৮-৫-৫৩ : (ইংরেজিতে)—"একটা ছোট্ট বাংলোয় আমি আছি···বাংলোটি একটা অপরিসর অথচ মনোরম বাগানের মধ্যে···বাগানের সংকীর্ণ পথটুকুতে

আমি বেড়াই…তুমি যখন এটা পড়বে, তোমার মনে হবে আমি নিশ্চয় কতো সুখেই না রয়েছি। হায়, তা তো সম্ভব নয়। স্বাধীনতা না থাকলে কোন দেহ-সুখ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনে কখনও কী আনন্দ দিতে পারে?…সব খবর ও বিবরণাদি দিয়ে দীর্ঘ উত্তর দিও—অবশ্য রাজনৈতিক কোন কিছু নয়, কেননা আমি এখানে কয়েদী।"

পত্র : তাং ২১-৫-৫৩ : (বাঙলায়)—"ছোট্ট বাগানের বাহিরে যাবার উপায় নেই। পুলিস অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাতদিন পাহারা দেয়—বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমাব জন্য আলাদা জেল তৈরী হয়েছে!…স্বাভাবিক দৃশ্য খুব সুন্দর …সুন্দর হবে না কেন? তবে বন্দী হয়ে থাকলে এ-আনন্দে সুখ নেই।"

পত্র : তাং ২৩-৫ ৫৩ : (ইং)—এটি একটা ছোট্ট বাংলো, সযত্নে রাখা ফলফুলের বাগানের মধ্যে।…অবশ্য আমাকে কম্পাউন্ডের বাইরে বেরুতে দেওয়া হয় না—ছোট্ট বাগানের পথটুকুতেই বেড়াতে হয়।

পত্র : তাং ২৫-৫-৫৩ : (বাং)—"বেড়াবার হুকুম বাগানের রাস্তায়—একবার যেতে ২/৩ মিনিট লাগে—সেইখানেই ও তার সামনে খোলা একটু জমি আছে সেখানে বেড়াই।…এ বাড়ী খুব ছোট, ঘরও নেই।"

পত্র : তাং ২৫-৫-৫৩ : (বাং) "বাহিরে সকাল বৈকালে বেড়াবার হুকুম পাওয়া গেল না। বাগানে ছোট রাস্তায় হাঁটি। বাগান বড় নয়।…পুলিশের লোক ১০/১২ জন আছে—পাহারা দিতে—সম্মানের কোন হানি হয় না!" (মন্ত্রী এ-চিঠি উদ্ধৃত করতে এ-অংশ বাদ দিয়েছেন)

পত্র : তাং ৩১-৫-৫৩ : (ইং) আমি এখানে মোটামুটি ভাল আছি—যদিও ঘোরাফেরার অভাবে ক্ষুধাবোধ হারাচ্ছি।…

পত্র : তাং ৩১-৫-৫৩ : (বাং)—"শরীর একরকম আছে। তবে ঘোরাফেরা নেই—শুধু বাগানে বেড়ান—তাতে ক্ষিধে হয় না।"

পত্র : তাং ৩-৬-৫৩ : (ইং)—আমি এখানে মোটের উপর ভাল আছি—শুধু ঘোরাঘুরি করতে না পারায় খুবই কম ক্ষিধে হয়।

পত্র : তাং ৬-৬-৫৩ : (বাং)—"আমি মোটের উপর ভালই ছিলাম—কিন্তু আবার দুদিন ডান পায়ে ব্যথা বেড়েছে—কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন যেন না দাঁড়াই—এই বলেন। এমনি ত বেড়াবার উপায় নেই—বাগানের মধ্যে ছাড়া—তাতে কোনরকম ক্ষিদে হয় না—তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বসে থাকতে হয়, তা হলে আরো মুস্কিল। কদিন আবার সন্ধ্যার পর একটু জ্বর হচ্ছে—বেশী নয়—৯৯°। চোখমুখ জ্বালা করে।"

পত্র : তাং ১৫-৬-৫৩ : (বাং)—"ক্ষিধে খুব কম হয়—বেড়ান নেই বলে।" (এই চিঠি তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় পৌঁছয়)

২। শ্যামাপ্রসাদের আহার্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ

মন্ত্রীর বিবৃতিতে আছে,—"ডাঃ মুখার্জি তাঁর নিজের পছন্দমত খাদ্য বেছে নিতেন।" আবার, কর্নেল চোপরার ১৫-৫-৫৩ তারিখের রিপোর্ট অনুযায়ী (Inspector General of Prisons হিসাবে দেওয়ায় সরকারী রিপোর্ট বলেই গণ্য) —তাঁদের খাদ্যের ব্যবস্থা পরমোৎকৃষ্ট (excellent) এবং যে মানের খাবার দেওয়া হয়, তার চেয়ে আর ভালো খাবার হতে পারে না। আবার, ৯ই জুন তারিখে তাঁর রিপোর্টে আছেঃ তাঁর খাওয়ানোর ব্যবস্থাদি সব সর্বতোভাবেই সন্তোষজনক। (পরি ১ গ)

অপরপক্ষে, উপরে উদ্ধৃত শ্যামাপ্রসাদের চিঠিগুলি থেকেই দেখা যায়, তিনি কিরকম ক্ষুধা বোধ হারাচ্ছিলেন এবং তাঁর শেষ অবধিও যে তাই-ই চলেছিল তার প্রমাণ মেলে তাঁর ১৮ই জুন তারিখের চিঠিতে,—আর সে-চিঠি কলকাতায় এসে পৌঁছয় তাঁর মৃত্যুর পর। তাতে তিনি লেখেন, "আমার ক্ষিধে হয় খুবই কম এবং কখন কখন শ্বাসপ্রশ্বাসের কিছুটা কষ্ট হয়।"

পরে দেখা যাবে, তাঁকে যা খেতে দেওয়া হোত, তা তাঁর স্বাস্থ্যের ধাত-সহ অভ্যস্ত স্বাভাবিক খাদ্যও নয়, পর্যাপ্তও নয়।

'আলাদীনের পিদিম' ঘষে শ্যামাপ্রসাদের যখন যা-খুশি সব কিছু পাওয়ার (পরি ১ গ) বর্ণনা যে কীরূপ মন্ত্রীর রূপকথা, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শ্যামাপ্রসাদের লেখা চিঠি থেকেই। দিল্লীতে তাঁর মেয়ের কাছে মাঝে মাঝে লিখে তার কাছ থেকে আনাতে হচ্ছে এইসব জিনিসপত্রঃ

১। এক টিন বিস্কুট (পত্রঃ তাং ১২-৫-৫৩ ; ৬-৬-৫৩)
২। নেস্‌কাফে (পত্রঃ তাং ১২-৫-৫৩ ; ২৫-৫-৫৩)
৩। মাফ্‌লার
৪। মার্কোলাইজ্‌ড ওয়াক্‌স্‌ } (পত্রঃ তাং ২১-৫-৫৩ ; ৩-৬-৫৩)
৫। এক টিন্‌ ওভালটিন
৬। এক শিশি মাথার তেল } (পত্রঃ তাং ৭-৬-৫৩)
৭। লেমন ড্রপ্‌ লজেন্স
৮। একটা খাতা
৯। লেখবার প্যাড্‌ } (পত্রঃ তাং ১৩-৬-৫৩)

একথা সবারই জানা, বন্দী অবস্থায় কোন কয়েদীই তার সেন্‌সর-করা চিঠিপত্রের মধ্যে তার অভাব অভিযোগ বা উৎপীড়নের কথা প্রচার করে না। আর, শ্যামাপ্রসাদের মতো ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতেই কারো কাছেই—এমন কি তাঁর আপনজনের নিকটেও নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব-অনটন নিয়ে অনুযোগ জানাতেই পারেন না। কয়েদী জীবনের বাধানিষেধ ও কষ্টের বিষয় তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন ও আপত্তি

না জানিয়ে মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করছিলেন। এ-সত্ত্বেও তাঁর চিঠিপত্রের ফাঁকে-ফাঁকে আভাস পাওয়া যায়, কী ধরনের দিনযাপন করতে তিনি বাধ্য হন।

পত্র ঃ তাং ৪-৬-৫৩ ঃ (বাং)—"বেলও খেলাম" (কলকাতা থেকে পাঠানো) "তবে সরবত করতে আর যা দরকার হয়, তা পাব কোথা থেকে ?···জেলের দুজন লোক এত সেবা করে ও খোঁজ নেয়—আমি ত অবাক হই।···দুধ কেন খাই না—খাবার এত কম খাই কেন,—এই সব কথা।" (এই অংশ মন্ত্রীর বিবৃতিতে এ-চিঠির উদ্ধৃতি থেকে তিনি বাদ দিয়েছেন !)

পত্র ঃ তাং ৬-৬-৫৩ ঃ (বাং) —"খাওয়া ত খুব সাবধানে খাই। সিদ্ধ খাওয়া—তরকারী। মাছ পাওয়া যায় না। দুদিন এনেছিল।···ভোরে ঘুম ভেঙে যায়,—তবে সাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না।···৭টায় এক কাপ চা।···সাড়ে আটটার আগে বাগানে গিয়ে বসি।···তখন খাবার আনে। দুখানা ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট—হাসু" (দিল্লী থেকে তাঁর মেয়ে) "পাঠিয়েছে—একটু মাখন দিয়ে, আধ-সিদ্ধ ডিম একটা ও এক কাপ দুধ কফি।" (কফিও মেয়ের পাঠানো) "তারপর সেখানেই বসে থাকি—বা একটু ঘুরি। বই আর বই—এই চলে বারোটা অবধি। তখন স্নান করি—ও প্রায়ই বাগানে গাছ-তলায় খাই।···সাড়ে তিনটায়···খালি চা—লেবু দিয়ে ও ফল (যদি থাকে) খাই।"···(রাত) "পৌনে নটা···বারান্দায় খাওয়া হয়—দুবেলার খাওয়া একই। একখানা রুটি খাই। সিদ্ধ তরকারী—কোন দিন মাংস—দই দুবেলাই খাই। মিষ্টি দু'একদিন এনেছিল।"

শ্যামাপ্রসাদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগের তিন দিন তাঁকে কি খেতে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর সহবন্দী বৈদ তার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

> ডাঃ মুখার্জির শেষ অসুখের আগের দুদিন তিনি একেবারেই ক্ষুধা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং অতি সামান্যই খাচ্ছিলেন।···ডাঃ মুখার্জি কেবলমাত্র চা, কফি, ভেজিটেবল সুপ পান করেন। ২০শে ও ২১শে তিনি সারাদিনে দু'কাপ ভেজিটেবল সুপ এবং এক বা দু কাপ চা ও এক কাপ কফি খান। ২২শে সকালে ডাক্তারের নির্দেশে অল্প কমলালেবুর রসও পান করেন। (পরি ১ ছ১)

যাঁর "প্লুরিসি" হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সেই রোগীর সারাদিনের এইটুকুই ছিল পথ্য ! (সেই দিনই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ও রাত্রে তাঁর জীবন অবসান !)

৩। চিঠিপত্র আদানপ্রদানের বিশৃঙ্খলতা ও চিঠির বিলোপ

বন্দীজীবনে পরিবারবর্গের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়, কখনই এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। তার উপর, বাড়ির খবরের জন্যে শ্যামাপ্রসাদের গভীর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণও থাকে। লক্ষ্য করা যায়, তাঁর অসুস্থা কন্যা ও বৃদ্ধা মাতার জন্য তাঁর বিশেষ দুশ্চিন্তা চিঠিপত্রে প্রকাশ পেতেই অদ্ভুত ভাবে তাঁদেরই চিঠিপত্রগুলির আসা-যাওয়া বিরল হতে থাকে, মাঝে মাঝে অন্তর্ধানও করে।

পরিজনবর্গের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদানপ্রদান কীভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, শ্যামাপ্রসাদের চিঠির উদ্ধৃত এই অংশগুলি থেকেই দেখা যায়ঃ

পত্র ঃ তাং ১৫-৫-৫৩ ঃ (ইং)—বাংলায় চিঠি লেখা আমার চলবে না, কেন না, জেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন চিঠিই যাবে না, আর তারা কেউ বাঙলা জানেন না। সেইজন্যে মা ও বৌদিদিকে চিঠি লিখতে পারছি না। তাঁদের বোলো যেন ভাবিত না হন্।

পত্র ঃ তাং ১৮-৫-৫৩ ঃ (ইং) ঃ (বৌদিদিকে)—এটা কীরকম অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তোমাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বাধ্য হতে হয়েছে? বাঙলাতে লেখা আমার চলবে না, কারণ এখানে এমন কেউ নেই যিনি তা' পড়ে সেন্সর করে তবে পাঠানোর অনুমতি দেবেন।

পত্র ঃ তাং ২১-৫-৫৩ ঃ (বাং)—"এর আগে ইংরিজিতে একটা চিঠি তোমাকে দিয়েছি। আশা করি পেয়েছ। চিঠি যেতে আসতে বড় দেরী হয়—গোলমালও হয়। এ চিঠি কদিন পরে পাবে জানি না।"

পত্র ঃ তাং ২৯-৫-৫৩ ঃ (ইং)—"তোমাকে, মাকে, বৌদিকে ও অন্তুকে কয়েকটি চিঠিই লিখেছি। তোমার শেষ টেলিগ্রামের পর তোমাদের কারও কোন চিঠি আসে নি।"

পত্র ঃ তাং ৩১-৫-৫৩ ঃ (বাং)—"কাল তোমার প্রথম চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। অবশ্য যদি বাংলায় তোমার নিজের হাতে লেখা চিঠি পেতাম, তা হলে ঢের বেশী ভাল লাগত।…এখানে মাঝে খবর দিল যে আমি কয়েকখানা চিঠি লিখতে পারি। মাকে, তোমাকে, বুয়াকে (মেয়ে) তাই লিখেছিলাম। সে সব চিঠি কি হল জানি না। কদিন আগে খবর পেলাম যে যিনি বাংলায় লেখা চিঠি পড়ে 'পাশ' করবেন—তিনি নাকি এখানে নেই, তাই চিঠি যেতে দেরী হবে। তিনি কে জানি না।…মার শরীর খারাপ হয়েছিল শুনে ভাবিত হলাম। আশা করি আর বাড়ে নি। কেমন থাকেন খবর দিও।…"

পত্র ঃ তাং ৩১-৫-৫৩ ঃ (ইং) ঃ এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে কিছুই তফাৎ হয় না—কেবল তোমার দু'আনা পয়সাই যায়!
(তাঁর অসুস্থ মেয়েকে লেখা। চিঠি তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর আশা-উৎকণ্ঠায় সে 'এক্সপ্রেস ডেলিভারি' ডাক-ব্যবস্থায় চিঠি পাঠায়।)

পত্র : তাং ৪-৬-৫৩ : (বাং) : "কাল তোমার বাংলায় লেখা চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। এর আগে ত আর বাংলায় লেখা চিঠি পাই নি। ইংরেজী টাইপ করা চিঠি পেয়েছিলাম। অন্য চিঠি কোথায় গেল জানি না।···মার শরীর এত খারাপ হয়েছিল কেন? নিশ্চয় দুর্বল হয়ে পড়েছেন? এখানে এসে পর্যন্ত তাঁর কোন চিঠি পাই নি। আমি ২/৩ খানা দিয়েছি···

(পুনশ্চ) এই চিঠি লেখার পর আজ তোমার তিনখানা চিঠি এল—বাংলায় লেখা বলে দিতে দেরী হয়েছিল বোধ হয়।···"

পত্র : তাং ৭-৬-৫৩ : (ইং) : (দিল্লীতে অসুস্থ মেয়েকে লেখা) : কয়েকদিন তোমার চিঠি না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন ছিলাম। আজ তোমার ১লা জুন-এর চিঠি পেলাম,—১লা জুনই ডাকে দেওয়া, এখানে পৌঁছেছিল ৪ঠা, আর আমাকে দেওয়া হোল আজ! দেখতে পাচ্ছ, দিল্লী থেকে আমার এখানে চিঠি পেতে কতোদিন নিচ্ছে!

পত্র : তাং ১৩-৬-৫৩ : (ইং) : গত দশ-বারোদিন তোমার বা বাড়ির আর কারও কোন চিঠি পাই নি। হাসুর শেষ চিঠির তারিখ ছিল ৩০শে মে। ডাকের চিঠির ব্যাপারে কিছু ঘটছে—জানি না চিঠিগুলি কোথায় চলে যাচ্ছে··· (আলাদা কাগজে) এই মাত্র তোমার ও বৌদির ৪ঠা জুনের চিঠি পেলাম। বাঙলায় লেখা বলেই এই দেরী—বাঙলা সেন্সর সহজে পাওয়া যায় না।

পত্র : তাং ১৩-৬-৫৩ : (ইং) : দেখতে পাচ্ছ, আমাকে ইংরেজিতে লিখতে হচ্ছে, না হলে 'সেন্সারিং' হতে দেরী হবে। তোমার ৩রা জুনের চিঠি মাত্র আজ পেলাম। তুমি আমার আগের চিঠিগুলি নিশ্চয় পেয়েছ। গত দশদিন তোমাদের কারও কাছ থেকে কোন চিঠি আসে নি—হাসুর কাছ থেকেও নয়।

পত্র : তাং ১৫-৬-৫৩ : (ইং) : অনেকদিন পরে পরশু তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। ঠাকুরমার চিঠি বাঙলায় লেখা, আসতে আরও সময় নিল। তাই তোমাকে ইংরেজিতেই উত্তর দিচ্ছি। আজ আলাদা একটা খামে ঠাকুরমা, জেঠাইমা, সেজকা, বুলবুলকে বাঙলায় চিঠি দিয়েছি—জানি না তাঁরা সেসব কবে পাবেন। এ মাসে হাসুর চিঠি খুবই অনিয়মিত ভাবে আসছে। তার শেষ চিঠির তারিখ ছিল ৩০শে মে। তাকে আমি চারখানা চিঠি লিখেছি, একটা টেলিগ্রামও করেছি—কিন্তু কোন উত্তর নেই। জানি না, কোথায় কি ঘটছে···আমি আশা করি তুমি এ চিঠি শীঘ্র পাবে।

[হায় রে আশা! শ্যামাপ্রসাদের ছোট ছেলেকে লেখা এই চিঠি সে কলকাতায় পায়—২৬শে জুন, পিতার মৃত্যুর চার দিন পরে! আর, তাঁর মা, বৌদি, ভাই ও ভাইপোকে লেখা সে-চিঠিগুলি-ভরা খাম, কাশ্মীর সরকারের কর্তৃপক্ষ শ্রীনগরে পোস্ট করেন (ডাকঘরের ছাপ থেকেই দেখা যায়) ২৪শে জুন—শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কলকাতায় পাঠানোর একদিন

পরে! এবং কলকাতায় পৌঁছয় ২৭শে জুন! যে-প্যাকেটে সেই চিঠিগুলি পাঠানো, তারই মধ্যে সেখান থেকে ফেরত এল তাঁকে লেখা তাঁর মায়ের ও বৌদিদির দুখানা চিঠি,—সে চিঠি শ্রীনগরে পৌঁছেছিল ১১ই জুন ও ১৬ই জুন, তবুও শ্যামাপ্রসাদকে সেগুলি দেওয়াই হয়নি!]

শ্যামাপ্রসাদের মা ও বৌদিদিকে লেখা তাঁর সেই ১৫ই জুনের চিঠি দুটি এই ঃ

পত্র ঃ তাং ১৫-৬-৫৩ ঃ (বাং) (বৌদিদিকে) ঃ "আজ বাংলায় চিঠি দিলাম—জানি না কতদিন বাদে পাবে। শুক্রবার ম্যাজিস্ট্রেট যখন এলেন, তাঁকে বাংলা চিঠি পেতে ও পাঠাতে এত দেরী কেন হয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন যে যিনি এইসব চিঠি পড়ে তর্জমা করে দেন, তাঁকে সব সময় এখানে পাওয়া যায় না। জানি না তিনি কে। আমি বল্লাম—আমাকে বিশ্বাস করলে আমি নিজেই তর্জমা করে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাতে পারি—তা হলে এত দেরী হয় না। তাতে তিনি রাজী হবেন কিনা জানি না। হাসু ত ইংরেজীতে চিঠি লেখে—আমিও তাই লিখি। কিন্তু আমি জুন মাসের গোড়া থেকে তাকে চারখানা চিঠি দিয়েছি—তার শেষ চিঠি ৩০শে মে লেখা পেয়েছি এখানে ৬ই জুন। কি যে হচ্ছে জানি না। যাক্, এ ভেবে লাভ নেই—এই রকম চলবে। তোমাদের খবর না পেলে মন ব্যস্ত হয়। মার শরীর কেমন আছে? তাঁর চিঠি অন্তুর চিঠির সঙ্গে পেলাম। লিখেছেন ত ভাল আছেন, তবে ক্রমেই দুর্বল বোধ করছেন—আর লিখেছেন তাঁর মনে হয় হয়ত আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। পড়ে আমার দুঃখ বোধ হল খুব। তাঁর শরীর কি বেশী খারাপ হয়েছে? আমার এখান থেকে অবশ্য করার কিছু নেই।·· ৬ই জুলাই অনেক দূরে থাকব—তাই না?" (৬ই জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন)।

পত্র ঃ তাং ১৫-৬ ৫৩ (বাং) (মাকে লেখা) ঃ "অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগল। বাংলায় লেখা চিঠি যেতে বা আসতে বড় দেরী হয়—তাই তোমার চিঠি পেতে আরো দেরী হল। আমি ভাল আছি—আমার জন্য তুমি ভেব না। কেন লিখেছ যে হয়ত আর তোমার আমার সঙ্গে দেখা হবে না। দেখা নিশ্চয় হবে—ও তখন তোমাকে ভাল দেখব। তোমার কথা প্রায়ই মনে হয়। তুমি শরীরের অযত্ন করবে না—যখন অসুখের মত বোধ হবে। প্রণাম নিও। চিঠি দিও।"

(আর, মায়ের লেখা চিঠি তখন কাশ্মীর কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে আটকে রয়েছে ১১ই জুন থেকে, তবুও শ্যামাপ্রসাদের জীবিতকালে তাঁকে দেওয়া ত' হোলই না, তাঁর দেহান্তের পর মাকে লেখা তাঁর উপরের ঐ ১৫ই তারিখের চিঠির সঙ্গে মায়েরই কাছে আখোলা অবস্থায় ফেরৎ পাঠালেন কাশ্মীর

সরকার !)

সব চিঠিরই খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ থেকেও দেখা যায়, শ্রীনগরে পৌঁছুলেও কী অত্যধিক দেরী করে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠিপত্রগুলি দেওয়া হোত।

৪। **বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার**

কাশ্মীরের মন্ত্রীর বিবৃতিতে শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ-সুবিধা দানের কোথাও কোনও উল্লেখ না থাকলেও ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মৌলানা আজাদ (প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তখন বিদেশে) ২৩ জুন তারিখে তাঁর বিবৃতিতে বলেন, জম্মু-কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদকে এক 'নার্সিং হোম'-এ স্থানান্তরিত করে এবং শ্রীনগরে অবস্থানকারী তাঁর বন্ধুরা যাতে তাঁর নিকটে থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা করে। (পরি ১ ঘ)

কিন্তু, প্রকৃত ঘটনা এই ঃ

(i) শ্যামাপ্রসাদের বড় ছেলে কাশ্মীরে যাওয়ার ও তার বাবার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাশ্মীর-প্রবেশের 'পারমিট' পেতে ব্যর্থ হয়ে ১১ই জুন শ্যামাপ্রসাদকে টেলিগ্রাম করে জানায়, 'কাশ্মীর-পারমিট' এখনি পাওয়া গেল না।

ii) শ্যামাপ্রসাদের কয়েকজন আত্মীয় তাঁর বন্দীকালে কাশ্মীরে যান এবং তাঁর সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করেও পান না।

(iii) শ্যামাপ্রসাদকে ২২শে জুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময়, তাঁর সহ-বন্দী তাঁর সঙ্গে যেতে চান ও হাসপাতালে তাঁর নিকটে থাকতে চান, কিন্তু তাঁদের সেই সনির্বন্ধ আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

(iv) কাশ্মীর সরকারের চিকিৎসকদের রিপোর্ট'-এ পাওয়া যায় (পরি ১ খ) শ্যামাপ্রসাদ ২২শে জুন রাত ১১টায় (হাসপাতালে) "restless"—অস্থির অস্বচ্ছন্দ হতে শুরু করেন এবং অক্সিজেন দিতে হয়। শ্রীবৈদ তাঁর বিবৃতিতে জানান, রাত ১ টায় (যখন শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সংকটাপন্ন অবস্থা নিশ্চয় বেশ বুঝতে পারছিলেন) তাঁর দুই সহ-বন্দীদের কাছে পেতে চেয়েছিলেন। তবুও কর্তৃপক্ষরা শ্যামাপ্রসাদের জীবনের সেই শেষ সময়েও সহ-বন্দীদের তাঁর নিকটে নিয়ে যাওয়ার কোনরূপ চেষ্টাই করেন নি। (পরি ছ১)

মৌলানা আজাদের বিবৃতি,—গভর্নমেণ্ট শ্যামাপ্রসাদের বন্ধুদের তাঁর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন,—সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(v) এ-সম্পর্কে আরও লক্ষণীয়, কাশ্মীর হাইকোর্টের এক অর্ডার জারি হওয়ার পর তবেই মিঃ ত্রিবেদী (শ্যামাপ্রসাদের ব্যারিস্টার) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান।

খ

শ্যামাপ্রসাদের অসুস্থতা

শ্যামাপ্রসাদের যে 'দুর্বল স্বাস্থ্য' সে-বিষয় কাশ্মীর সরকার জানতেন বলেই দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ২৫-৬-৫৩ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ডাঃ মুখার্জি যদিও 'technically'—নামতঃ বন্দী ছিলেন, গভর্নমেণ্ট তাঁকে সবরকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর স্বাস্থ্যের দুর্বলতার কারণে। (পরি ১ ঙ)

১০/১২ জন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় সীমাবদ্ধ স্থানে রেখে শ্যামাপ্রসাদকে নামতঃ বন্দী বলার এবং তাঁকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা দানের কাহিনী কতো দূর সত্য, পূর্ববর্ণিত ঘটনাবলি থেকেই বিচার করা যেতে পারে!

বন্দীকালে তাঁর অসুস্থতার বিভিন্ন পর্যায়ে কি রকম বিধিব্যবস্থা ও তাঁর প্রতি আচরণ করা হয় নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে প্রকাশিত হবে।

[এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয়, কর্নেল চোপরার ১৫ই মে তারিখের রিপোর্ট (স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে উদ্ধৃত) (পরি ১ গ) শ্যামাপ্রসাদকে সাব্-জেলে নিয়ে যাওয়ার তিন দিন পরে কর্নেল চোপরা যখন পরিদর্শন করেন তখনকার।]

ডান পায়ের যন্ত্রণা

মন্ত্রীর বিবৃতিতে আছে, ১৮ই ডাঃ মুখার্জি তাঁর ডান পায়ের ডিমে যন্ত্রণার অনুযোগ জানান। ব্যথার সঙ্গে অল্প ফোলাও ছিল এবং শিরাগুলি অস্বাভাবিক স্ফীত ও প্রলম্বিত (Varicose Veins) দেখা যাচ্ছিল। বিশ্রাম ও চিকিৎসার ফলে দুদিনে যন্ত্রণা চলে যায়, কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আরও প্রায় এক সপ্তাহ চালানো হয়। ৫ই জুন তাঁর আবার ডান পায়ের ডিমে টনটনে সামান্য যন্ত্রণা হতে থাকে, জ্বর বা ফোলা ছিল না। সেইদিন স্টেট্ হাসপাতালের হাউস্ সার্জেন ডাঃ প্রেমনাথ ধর-এর সঙ্গে ডাঃ আলি মহম্মদ তাঁকে Osteoarthritis ও সম্ভবতঃ গেঁটে বাতের পূর্ব ইতিহাস বিবেচনায় সেই মত চিকিৎসা করা হয়। দুদিনে তিনি সেরে ওঠেন। (পরি ১ গ)

অপর পক্ষে, শ্যামাপ্রসাদের চিঠিপত্রে বই বর্ণনা ঃ

পত্র ঃ তাং ১৯-৫-৫৩ (ইং) ঃ আমার ডান পায়ে একটা বিশ্রী ব্যথা হয়েছে। ডাক্তার আমাকে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী থাকতে বলেছেন।

পত্র ঃ তাং ২১-৫-৫৩ (বাং) ঃ "আমার কদিন ডান পায়ে একটা ব্যথা হয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। কেন হঠাৎ এত ব্যথা হল জানি না। ডাক্তার রোজ আসছেন—ওষুধ দিয়েছেন—লাগাতে ও খেতে। ঠাণ্ডার জন্য হয়েছে বলেন। একটু জ্বর হয়েছিল। আজ ভাল আছি। হাঁটতে পারছি।"

পত্র ঃ তাং ২৫-৫-৫৩ ঃ (বাঃ) ঃ "ডান পায়ে হঠাৎ ব্যথা হয়ে কদিন ভুগিয়েছিল। রোজ ডাক্তার আসতেন। এখন ভাল আছি। হয়ত ঠাণ্ডা লেগে হয়ে থাকবে।"

পত্র : তাং ২৫-৫-৫৩ : (বাং) : "মাঝে কদিন ডান পায়ে ব্যথা হয়ে সারা সময় শুয়ে কাটাতে হয়েছিল। পরশু থেকে ব্যথা কমেছে—একটু বেড়াতে পারি বাগানের মধ্যে" (মন্ত্রী এই চিঠির অংশ উদ্ধৃত করার সময় এই অংশ বাদ দিয়েছেন)।

এই প্রসঙ্গে এক অতিবিচিত্র ব্যাপার লক্ষণীয়, শ্যামাপ্রসাদ যে-সময়ে চিঠিতে তাঁর অসুস্থতার বিষয় এইভাবে লিখে জানাচ্ছেন ঠিক তখন—২৩শে ও ২৪শে মে, পণ্ডিত নেহরু তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ কাট্‌জুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগরে বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর শ্যামাপ্রসাদ-জননীকে লেখেন, আমি যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলাম আমি তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ করে খোঁজখবর নিয়ে জানি তিনি সুস্থ রয়েছেন। সে-খবরে তখন আমি খুশিই হই ! (পরি ১ ট)

পত্র : তাং ৪-৬-৫৩ : (বাং) : "আমার শরীর একরকম আছে। ডান পায়ের ব্যথা কমে গিছল—আবার কাল থেকে হয়েছে—হাঁটুর নীচে থেকে আরম্ভ হয়। হাঁটা মুস্কিল। গরম জলের ব্যাগ দিচ্ছি। কদিন একটু হাঁফ মত লাগল—কেন জানি না।" (মন্ত্রী এই চিঠিরও উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এ-অংশ বাদ দিয়েছেন !)

পত্র : তাং ৬-৬-৫৩ : (বাং) : "আমি মোটের উপর ভালই ছিলাম—কিন্তু আবার দুদিন ডান পায়ে ব্যথা বেড়েছে—কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন যেন না দাঁড়াই—এই বলেন। এমনি ত বেড়াবার উপায় নেই—বাগানের মধ্যে ছাড়া—তাতে কোনরকম ক্ষিদে হয় না—তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বসে থাকতে হয়, তা হলে আরো মুস্কিল। কদিন আবার সন্ধ্যার পর একটু জ্বর হচ্ছে—বেশী নয় ৯৯°। চোখ-মুখ জ্বালা করে। ওষুধ খাচ্ছি।"

১২ই জুন নাগাদ এই চিঠি কলকাতায় বাড়িতে পাওয়া মাত্রই শ্যামাপ্রসাদের বড়দাদা রমাপ্রসাদ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে শ্যামাপ্রসাদের অসুস্থতার বিষয় তাঁকে জানান এবং কাশ্মীর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন। ডাঃ রায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং শেখ আবদুল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলেন। শ্যামাপ্রসাদের বড় ছেলেও তখনি কাশ্মীর যাওয়ার জন্য দিল্লীতে 'পারমিট'-এর চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। এর পর অবশ্য ১৩ই জুনের চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ লেখেন, "আমি মোটামুটি ভাল আছি।"

পত্রঃ তাং ১৮-৬-৫৩ : (ইং) আমি এখন মোটামুটি ভাল আছি, তবে ক্ষিদে হয় অতি সামান্য ও মাঝে মাঝে শ্বাসপ্রশ্বাসের কিছুটা কষ্ট বোধ হয়। কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যায় অল্প জ্বর হচ্ছিল এবং ডান পায়ে বিশ্রী ব্যথাও হয়েছিল। এখন সেগুলো গিয়েছে…

[এ চিঠি পুনায় তাঁর মেয়েকে লেখা। মৃত্যুর পর কলকাতায় পাওয়া]

পত্র : তাং ২১-৬-৫৩ : (ইং) : "গত ৩/৪ দিন আমি ভাল নেই"

[এ-চিঠিও পৌঁছায় তাঁর মৃত্যুর পর। হাতের লেখা ও সই স্বাভাবিক নয়।]

উদ্ধৃত চিঠিগুলি থেকে স্পষ্টই দেখা যায় :

i) পায়ের যন্ত্রণা ১৮ই মে-র কিছু আগে অর্থাৎ তাঁর গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হয়। সহ-বন্দী বৈদ-এর বিবরণে রয়েছে, ওখানে পৌঁছানোর তিন দিন পরে ডাঃ মুখার্জি ডান পায়ের যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ও তাঁর জ্বরও হয়। আমাদের কাছে থারমোমিটার ছিল না। পরদিন ডাক্তার আসেন। (পরি ১ ছ১)

ii) সে-যন্ত্রণা "দুদিনের" মধ্যে চলে যায় নি। কয়েকদিন ধরে থাকে।

iii) যন্ত্রণার সঙ্গে জ্বরও হচ্ছিল।

iv) যন্ত্রণা তীব্রই হোত ও তাঁকে কয়েকদিনই একেবারে শয্যাশায়ী করে রাখে।

v) রিপোর্টে যে বলা হয়েছে, ৫ই জুন আবার টনটনে সামান্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং জ্বর ছিল না এবং দুদিনেই তিনি সেরে ওঠেন,—একেবারে অমূলক। আগের ব্যথা কিছুটা কমে, ৩রা জুন থেকে আবার বাড়তে থাকে এবং কয়েকদিন চলে। এমন কি মন্ত্রীর বিবৃতিতে উদ্ধৃত কর্নেল চোপরার ৯ই জুনের রিপোর্টে স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে সেদিন তখনও কিছু ব্যথা ছিল। (পরি ১ গ)

vi) "জ্বর ছিল না"-ও অসত্য। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর "অল্প জ্বর" হচ্ছিল।

vii) ৩রা জুন যন্ত্রণা আবার তীব্র হয়ে দেখা দিলেও, কর্নেল চোপরার রিপোর্টে জানা যায় চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আসেন দুদিন পরে—৫ই জুন!

viii) 'টনটনে সামান্য যন্ত্রণা' নয়,—শ্যামাপ্রসাদের ভাষায় 'বিশ্রী যন্ত্রণা'।

ix) প্রথম যে ডাক্তার দেখেন, তাঁর মতে, 'ঠাণ্ডা'র জন্যে ব্যথাটা। গিঁটেবাত "ইতিহাস" পরবর্তী আবিষ্কার। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর জীবনে আগে কখনও ঐ ধরণের বা পায়ের ঐ জায়গায় এমন ব্যথায় ভোগেন নি। এটা যে একটা নতুন ব্যাধির উপসর্গ, স্পষ্টই বোঝা যায়।

এইবার দেখা যাক্, মন্ত্রীর বিবৃতিতে উদ্ধৃত কর্নেল চোপরার পরবর্তী রিপোর্ট——৯ই মে থেকে ২৩শে জুন।

(ii) ১৯শে জুন অবধি সম্পূর্ণ সুস্থতার কাহিনী

মন্ত্রীর বিবৃতিতে দেখাই যায়, কর্নেল চোপরা, Inspector General, Prisons, তাঁর এই রিপোর্ট দাখিল করেন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর। অথচ ৯ই জুনের পর তিনি (কর্নেল চোপরা) নিজে কোনদিন শ্যামাপ্রসাদকে দেখতে যান নি। শ্যামাপ্রসাদের দেহান্ত হয়ে যাবার পর "কয়েক মিনিট দেরীতে" তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। ১৯শে জুন অবধি "শ্যামাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সুস্থতা",—তাঁর এই রিপোর্টের ভিত্তি স্পষ্টই বোঝা যায় দুটি কারণে, প্রথমতঃ ১৯শে জুন শ্যামাপ্রসাদ জেলের সুপারইনটেনডেন্টকে নাকি তাঁর কোন অসুস্থতার বিষয় অনুযোগ জানান

নি, এবং দ্বিতীয়তঃ সর্দার হুকুম সিং, এম্. পি. (তিনি চিকিৎসক নন্ এবং স্টেট আকালী কন্ফারেন্সে তাঁর সভাপতির ভাষণে পরিষদের আন্দোলনকে "চরম ক্ষতিকারক" বলে বর্ণনা করেন) ১৬ই জুন তারিখে শ্যামাপ্রসাদকে "বেশ সুস্থ" দেখেছিলেন।

আগেই দেখা গেছে, কর্নেল চোপরা তাঁর পূর্ববর্তী ৯ই জুনের রিপোর্টে বলেছিলেন যে ৯ই জুন তারিখেও শ্যামাপ্রসাদের কিছুটা যন্ত্রণা ছিল। সেই যন্ত্রণা কবে চলে গেল বা আদৌ গিয়েছিল কিনা তা জানা নেই, কেননা রিপোর্টে পরিষ্কার স্বীকার করা হয়েছে, ৫ই জুনের পর কোন চিকিৎসকই শ্যামাপ্রসাদকে এসে দেখেন নি।

শ্যামাপ্রসাদের চিঠিতে জানা যায়ঃ

পত্রঃ তাং ১৮-৬-৫৩ (ইং) (মৃত্যুর অনেক পরে কলকাতায় পৌঁছায়)—আমি এখন মোটামুটি ভাল আছি, তবে ক্ষিধে হয় অতি সামান্য ও মাঝে শ্বাসপ্রশ্বাসের কিছুটা কষ্ট বোধ হয়। কয়েক দিন ধরে সন্ধ্যায় অল্প জ্বর হচ্ছিল এবং ডান পায়ে বিশ্রী ব্যথাও হয়েছিল। এখন সেগুলো গিয়েছে।

পত্রঃ তাং ২১-৬-৫৩ (ইং) (মৃত্যুর পর পাওয়া, পরিবারবর্গের কাউকে লেখাও নয়)—

"গত তিন চার দিন থেকে আমি সুস্থ নই।"

অতএব '১৯শে জুন অবধি সম্পূর্ণ সুস্থতা'র কাহিনী অলীক। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের মধ্যে তাঁকে কোন ডাক্তার দেখানো বা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা কোন চিকিৎসাদিই করা হয় নি, যদিও তিনি তখন অসুস্থ এবং মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টও বোধ করছিলেন।

(iii) ২০শে জুন থেকে ২২শে জুনের পীড়িত অবস্থা

মন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে এক গুরুতর রোগকে লঘুভাবে দেখানোর চেষ্টায় "শরীর একটু খারাপ", "অল্প ব্যথা" ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০শে তাঁর জ্বর ছিল মাত্র ৯৯°২। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলী ভিন্ন প্রকৃতির। শ্যামাপ্রসাদের নিজের হাতে লেখা সেই তিন দিনের তাঁর টেমপারেচার চার্ট তাঁর ব্রীফ্ কেস্-এ পাওয়া যায়। হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই ব্রীফ্ কেস্‌টি চাবি-বন্ধ করে সাব্‌জেলে তিনি রেখে যান। তাঁর মরদেহের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্রর সঙ্গে সেই ব্রীফ্ কেস্‌টিও কলকাতায় ফেরত আসে।

সেই চার্টে লেখা জ্বরের তথ্য-তালিকা এইঃ

"২০/৬
সকাল ৮টা—৯৯°৪
দুপুর ১২টা—৯৯°২
বিকেল ৪টা—১০১°২

সন্ধ্যা ৮টা—১০০°২
২১/৬
সকাল ৮টা—৯৯°
দুপুর ১১-৩০—৯৮°৪
বিকেল ৪টা—১০০°
সন্ধ্যা ৮টা—১০০°
(২২/৬)

ভোর প্রায় চারটে—বুকের যন্ত্রণা—অপর্যাপ্ত ঘাম—জীবন নিঃশেষ হতে চলেছে ভাব—হঠাৎ টেম্পারেচর নেমে গেল। টেম্পারেচর নেওয়া

ভোর ৫-৩০শে—৯৭°
সকাল ৭টা—৯৮°
„ ৮টা—৯৮°২"

রোগের এই আক্রমণকেই, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ২৩শে জুন মৌলানা আজাদ বর্ণনা দিলেন এই বলে, "তিন দিন আগে তাঁর সামান্য ঠাণ্ডা লাগে এবং সেটা ড্রাই প্লুরিসিতে পরিণত হয়"।

আর, বিদেশ থেকে ফিরে কদিন পরে পণ্ডিত নেহরুর বর্ণনা হোল, "২২শে তিনি কিছুটা অসুস্থতা বোধ করেন।"

২০শে থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত যা ঘটে এবং সহ-বন্দী বৈদ যেমন দেখেছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায় বৈদ-এর বিবৃতিতে (পরি ১ ছ১)।

মিঃ ত্রিবেদীও (শ্যামাপ্রসাদের ব্যারিস্টার) এই সময়ে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় যেমন দেখেছেন ও তাঁর মনে হয়েছে, তার বিবরণ দিয়েছেন (পরি ১ছ১)।

উপরোক্ত ঘটনাবলী, মিঃ ত্রিবেদী ও বৈদ-এর বিবৃতি এবং অপরদিকে গভর্নমেণ্ট পক্ষের বর্ণনা থেকে এই বিশেষ বিষয়গুলি প্রকাশ পায়ঃ

১। শ্যামাপ্রসাদ ২০শে জুনের আগেও অসুস্থ ছিলেন।

২। তিনি তাঁর ৪ঠা জুন ও ১৮ই জুনের চিঠিতে শ্বাসকষ্টের উল্লেখ করেন। স্পষ্টতই দেখা যায়, ডাক্তাররা এই বিষয় লক্ষ্যই করেন নি, অথবা গণ্য বলে মনে করেন নি, কোন রকম প্রতিরোধের বা সতর্কতার ব্যবস্থাও নেন্ নি।

৩। ২০শে জুন সকালে ডাঃ আলি মোহাম্মদ তাঁর "ড্রাই প্লুরিসি" বলে রোগ-নির্ণয় করেন। পূর্বে সতর্ককারী কোন উপসর্গ বা লক্ষণাদি দেখা না দিয়ে অকস্মাৎ ঐ রোগ হতে পারে কিনা বিশেষজ্ঞরাই বিচার করবেন।

৪। মৌলানা আজাদের বিবৃতি, ২০শে জুন শ্যামাপ্রসারের "অল্প ঠাণ্ডা" লাগে ও সেটা 'ড্রাই প্লুরিসি'তে পরিণত হয়, এবং কাশ্মীর-মন্ত্রীর ঐ সম্পর্কে বিবৃতি পরস্পরবিরোধী।

৫। মন্ত্রীর বিবৃতিতে আছে (পরি ১গ) ২০শে জুন জেল কর্তৃপক্ষ টেলিফোনে খবর পান ডাঃ মুখার্জি সামান্য অসুস্থ এবং অবিলম্বে ডাক্তার অমরনাথ রাইনা (জেল

ডিস্‌পেন্‌সারির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার) ও ডাঃ আলি মোহাম্মদ তাঁকে দেখতে যান। শ্যামাপ্রসাদ নাকি তখন সামান্য ব্যথার কথা জানান।

অপরপক্ষে সহ-বন্দী বৈদ-এর বিবরণ, ১৯শে ও ২০শে জুনের মধ্যবর্তী রাত্রে "প্রবল জ্বরের" সঙ্গে যন্ত্রণা শুরু হয় এবং যন্ত্রণা অতি তীব্রই হয়েছিল। ডাক্তাররা আসেন বেলা প্রায় ১১টা ৩০-এ। (শ্যামাপ্রসাদ সেই রাত্রের পর সকাল থেকে টেম্‌পারেচার চার্ট রাখতে শুরু করেন, লক্ষণীয়)।

সরকারী রিপোর্টে যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছিল ও পরে তিনি অনেকটা ভাল বোধ করছিলেন,—এ-কথার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পায় শ্যামাপ্রসাদের নিজের হাতে লিখে রেখে যাওয়া টেম্‌পারেচার চার্ট থেকে। ২০শে জুন বিকেলে জ্বর উঠে যায়—১০১° ২-এ! (পরি ২ ক)

৭। ২০শে জুন বেলা সাড়ে এগারোটায় ডাক্তাররা এলেও ৩-৩০-এর আগে ওষুধের ব্যবস্থা হয় নি।

৮। Streptomycin ইন্‌জেকশন শ্যামাপ্রসাদের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে দেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ ডাক্তারকে জানান, তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক নিষেধ করেছেন, ঐ ইন্‌জেকশন তাঁর ধাতে সহ্য হয় না, কখনো যেন না নেন, তবুও সেই ইন্‌জেকশনই দেওয়া হয়।

৯। ইন্‌জেকশন দিয়েছিলেন জেলের ডাক্তার।

১০। তাঁর ১৯৩৭ ও ১৯৪৪ সালের রোগের পূর্ব ইতিহাস শ্যামাপ্রসাদ ২০শে ও ২২শে জুন যা বলেছিলেন বলে বলা হয়েছে, তার দুটি বিবরণীই অসঙ্গতিপূর্ণ।

১১। সহ-বন্দী বৈদ তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, ২০শে জুন ডাঃ মুখার্জি তাঁর অসুখের খবর পরিবারবর্গকে জানানোর জন্যে সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্‌টকে বলেন (পরি ১ ছ১)। কিন্তু সে-সংবাদ পাঠানো হয় নি, গভর্নমেণ্ট কোন 'বুলেটিন'ও প্রচার করেন নি।

১২। ২১শে জুন জেলের ডাক্তার (তাঁর যোগ্যতা জানা নেই) ছাড়া অন্য কোন ডাক্তারই—এমন কি আলি মোহাম্মদও, তাঁকে দেখতে বা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিতে আসেন নি। জেলের ডাক্তার বেলা প্রায় দশটায় আসেন। শ্যামাপ্রসাদের জ্বর ও যন্ত্রণা বাড়তে থাকে বিকেল থেকে, অথচ তখন চিকিৎসক কেউ ছিলেন না।

১৩। ২০শে জুন সকালে প্লুরিসি বলে নির্ণীত হলেও, ২০শে থেকে ২২শে অবধি সাব্‌ জেলে তাঁর (নার্সিং) সেবা-শুশ্রূষার কোনরকম ব্যবস্থা করা হয়নি।

১৪। ২০শে ও ২১শে জুন তাঁর পথ্য ছিল—সারাদিনে—

দু কাপ ভেজিটেবল সুপ,
এক বা দু কাপ চা,
এক কাপ কফি!

১৫। ২২শে জুন শ্যামাপ্রসাদ তাঁর অবস্থার কথা নিজের হাতে লিখে গেছেন (পরি ঃ ২ ক) ঃ "প্রায় ভোর চারটে—বুকের যন্ত্রণা—অপর্যাপ্ত ঘাম—জীবন নিঃশেষ

হতে চলেছে ভাব—হঠাৎ টেম্‌পারেচার নেমে গেল" "ভোর ৫-৩০শে টেম্‌পারেচার ৯৭°" (অবশ্য জিহ্বার তলায়)—যদিও তখন, বৈদ-এর বর্ণনা, ঘামা বন্ধ হয়েছে। ডাক্তারের জন্য টেলিফোনের যোগাযোগ করতে ৫-১৫ থেকে ৫-৩০ হয়ে যায়, আর ডাক্তাররা দেখতে আসেন প্রায় সাড়ে সাতটায়! সেদিন সকাল দশটায় মিঃ ত্রিবেদী (শ্যামাপ্রসাদের কৌঁসুলী) দেখা করতে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে বলেন, "মেরে ভাই পাঁচ বাজে তো চলে যাতা থা"! (পরি ১ ছ২)

১৬। রোগের এমন অবস্থা সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ যতোকাল সাব্‌-জেলে ছিলেন তার মধ্যে তাঁর রোগ নির্ণয়ে কোন ল্যাবরেটারি বা প্যাথোলজিকাল পরীক্ষা হয় নি। সাব্‌জেলে বা হাসপাতালে কোন এক্‌স্‌-রেও করানো হয় নি। ২৩শে জুন সকালে করানোর একটা প্রস্তাব মাত্র উঠেছিল, আর তার আগে তাঁর দেহান্ত হয়!

১৭। শ্যামাপ্রসাদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দুই সহ-বন্দীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁদের কাউকে সঙ্গে যেতে দেবার অনুমতি দেওয়া হয় নি। এমন কি জেলেরই যে দুজন পরিচারক বন্দীকালে তাঁর কাজ করছিল তাদেরও সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়নি।

১৮। করোনারি হার্ট অ্যাটাক নির্ণয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিবারবর্গকে কোন খবর জানানো হয় নি।

১৯। সারা বন্দীকালে যে শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যদৌর্বল্য ছিল এবং কাশ্মীর সরকার সে-কথা জানতেনও, মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা নিজেই তা স্বীকার করেন ২৫শে জুন। (পরি ১ ঙ)

২০। মন্ত্রীর বিবৃতিতে বর্ণিত "আরামপ্রদ মোটরে" শ্যামাপ্রসাদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় একটা অতি ছোট মোটরে (4-seater) আর তার মধ্যে তাঁর অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় বসার মাত্র জায়গা হয় [Organiser-এর রিপোর্ট-এ প্রকাশ (পরি ১ ঠ), এবং মোটরে তাঁর সেই অবস্থায় বসে থাকার পাশে বসেছিলেন জেল সুপারইনটেনডেণ্ট], তা' ছাড়া সাব্‌জেল থেকে হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। এ এক অকল্পনীয় সাঙ্ঘাতিক ব্যবস্থা,—এক করোনারী রোগাক্রান্ত রোগীকে ঐ রকম গাড়ীতে, ঐভাবে বসিয়ে, অতোখানি দূর পাহাড়ী পথে নিয়ে যাওয়া!

২১। শ্যামাপ্রসাদকে কোন 'নার্সিং হোম'-এ নিয়ে গিয়ে রাখা হয় নি। রাখা হয়, শ্রীনগরের সরকারী (স্টেট) হাসপাতালের Gynaecological (স্ত্রীরোগসম্পর্কিত) ওয়ার্ডে!

২২। হাসপাতালের মধ্যেও তাঁর জীবনের সেই শেষ সময়েও পুলিস প্রহরায় বন্দী ভাবেই রাখা হয়!

২৩। শ্যামাপ্রসাদের অবস্থা চরম সংকটাপন্ন হয়ে এলেও, এবং তিনি ব্যগ্রভাবে চাইলেও, তাঁর সহ-বন্দীদের বা মিঃ ত্রিবেদীকে আনিয়ে তাঁর মৃত্যুশয্যা-পাশে এসে উপস্থিত থাকতে দেওয়ার কোন চেষ্টাই হয় নি।

২৪। পরমাশ্চর্যের বিষয়, যে-শ্যামাপ্রসাদ বাড়ির খবরাখবরের জন্যে সারাক্ষণ অমন উদ্বিগ্ন থাকতেন ও অতো ঘন ঘন চিঠি লিখছিলেন, তিনি ১৫ই জুনের পর কলকাতায় তাঁর পরিবারবর্গকে কোন চিঠি দিয়েছেন বলে দেখা যায় না। তাঁর ১৫ই জুনের চিঠিগুলি কলকাতায় পৌঁছায় ২৭শে জুন (মৃত্যুর কদিন পরে)! কিন্তু ১৫ই-এর পর যে-সব চিঠি তিনি তাঁদের অবশ্যই লিখে থাকবেন,—সে-সব গেল কোথায়?

২৫। হাসপাতালেও তাঁর কাছে ডাক্তার থাকার ব্যবস্থাদির কি রকম অবহেলা করা হয়, তার জ্বলজ্বলে উদাহরণ একটা ব্যাপারেই পাওয়া যায়। কাশ্মীর সরকারের ইসতিহার ও মন্ত্রীর বিবৃতি সামান্য মনোযোগ দিয়ে পড়লেও দেখা যাবে, সেই ২২শে জুন রাত্রে তাঁর একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক করে রাখা হয় একজনকে—ডাক্তার জুট্‌সি (তাঁর যোগ্যতা কতোখানি জানা নেই; তবে বর্ণনায় পাওয়া যায়—হাসপাতালের হাউস্‌ সার্জেন)। তিনি সেই ২২শে জুন বেলা ১১টায় সেই সর্বপ্রথম শ্যামাপ্রসাদকে দেখেন। আর তা সত্ত্বেও একমাত্র সেই ডাক্তারই সেই সর্বনেশে শেষরাত্রে শ্যামাপ্রসাদের শেষ চিকিৎসা করে থাকবেন, কেননা যে দুজন ডাক্তার—ডাঃ আলি মোহাম্মদ ও ডাঃ রামনাথ পারহার—যাঁরা পূর্বে রোগীর রোগ পরীক্ষা ও নির্ণয় করেন বলে অনুমিত হয়, তাঁরা একজনও সেই সঙ্কটকালে বা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসময়েও উপস্থিত ছিলেন না।

শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তারের পরবর্তী ঘটনাবলীর এক বিবরণ ২০শে জুলাই Organiser পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (পরিঃ ১ ঠ)

(গ)

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাদি

অসুস্থ শ্যামাপ্রসাদের রোগ নির্ণয়, চিকিৎসার পদ্ধতি, রোগীর পথ্য ও সেবা-শুশ্রূষা, রোগের সতর্কতামূলক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা, আকস্মিক সঙ্কটে বিধিমত বিধানের আয়োজনাদি, রোগ নির্ধারণে যথাযথ পরীক্ষা ও রোগীকে নাড়াচাড়া করা,— এ সব বিষয়ে আর স্বতন্ত্র ভাবে বলা হোল না। এ-সম্পর্কে বহু নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ চিকিৎসকরা তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন, পরি ১ জ-তে তারই কয়েকটি উদ্ধৃত হোল। তাঁদের মতে, খুব কম করে বললেও এ-কথা বলতেই হয়, গভর্নমেণ্টের ও ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদের জাজ্বল্যমান অযত্ন ও চূড়ান্ত অবহেলা ঘটেছে।

(ঘ)

শ্যামাপ্রসাদের শেষ টেলিগ্রাম

২২শে জুন হাসপাতাল থেকে তাঁর বাড়িতে পাঠানো শ্যামাপ্রসাদের শেষ টেলিগ্রামটি গভর্নমেণ্ট যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে ইঙ্গিত করেছেন (পরি ১ গ) এই টেলিগ্রাম থেকেই দেখা যায় (১) শ্যামাপ্রসাদ

অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ করছিলেন এবং (২) তাঁর ভালভাবে ব্যবস্থা হয়েছিল। মন্ত্রী আরও জানান, গভর্নমেণ্ট সংবাদ পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বলেন, তিনি নিজেই পাঠাবেন এবং বেলা ২টায় সেটা দেন।

এর বিপরীতে এই বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচ্য ও লক্ষণীয়ঃ

১) শ্যামাপ্রসাদের টেলিগ্রামের ভাষা যে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন ও সন্তোষজনক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে,—এই উক্তির গুরুত্ব বিচারে মনে রাখা দরকার, তিনি তখন কি অবস্থায় ও কী পরিবেশে রয়েছেন। তাঁর তখন বন্দী অবস্থা। তিনি জানেন, তাঁর পাঠানো সংবাদ সরকারী অনুমোদনসাপেক্ষ, 'সেনসার্ড' হবে। সংবাদটি পাঠানো তাঁর বাড়িতে পরিজনবর্গের জন্যে—বিশেষতঃ তাঁর মায়ের কাছে,—আর তাঁরা সবাই রয়েছেন তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে। আরও এক কথা,—মনে রাখতে হবে, দুদিন আগে, ২০শে জুন, যে মুহূর্তে তাঁর প্লুরিসি হয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়, তখনি তিনি সুপারইনটেনডেণ্টকে বাড়িতে তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর অসুখের খবর দেবার জন্য বলেন (পরি ১ ছ১)। তিনি নিশ্চয় জানতেন, ২০শে বা ২১শেতেও সে খবর পাঠানো হয় নি। তাই আশ্চর্য কী—২২শে জুন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, হাসপাতালে তাঁর আসার খবরটা বাড়িতে পাঠানোয় তিনি ইচ্ছুক কিনা, তিনি তখন বলেন, আমি নিজেই তাঁদের জানাব।

২) টেলিগ্রামে লেখা দেখা যায়, গত তিন দিন হোল তিনি প্লুরিসিতে ভুগছেন। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয়, ঐ তিন দিন কোন খবর পাঠানো হয় নি, বা পাঠাতে পারা যায় নি।

৩) টেলিগ্রামে শ্যামাপ্রসাদের 'হার্ট অ্যাটাক্'-এর কোন উল্লেখ নেই, যদিও তার আগে সেই দিন দুপুরে সেই রোগই নির্ণয় হয়েছে!

৪) এ-সব ছাড়া, রোগের অবস্থা সম্পর্কে, অথবা প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থাদি যথাযথ হচ্ছে কিনা, তার বিচার রোগীর নিজের অভিমতের উপর কখনই নির্ভর করে না।

৫) এই টেলিগ্রাম সম্পর্কে আর এক বিচিত্র যুগপৎ মিল দেখা যায়, শ্যামাপ্রসাদের অসুস্থতার একমাত্র বার্তা (অবশ্য কাশ্মীর সরকার প্রদত্ত) সংবাদপত্রে যেটা প্রকাশিত হয় (তাও তাঁর মৃত্যুর পর) (পরি ১ ক), তার ভাষা আর শ্যামাপ্রসাদের সেই টেলিগ্রামের ভাষা প্রায় অনুরূপ এবং তাতেও তাঁর 'করোনারী অ্যাটাক'-এর কোন উল্লেখ নেই!

৬) পরিশেষে সর্বোপরি দ্রষ্টব্য, শ্যামাপ্রসাদের সেই টেলিগ্রামও, মন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, বেলা প্রায় দুটায় শ্যামাপ্রসাদ দেন, কিন্তু বেলা ৫টা অবধি সেটি শ্রীনগরেই পড়ে থাকে এবং তার পর পাঠানো হয়। ফলে, সেই টেলিগ্রাম কলকাতায় পৌঁছায় ২৩শে জুন,—শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার কিছুকাল পরে!

॥ তিন ॥

কলকাতার বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি

সেই সময়ে আমি কলকাতায়। তাই সংবাদ-প্রাপ্তির বিবরণ আমার জবানিতে লিখি।

২৩শে জুন, ১৯৫৩। ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জি রোডে আমাদের পৈতৃক বাড়ি।

সকালবেলা। প্রায় পৌনে ছ'টা। দোতলার ভেতরের দালানে টেলিফোন বেজে ওঠে। অপারেটর জানান, শ্রীনগর থেকে জাস্টিস্ মুখার্জি'র (বড়দাদা, রমাপ্রসাদ মুখার্জি'র) নামে ব্যক্তিগত ট্রাঙ্ককল।

কাশ্মীর শ্রীনগর থেকে ট্রাঙ্ক কল! মেজদা করছেন নিশ্চয়! বড়দা তখনি এসে ফোন ধরেন। বাড়ির যে যেখানে ছিলেন তাড়াতাড়ি এসে টেলিফোনের কাছে জড় হন্। মা একতলায় পুজোর ঘরে। তাঁকেও নিয়ে আসা হয় ওপরে। টেলিফোনের কাছে এসে তিনি উৎসুক হয়ে দাঁড়ান। মুখভরা ম্লান হাসি। ছেলে কতো দূরে সেই কাশ্মীরে, তাকে বন্দী করে রেখেছে। খুশিভরা মুখে মন্তব্য করেন, নিশ্চয় এইবার ছেড়ে দিয়েছে। ছাড়া পেতেই টেলিফোন করছে,—ও তো যেখানেই যখন যায়, টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলে। টেলিফোনটা দাও, বাবা, আমার হাতে, কথা বলি—এখনি হয়ত কেটে দেবে।

ওদিকে রিসিভার কানে বড়দা কথা বলছেন। কিন্তু, তাঁর মুখে হাসি নেই কেন? গম্ভীর। উদ্বিগ্ন। ইংরেজীতে বলে চলেছেন, হাঁ হাঁ—আমিই কথা বলছি, জাস্টিস মুখার্জি।—কে? কে? কী কী! কী বললেন?—কী!—What! What!… বড়দার মুখে এই ভাবে কাটা কাটা কথা। প্রচণ্ড উত্তেজনা!

সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছি বড়দার দিকে। আর মা কেবলই তাগাদা দিচ্ছেন, দাও বাবা, আমি একটু ভোতনের সঙ্গে কথা বলি। ওকে ছেড়ে দিয়েছে ত?

আমাদেরও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। হতবাক্ হয়ে শুনছি, এ-তরফে বড়দার উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, ওদিকের কথাগুলি কী, তখনও জানি না।

টেলিফোনে কথাবার্তা হঠাৎ শেষ। সদাশান্ত বড়দার সে কী চেহারা! স্তম্ভিত, অথচ উত্তেজিত। কিন্তু, কী কারণে? সবাই উদ্‌গ্রীব। মার মুখের সেই ম্লান হাসিটুকুও মুছে গেছে, বলেন, কী হোল বাবা, টেলিফোন ছেড়ে দিলে? আমাকে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে দিলে না?

বড়দা মাকে জানান, ওর শরীর ভাল নেই।—তুমি এখন নীচে চল মা, পুজো করোগে।

আমাকে ডাকেন, একপাশে নিয়ে যান্। কাঁপা গলায় বলেন, সব শেষ হয়ে গেছে যে! শুধু এই জানাল!

এইবার বর্ণনা দিই কীভাবে সেই খবর তাঁকে জানানো হয়।

বড়দা টেলিফোন ধরলে দিল্লীর অপারেটর কাশ্মীরের সঙ্গে লাইন যোগাযোগ করে দেন। কিন্তু কাশ্মীরের কথা বড়দা শুনতে পান্ না। তখন দিল্লীর অপারেটর মধ্যবর্তী হয়ে দু তরফের কথাবার্তা আদান-প্রদানে সাহায্য করেন। দিল্লীর অপারেটর শ্রীনগরকে যে কথাগুলি বলছিলেন বড়দা সরাসরি তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু শ্রীনগরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাই দিল্লীর অপারেটর শ্রীনগর থেকে যা যেমন শুনছিলেন, বড়দাকে সেই কথাগুলি তেমনি পুনরুল্লেখ করে জানাতে থাকেন: "শ্রীনগর আমাকে বলছে যে, শেখ আবদুল্লার কাছ থেকে একটা খবর আপনাকে জানানোর আছে, সংবাদটা এই, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মারা গেছেন এবং শেখ আবদুল্লা জানতে চান দেহ সৎকারের কি হবে?" ('Srinagar tells me that there is a message from Sheikh Abdullah to you and the message is that Dr. Syama Prasad Mookerjee is dead and Sheikh Abdullah wants to know what about the disposal of the body?")

বড়দা অকস্মাৎ এই খবরে স্তম্ভিত হয়ে যান। উত্তেজিত হয়ে অপারেটরকে বলেন, তিনি ব্যাপার কিছুই বুঝলেন না, প্রকৃতই কি ঘটেছে সব কিছু জানতে চান, আর এ-খবর দিচ্ছেনই বা কে?—দিল্লীর অপারেটর তখন শ্রীনগরকে জানান, 'জস্টিস্ মুখার্জি বিস্তারিত খবর জানতে চাইছেন' এবং ওদিকের উত্তর শুনে বড়দাকে জানান, 'শ্রীনগর বলছে তিন দিন আগে ডাঃ মুখার্জির প্লুরিসি হয় ও গতকাল তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাঁর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে ৩ ৪০শে তিনি মারা যান।' খবরটা অবিশ্বাস্য মনে করে বড়দা জোর করে জানতে চান খবরটা দিচ্ছে কে? তাঁর নাম কি? তাতে আবার শ্রীনগরের সঙ্গে কথা বলে দিল্লী অপারেটর জানান, কাশ্মীরের ডেপুটি হোম মিনিস্টার মিঃ ধর টেলিফোন করছেন। বড়দাও তখনি আবার জানান, কলকাতায় অবশ্যই পাঠাতে হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপার এখনি জানতে চাই। অপারেটর আবার শ্রীনগরের সঙ্গে কথা বলে বড়দাকে জানান, কাশ্মীর সরকার কর্তৃপক্ষ আধঘণ্টা পরে আবার টেলিফোন করবেন বলছেন।

এই ভাবেই শ্যামাপ্রসাদের জননী ও পরিবারবর্গকে সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ জানানো! আর, পণ্ডিত নেহেরু (বিদেশ যাত্রা থেকে ফিরে এসে) শ্রীঅতুল্য ঘোষকে চিঠিতে এই ঘটনার বর্ণনা দেন (পরি ১ এ)।

নয়াদিল্লী

জুলাই ২, ১৯৫৩

"জস্টিস মুখার্জিকে টেলিফোনে যে ভাবে সংবাদটা জানানো হয়, আপনি তার উল্লেখ করেছেন। আসলে টেলিফোনে যোগাযোগ করতেই অনেকখানি সময় চলে যায়। যখন সেটা সম্ভব হল, তখন আবার ভাল শুনতে না পাওয়ার জন্য সরাসরি কথা বলা সম্ভব হল না। মন্ত্রী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর, যিনি শ্রীনগর থেকে টেলিফোন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত দিল্লীর টেলিফোন কর্মীকে কলকাতার কর্মীকে খবরটি দিতে বলেন, সেই কর্মীটি আবার জস্টিস মুখার্জির কাছে সংবাদটির পুনরুক্তি করে। আপনি

সহজেই ধারণা করতে পারবেন, দুইবার 'রিলে' করে পাঠানোর ফলে মূল সংবাদের কি অবস্থা ঘটেছে। এটির বিকৃতি ঘটেছে এবং সংক্ষিপ্ততম আকারে সংবাদটি দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদ ধরের কথা হয়েছে। তিনি একটি দীর্ঘ বার্তা পাঠিয়েছিলেন বলেছেন, স্বাভাবিক কারণেই তা বিকৃত ও খণ্ডিত ভাবে পৌঁছেছে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে জাস্টিস মুখার্জিকে যদি এই সমস্ত ব্যাপারটি জানানো হয় তাহলে তিনি বুঝবেন যে আদৌ কোন অসৌজন্য করার কথা মনে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রীরা শ্যামাবাবুর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা তাঁকে শীঘ্রই মুক্তি দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন।

ভবদীয়

জওহরলাল নেহরু

(পরি ২ এ)

পণ্ডিত নেহরুর এই কৈফিয়ত ভিত্তিহীন।

এই সূত্রে আরও লক্ষণীয়, ২৪শে জুন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় যে, "ভারত সরকার কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে flash massage-এ এই মৃত্যুসংবাদ পান। কেন্দ্রীয় হোম সেক্রেটারী এ. ভি. পাই কাশ্মীর সরকারকে নির্দেশ দেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে যেন তাঁরা ডাঃ মুখার্জির পরিজনবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।"

অতএব, স্পষ্টই দেখা যায়, কাশ্মীর সরকার প্রথমে ভারত গভর্নমেণ্টকে মৃত্যু-সংবাদ জানান এবং মিঃ পাই-এর নির্দেশেই তারপর শ্যামাপ্রসাদের পরিজনদের খবরটা দেন,—তাও তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে জানবার জন্যে!

এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ কালবিলম্ব না করে শ্যামাপ্রসাদের আত্মীয়দের জানানোর আবশ্যকতা কাশ্মীর সরকারের একবারও মনে হয় নি। টেলিফোনে যোগাযোগের বাধা-বিঘ্নের কাহিনীর মধ্যে এর কোনই কৈফিয়ত মেলে না।

তাছাড়া, দিল্লীর অপারেটর কাশ্মীর থেকে খবর জেনে কলকাতার অপারেটরকে জানান, এবং কলকাতার অপারেটর তারপর জাস্টিস্ মুখার্জিকে বলেন, এই কাহিনীও অসত্য। দিল্লীর অপারেটরের সঙ্গেই জাস্টিস্ মুখার্জির সরাসরি যোগ ছিল। কথাবার্তাও চলছিল। মাঝে মাঝে দিল্লীর অপারেটর হিন্দীতেও কথা বলছিলেন,—কলকাতার অপারেটর এর মধ্যে ছিলেনই না!

সেই ২৩শে জুনের পরবর্তী ঘটনাবলিও সংক্ষেপে লিখি। বেলা প্রায় ১১টায় কাশ্মীর সরকামের হোম মিনিস্টার বক্সী গোলাম মোহাম্মদ টেলিফোন করে জানান, শ্রীনগর থেকে বেলা সাড়ে দশটায় ডাঃ মুখার্জির শবদেহ নিয়ে প্লেন রওনা হয়েছে এবং বেলা তিনটে নাগাদ কলকাতায় পৌঁছুবে আশা করেন। কিন্তু সেই প্লেন দমদমে পৌঁছায় রাত ন'টায়! শ্রীত্রিবেদী (কৌঁসুলী) সেই শবদেহের সঙ্গে আসছিলেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে এই অত্যধিক বিলম্বের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন (পরি ১ ছ২)। অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যাবে, এই ঘটনার পিছনে ভারত সরকারের

কর্তৃপক্ষের কতোখানি হাত ছিল এবং শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ যাতে রাত্রির আগে কলকাতায় না পৌঁছায়—সেই উদ্দেশ্যে, ইচ্ছা করেই অতোখানি বিলম্ব ঘটান হয়েছিল কিনা।

॥ চার ॥

শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি

শ্যামাপ্রসাদের চিঠিপত্রে প্রকাশ পায়, বন্দী-জীবনে তিনি বই পড়ে ও অন্যান্য কিছু লেখা লিখে সময় কাটাচ্ছেন, ডায়েরীও রাখছেন। সহ-বন্দীরাও তাই বলেন। হাসপাতালে যাবার সময় সেই ডায়েরী, এবং হয়ত লেখা কাগজগুলিও, তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সঙ্গে, সেই ডায়েরী বা লেখাগুলি ফেরত আসেনি। কাশ্মীর সরকারের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েও সেগুলি পাওয়া যায় নি। তাঁরা সেসব রেখে দিয়েছেন বলে অস্বীকার করেন। এই সম্পর্কে যে পত্রবিনিয়োগ হয় পরি ১ট-তে তা দেওয়া হোল।

কাশ্মীর সরকারের কর্তৃপক্ষ ডায়েরীটি অপসারণ করে চেপে রেখেছেন,—এই সন্দেহ জাগার যথেষ্ট কারণ থাকাই স্বাভাবিক। ডায়েরীটি পেলে শ্যামাপ্রসাদের সেই বন্দীজীবনের আরও কিছু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পেতো।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

ক

অমৃতবাজার পত্রিকা। তাং ২৩শে জুন, ১৯৫৩ (নিজস্ব সংবাদদাতা)

শ্রীনগর, ২২শে জুন। এখানে বর্তমানে বন্দী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হলে একটি সরকারী নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সরকারী চিকিৎসকরা এখন তাঁর দেখাশুনা করছেন।

একজন সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন, ডঃ মুখার্জির অবস্থা গুরুতর কিছু নয় এবং তাঁর জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

খ

কাশ্মীর সরকারের বিবৃতি। ২৩. ৬. ৫৩
চিকিৎসকদের রিপোর্ট

শ্রীনগর, জুন ২৩—জম্মু কাশ্মীর সরকার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জানা যায়, ডাঃ আলি মোহাম্মদ, এম. আর. সি. পি. (এডিন) এবং ডাঃ রামনাথ পারহার এম. ডি. (এডিন) —যে দুজন চিকিৎসক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা নিম্নলিখিত রিপোর্টটি দাখিল করেছেন।

১৯৫৩, ২২শে জুন সকালবেলা ডঃ মুখার্জি হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন বুকের কাছে দুই মিনিট ধরে যন্ত্রণা অনুভব করেন। যন্ত্রণার সঙ্গে ঘাম ও সাধারণ দুর্বলতা অনুভূত হয়। ব্লাডপ্রেসার নেমে যায়। রোগী বুকের মধ্যে সব সময়েই ভারী চাপ ও অবসাদ অনুভব করছিলেন। সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ আলি মোহাম্মদ ও জেলের মেডিক্যাল অফিসার সকাল ৭টার সময়ে নিশাতবাগের অন্তরীণ ক্যাম্পে তাঁকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা সেখানেই তাঁর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়ায় ডঃ মুখার্জির অবস্থার উন্নতি হয় ও তাঁকে সরকারী হাসপাতালের নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেখানে তিনি দুপুর ১২টায় ভর্তি হন। রক্ত, মূত্র এবং ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাফিক পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ডঃ মুখার্জী করোনারী জাতীয় হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। অ্যাণ্টি-বায়োটিকও দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনমত অক্সিজেন দেবারও ব্যবস্থা হয়। তাঁর অবস্থার উন্নতি হয় ও তাঁকে প্রফুল্ল দেখায়। ডাঃ আলি মোহাম্মদ এম. আর. সি. পি. (এডিন) এবং ডাঃ রামনাথ পারহার, এম. ডি. (এডিন) এই দুইজন চিকিৎসক তাঁকে দেখছিলেন।

রাত ৭-৩০ মিনিটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর কৌঁসুলী শ্রীত্রিবেদী তাঁকে দেখতে

আসেন। ডঃ মুখার্জির মৌখিক নির্দেশে শ্রীত্রিবেদী কিছু লিখে নেন এবং ডঃ মুখার্জি কয়েকটি চেক সই করেন।

রাত ৯টায় তাঁর সাধারণ শারীরিক অবস্থা মোটের ওপর ভালই দেখা যায়। তবে ব্লাডপ্রেসার নেমে থাকা এবং নাড়ীর দ্রুতগতি পরিলক্ষিত হয়।

রাত ১১টায় রোগীর অস্থিরতা দেখা দেওয়ায়, উপশমের জন্যে তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। ব্লাডপ্রেসার নেমে যায় ১০০/৮০তে। ইণ্ট্রাভেনাস গ্লুকোজের সঙ্গে অ্যামিনোফিলিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

রাত ১টায় ডঃ মুখার্জি বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং অস্থিরতা দেখা যায়। নাড়ীর গতি তখন ক্ষীণ ও ব্লাডপ্রেসার ৯০/৭০। অক্সিজেন দেওয়া হতে থাকে। যন্ত্রণা কমানোর জন্য ১ সিসি পেথিডিন দেওয়া হয়।

রাত ২টা ৩০ মিনিটে রোগীর অবস্থা সেই একই রকম থাকে। শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ীর গতি প্রায় বোঝা যায় না। ইণ্ট্রাভেনাস কোরামিন ও অ্যামিনোফিলিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

রাত ৩টায় অবস্থা সেই একই রকম। নাড়ীর গতি সামান্য বোঝা যায়। অক্সিজেন চলতে থাকে। ইণ্ট্রাভেনাস কোরামিন ইন্‌জেকশন আবার দেওয়া হয়।

৩টা ২০ মিনিটে নাড়ীর গতি আবার প্রায় বোঝা যায় না। শ্বাসক্রিয়া অতি নিস্তেজ ও অনিয়মিত দেখা যায়। অক্সিজেন চলতে থাকে।

৩টা ৪০ মিনিটে শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ী বন্ধ হয়।

গ

কাশ্মীরের স্বাস্থ্য ও কারামন্ত্রী পণ্ডিত এম্ এল্ সরফ্-এর বিবৃতি, তাং ১. ৭. ৫৩

যে পরিস্থিতিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বেদনান্তিক তিরোধান ঘটে তা আগেই ২৩শে জুন তারিখে প্রদত্ত জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের প্রেস বিবৃতিতে ব্যক্ত হয়েছে। ঐ বিবৃতিতে যে মেডিক্যাল রিপোর্ট ছিল, তাতে অসুস্থতা ও বিভিন্ন অবস্থাতে প্রদত্ত চিকিৎসার কিছু বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

আমি লক্ষ্য করছি, আমাদের স্বদেশবাসীর একাংশের মনে এই জাতীয়-নেতার দুঃখজনক অকাল মৃত্যুর সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি জানার স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। আমি তাঁদের উদ্বেগ উপলব্ধি করি। ডঃ মুখার্জীর মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য আমরা কোন প্রচেষ্টাই বাদ দিই নি। আমাদের সেই সব প্রচেষ্টার অসাফল্য আমাদের কাছে অন্যান্য স্বদেশবাসীর মত সমান বেদনাবহ।

১৯৫৩র ১৫ই মে ডঃ মুখার্জী শ্রীগুরু বৈদ ও শ্রীটেকচাঁদ শর্মার সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। তাঁরা পরের দিন শ্রীনগর পৌঁছান এবং নিশাতবাগের ওপরে হীদার ভিলা নামক একটি বেসরকারী বাংলোয় তাঁদের রাখা হয়।

হাঁদার ভিলা থেকে ডাল লেক ও তার পারিপার্শ্বিক সুন্দর দেখা যায়। ওই বাংলোর ভেতরে একটি বাগান ও তৎসংলগ্ন একটি ফলের বাগিচা আছে। বাংলোটি যথোপযুক্ত সজ্জিত ও আধুনিক স্যানিটারী ব্যবস্থা সমন্বিত।

ডাঃ মুখার্জী ও তাঁর সঙ্গীদের সুবিধার জন্য বাংলোর নিকটে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সব ব্যবস্থা ডঃ মুখার্জী ও তাঁর সঙ্গীদের কতখানি সন্তোষের কারণ হয়েছিল, তা তাঁদের পত্রের নিম্নলিখিত অংশগুলি থেকে বোঝা যাবে।

১৯৫৩'র ২৫শে মে ডঃ মুখার্জী তাঁর বৌদিকে লিখছেন ঃ

"পাহাড়ের নীচে খানিকটা জমিতে বাগান ও বাড়ী তৈরী হয়েছে। আবার এই বাগানের নীচে রাস্তা। তারপর আবার পাহাড়ে জমি। তার নীচে আবার রাস্তা। তার নীচে দাল লেক—যার জল আমি বাগানে দাঁড়িয়ে বা ঘরে বসে সারাক্ষণ দেখতে পাই। ফল ও ফুলের গাছে বাগান ভর্তি। স্ট্রবেরী ও চেরী এই দুই ফল এখন গাছে হয়ে আছে।...ঝরণার জল বাগানের মধ্য দিয়ে যায়...রোজ জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসেন বিকালের বাজার নিয়ে, চিঠি ও কাগজ নিয়ে, দুধ ভাল প্যাওয়া যায়। সকালে খাই। মাখন খুব ভাল ও টাটকা।...বই পড়ে ও ভেবে ও লিখে সময় কাটে।"

১৯৫৩'র ৪ঠা জুন তাঁর বৌদিকে আর একটি চিঠিতে ডঃ মুখার্জী লিখছেন ঃ

৪টা জুন, ১৯৫৩

"জেলের দুজন লোক রাঁধে, কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বিছানা করে, খাবার দেয়। খুব ভাল লোক দুজনেই। এত সেবা করে ও খোঁজ নেয় আমি তো অবাক হই।"

১৯৫৩'র ৪ঠা জুন লণ্ডনে এস. সি. ব্যানার্জি'কে লিখছেন—"...কর্তৃপক্ষ আমার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব যত্ন নিচ্ছেন। আমার শরীর মোটামুটি ভাল আছে, কেবল ডান পায়ে বিশ্রী যন্ত্রণায়, বোধহয় ঠাণ্ডার জন্যই, এক সপ্তাহ যাবৎ ভুগলাম।"

১৯৫৩'র ২রা জুন শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি শ্রীনগরে ডঃ মুখার্জি'কে লিখছেন ঃ "কাশ্মীর সরকার আপনার সঙ্গে যথাযথ আচরণ করছে জেনে খুশী হোলাম।"

ডঃ মুখার্জি'র প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রী টেকচাঁদ শর্মা, যিনি তাঁর সঙ্গেই বন্দী ছিলেন, দেরাদুনের শ্রীমহেশচন্দ্র শর্মাকে লিখছেন ঃ "এখানে সব কিছু ঠিক আছে। আমরা সকলে ভাল আছি...আমাদের কোন রকম অসুবিধা নেই।"

আবার ১৫ তারিখে শ্রীশর্মা লিখছেন—"এখানে আমরা সব ভাল আছি। এবং শান্তিতে সময় কাটাচ্ছি।...খাবার ভাল এবং থাকার ব্যবস্থা আরামদায়ক।...কোন জিনিস চাইলেই পাই, যেন 'আলাদীনের প্রদীপ' আমাদের হাতে। খেয়ে, পড়ে, লিখে এবং কথাবার্তায় সময় কাটে। প্রতিদিন আমরা 'হিন্দুস্থান টাইমস', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', 'তেজ' পাই, দিল্লী থেকে বিমান-ডাকে আসে, তাতেই আমরা সব খবর পাই।

১৯৫৩র ৫ই জুন শ্রীটেকচাঁদ শর্মা দিল্লীর ভুপাল সিং গুপ্তকে লিখছেন—"...এবং মানসিক এই অবস্থায় আমরা যেন একটা সুন্দর প্রলম্ব পিকনিক উপভোগ করছি।

এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের সৌন্দর্যশোভা উপভোগ এক চমকপ্রদ আনন্দময় অনুভূতি।

যাই হোক আমরা সবাই আনন্দে ও সুস্থ শরীরে আছি। ডাক্তার সাহেব আজ সামান্য অসুস্থ রয়েছেন। তাঁর ডান পায়ে একটু ব্যথা হয়েছে। তবে সেজন্য উদ্বেগের কোন কারণ দেখি না।"

ডঃ মুখার্জি যেদিন আসেন সেদিন সরকারী হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আলি মোহাম্মদ এম. আর. সি. পি. (এডিন) তাঁকে পরীক্ষা করেন।

ডঃ মুখার্জি তাঁর খাবার নিজের পছন্দমত করাতেন। জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রী শ্রীকণ্ঠ দীর্ঘদিনের একজন অভিজ্ঞ অফিসার, ডঃ মুখার্জির ক্যাম্পে সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যাদি দেখার জন্য ভার পান এবং এজন্যে একটি জীপগাড়ির বিশেষ বন্দোবস্ত হয়।

ডঃ মুখার্জী এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতিদিন সংবাদপত্র, বই এবং স্টেশনারী জিনিসপত্র যোগান দেওয়া হত এবং ক্যাম্প থেকে প্রতিদিন ডাক নেওয়া-দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

তাঁরা বাগানের মধ্যে স্বাধীনভাবে বেড়াতেন। পরে সর্দার হুকুম সিং, এম. পি. এবং কারা বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল ও স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর কর্নেল রামনাথ চোপরার মারফত তাঁর আগ্রহের কথা জেনে স্থির হয় যে, ডঃ মুখার্জী ইচ্ছা করলে বাগানের এলাকার বাইরেও আরও লম্বা ঘোরাফেরা করতে পারবেন।

১৯৫৩ মে মাসের ১৫ তারিখে কর্নেল চোপরা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত রিপোর্টটি পাঠান ঃ—

"যে ছোট ভাড়াবাড়িতে বর্তমানে সাবজেল করা হয়েছে, শ্রীনগরের জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে আমি সেটি পরিদর্শন করি। চমৎকার বহির্দৃশ্য এবং পরিবেশ সমন্বিত একটি বাগানে বাড়িটি অবস্থিত। বন্দীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাড়িটিতে পর্যাপ্ত ফার্নিচার আছে। যে তিনজন বন্দী বর্তমানে বাড়িটিতে আছেন তাঁদের পক্ষে গৃহের পরিসর যথেষ্ট। জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট তাঁদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা করেছেন তা অত্যুত্তম এবং তার মান এর থেকে ভাল আর কিছু হয় না।

বন্দীদের স্বাস্থ্য ভাল আছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর শরীর ভাল আছে এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ঃ

১। তিনি যেন বাগানের বাইরে দীর্ঘতর ভ্রমণ করতে পারেন।

২। আরও পত্রিকা ও বই পড়বার জন্যে তাঁকে দেওয়া হোক।

৩। তিনি তাঁর কন্যার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ফুসফুসের যক্ষ্মা থেকে কন্যাটি আরোগ্যের পথে। ইনি সুইজারল্যান্ড থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরেছেন এবং এখন দিল্লীতে আছেন। দিল্লীর গরম আবহাওয়া তাঁর শরীরের পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়।

ডঃ মুখার্জী বলেন, তাঁকে কতদিন এখানে (কাশ্মীরে) থাকতে হবে তিনি জানেন না। তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তাঁর কন্যা যেন দিল্লী ছেড়ে কাশ্মীরে চলে আসেন, অবশ্য

যদি ফুসফুসের চিকিৎসার জন্য মাসে দ্বার করে বাতাস ভরার ব্যবস্থা এখানে করা যায়। আমি বলেছি, এখানে সে বিষয়ে কোন অসুবিধাই হবে না এবং আমাদের যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ তাঁর দেখাশোনা করতে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

পত্রিকা এবং বইয়ের জন্য অনুরোধ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হয়েছিল। এছাড়া বন্দীরা যাতে তাঁদের বন্ধুদের কাছ থেকেও বই ও পত্রিকা পান তার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯শে মে ডঃ মুখার্জী তাঁর ডান পায়ের ডিমে যন্ত্রণার অনুযোগ জানান। ব্যথার সঙ্গে অল্প ফোলাও ছিল ও শিরাগুলি (ভেরিকোজ শিরা) অস্বাভাবিক রকম স্ফীত ও প্রলম্বিত দেখা যাচ্ছিল। বিশ্রাম ও চিকিৎসার ফলে দুদিনে যন্ত্রণা চলে যায়, কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আরও প্রায় এক সপ্তাহ চালানো হয়। ৫ই জুন তাঁর আবার ডান পায়ের ডিমে টনটনে সামান্য যন্ত্রণা হতে থাকে, জ্বর বা ফোলা ছিল না। সেইদিন স্টেট হাসপাতালের হাউস সার্জন ডাঃ প্রেমনাথ ধর-এর সঙ্গে ডাঃ আলি মোহাম্মদ তাঁকে দেখেন। তাঁকে Osteoarthritis ও সম্ভবত গেঁটেবাতের পূর্ব ইতিহাস বিবেচনায় সেইমত চিকিৎসা করা হয়। দুদিনে তিনি সেরে ওঠেন।

৯ই জুন কর্নেল স্যার রামনাথ চোপরা আবার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাঠান ঃ

"আজ আমি ডঃ মুখার্জীকে বেশ প্রফুল্ল ও সুস্থ দেখলাম। যদিও তাঁর পায়ে সামান্য যন্ত্রণা এখনও আছে। তাঁর দেখাশুনা ভালই হচ্ছে। খাবারদাবারের ব্যবস্থা সবদিক দিয়েই সন্তোষজনক। তাঁকে প্রচুর পড়বার বই-পত্র, কাগজ দেওয়া হয় যাতে তাঁর সময় কাটে।"

৯ই জুন থেকে ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুকাল ২৩শে জুন ভোর ৩-৪০ পর্যন্ত সময়ের যে রিপোর্ট কর্নেল স্যার রামনাথ চোপরা দেন তাতে জানা যায় ঃ

১৯শে জুন পর্যন্ত তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। জেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট পণ্ডিত শ্রী শ্রীকণ্ঠ ঐদিন সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি কোন অসুস্থতার কথা অনুযোগ করেননি।

১৯৫৩, ১৬ই জুন সর্দার হুকুম সিং এম. পি. ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখেন বলে প্রকাশ্যেই বলেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সর্দার হুকুম সিং ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন যাতে জম্মুতে প্রজাপরিষদের আন্দোলন বন্ধের কোন সমাধান-সূত্র পাওয়া যায়। পরে তিনি শেখ সায়েবের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে জানান—ডঃ মুখার্জীর পরামর্শ হচ্ছে এ বিষয়ে পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার সঙ্গে আলোচনায় বসা হোক। সেইমত ১৯৫৩র ১৯শে জুন পণ্ডিত ডোগরাকে শ্রীনগরে আনা হয় এবং ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে রাখা হয়।

২০শে জেল কর্তৃপক্ষ টেলিফোনে সংবাদ পান ডঃ মুখার্জী অসুস্থ হয়েছেন। জেল ডিসপেনসারির ভারপ্রাপ্ত অফিসার পণ্ডিত অমরনাথ রায়না এবং ডাঃ আলি মোহাম্মদ অবিলম্বে তাঁকে দেখতে যান। তিনি বুকের বাঁদিকের নীচে সামান্য যন্ত্রণার

কথা বলেন। দেহের তাপ ছিল ৯৯·২°, পাল্‌স্‌ ৯০, প্লুরিসিতে যে frintion of heat দেখা যায়, তা বাঁদিকের ইনফ্রাক্সিল্যারি অঞ্চলে অনুভূত হচ্ছিল। রোগ নির্ণীত হয়—ড্রাই প্লুরিসি। ১৯৩৭ সালে ডঃ মুখার্জীর একবার ড্রাই প্লুরিসি হয়েছিল, পরে ১৯৪৪ সালে পুনরাক্রমণ হয়। তাঁর চিকিৎসা ঠিক ঠিক শুরু হয়, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। এতে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় ও তিনি পরে অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। তবু সাবধানতা হিসেবে তাঁকে চিকিৎসাধীনে রাখা হয়।

২২ শ জুন সকালবেলা জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডঃ মুখার্জীর জেল-সঙ্গী গুরুদত্ত বৈদের কাছ থেকে টেলিফোনে একটি খবর পান যে ডঃ মুখার্জীর বুকে ব্যথা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ঘামও হচ্ছে। ডাঃ আলি মোহাম্মদ সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিয়ে সকাল ৭টায় সেখানে পেঁছে যান। জানা যায় যে 'হার্টে'র কাছে ২ মিনিট ধরে ব্যথা হচ্ছিল। তখন ঘামও হচ্ছিল এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয়েছিল। (ডাক্তার যখন যান) তখন তিনি পূর্ণ সচেতন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর তখনই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় ও তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। স্থির হয় তাঁকে সরকারী হাসপাতালের নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হবে। ডাঃ আলি মোহাম্মদ সকাল ৯টা অবধি তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং যখন তিনি দেখলেন রোগীর অবস্থা আগের থেকে ভাল হয়েছে, তখন তিনি নার্সিং হোমে ডঃ মুখার্জীর থাকার ব্যবস্থার জন্য তাড়াতাড়ি হাসপাতালে আসেন। জেল ডিস্‌পেনসারির মেডিক্যাল অফিসারকে ডঃ মুখার্জীর অবস্থা নজর রাখার জন্য তাঁর কাছে রেখে আসা হয়।

দুপুরবেলা ডঃ মুখার্জীকে একটি আরামপ্রদ মোটরে করে সেই ভিলা থেকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের সদর ফটক থেকে তাঁকে একটি চাকাওলা চেয়ারে বসিয়ে লিফট পর্যন্ত এনে সেই চাকাওলা চেয়ারে করেই নার্সিং হোমে তাঁর শয্যায় নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন সরকার প্রদত্ত মেডিক্যাল রিপোর্টে আগেই জানানো হয়েছে যে নার্সিং হোমে ডাঃ আলি মোহাম্মদ, এম. আর. সি. পি. (এডিন) এবং ডাঃ রামনাথ পারহার, এম. ডি. (এডিন) এই দুইজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করেন। ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাম এবং করোনারী হার্ট অ্যাটাকের সবরকম পরীক্ষাদি করা হয় এবং সাময়িকভাবে করোনারী হার্ট-অ্যাটাক সাব্যস্ত হয়। রোগী বলেন, ১৯৩৭ সালে একবার এবং তার কয়েক বছর পরে আরও একবার এই রকম রোগের আক্রমণ তাঁর হয়েছিল। বেদনানাশক, অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যামিনোফিলিন ওষুধসহ তাঁর যথোপযুক্ত চিকিৎসা করা হয়। রোগীর অবস্থা মোটামুটি ভাল। তাঁকে সর্বক্ষণ মেডিক্যাল তত্ত্বাবধান ও শুশ্রূষার মধ্যে রাখা হয়েছিল।

ডঃ মুখার্জীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর আত্মীয়স্বজনকে নার্সিংহোমে আসার খবর দিতে হবে কিনা, তিনি বলেন, তিনি নিজেই তাদের জানাবেন। ২২শে জুন প্রায় দুপুর ২টায় তিনি নিম্নলিখিত টেলিগ্রামগুলি পাঠান।

১। To Justice Mookerjee, 77 Asutosh Mookerjee Road,

Calcutta. "Sudden dry pleurisy three days ago. Better to-day. Fever pain much less. Removed hospital. Satisfactory medical arrangements made. No anxiety. Specially tell mother—Syama Prasad.

২। To Anutosh Mookerjee, Somamoy Boring Road, Patna. "Sudden dry pleurisy three days ago. Much better to-day. Removed hospital. Satisfactory medical arrangements. No anxiety— Bapi

৩। To Mrs. Banerjee, 30 Altamont Road, Bombay, "Sudden dry pleurisy three days ago. Pain fever less to-day. Removed to hospital. No anxiety. Inform Hasu Bowma and see they do not worry—Syama Prasad.

রাত ৭-৩০ মিনিটে শ্রীনগরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডঃ মুখার্জীর কৌসুলী শ্রীত্রিবেদী তাঁকে দেখতে আসেন। হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ গিরিধারীলাল কৌল তখন উপস্থিত ছিলেন। ডঃ মুখার্জীকে সে সময়ে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং তাঁর কৌসুলীকে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে নোট দেবার সময়ে ও চেক সই করার সময়ে তিনি উপস্থিত জনদের সঙ্গে পরিহাসও করছিলেন।

রাত ৯টার সময়ে তাঁর শরীরের সাধারণ অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। কেবল ব্লাডপ্রেসার নেমে গিয়েছিল, ১০২/৮০, ডাঃ আলি মোহাম্মদের রেকর্ড অনুযায়ী।

রাত ১১টায় রোগী অস্থিরতা অনুভব করেন এবং তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। হাউস সার্জন ডাঃ জগন্নাথ জুট্সী তাঁকে তখন দেখছিলেন। তিনি ব্লাডপ্রেসার দেখেন, ১০০/৮০। অ্যামিনোফিলিনসহ ইনট্রাভেনাস গ্লুকোজ দেওয়া হয়।

পরে, হাউস সার্জন ডাঃ জে. এন. জুট্সীর রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। তবে রাত ১টার সময়ে ডঃ মুখার্জীর অবস্থার আবার অবনতি ঘটে। এবং পরে তাঁর আর উন্নতি হয় নি। ৩-৪০ মিনিটে হঠাৎই অন্তিমক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং কয়েক মিনিট পরে ভারতীয় সৈনিক হাসপাতালের কর্ণেল মৈত্র ও মেজর মেহতা এবং ডাঃ চোপরা নার্সিং হোমে এসে পৌঁছান। তাঁদের সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, সর্দার হুকুম সিং ১৬ই জুন ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখেছিলেন। তাছাড়া কর্নেল রামনাথ চোপরা তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, "১৯ পর্যন্ত ডঃ মুখার্জী সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।" অতএব স্পষ্ট দেখা যায় যে ১৯ পর্যন্ত ডঃ মুখার্জীর স্বাস্থ্য সন্তোষজনক ছিল।

ঘটনা যা ঘটেছে তা আমি সাধারণের গোচরে এনেছি। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যে, ভারতের আর সব জায়গার মতো কাশ্মীরেও তা অপ্রত্যাশিত ছিল।

এই সর্বজনীন দুঃখের দিনে অভিযোগ করার কিছু নেই, কারণ সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এক মহান মানুষ চিরবিদায় নিয়েছেন।

ঘ

মৌলানা আজাদের ২৩. ৬. ৫৩ তারিখে প্রদত্ত বিবৃতি

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুসংবাদ শুনে এক বিবৃতিতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "ডঃ মুখার্জির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক মতবিরোধ যাই থাকুক না কেন, তাঁর মৃত্যুতে তা সব মুছে গিয়েছে। আজ আমাদের বিশেষভাবে স্মরণে আসে তাঁর মহান গুণগুলির কথা এবং সেই সঙ্গে দেশের জন্যে তিনি যে সব কাজ করে গেছেন।"

মৌলানা আজাদ বলেন: শ্রীনগরে এক নার্সিং হোমে আজ ভোরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পরলোকগমন করেছেন এ সংবাদ শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি। তিন দিন আগে তাঁর ঠাণ্ডা লাগে আর সেটাই পরে ড্রাই প্লুরিসিতে পরিণত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অবিলম্বে তাঁকে এক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁর শ্রীনগরস্থ বন্ধু-বান্ধবেরা যাতে তাঁর রোগশয্যার পাশে উপস্থিত থাকতে পারেন সে ব্যবস্থাও করেন। তাঁর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে এবং রাত একটা নাগাদ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। রাত ৩-৩০ মিনিটে তিনি পরলোকগমন করেন। ভারত সরকার এক বিশেষ বিমানে তাঁর নশ্বর দেহ কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন।

মৌলানা আজাদ বলেন, তিনি খবর পেয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ডঃ মুখার্জীর মৃত্যু সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ দিয়ে এক সরকারী বিবৃতি দিচ্ছেন।

মৌলানা আজাদ আরও বলেন, "আজ আমাদের ডঃ মুখার্জীর মহান গুণাবলী এবং তাঁর দেশসেবার কথাই বড় বেশি করে মনে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় ১৯৩৫ সাল থেকে। সেই অবধি আমরা বন্ধু এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাজার মতবিরোধ সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।"

অমৃতবাজার পত্রিকা
২৪শে জুন, ১৯৫৩

ঙ

শেখ আবদুল্লার বক্তৃতা (২৬. ৬. ৫৩)

শ্রীনগর, ২৬শে জুন—গতকাল এখানে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তাঁর মৃত্যু আরও দুঃখজনক কারণ শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতে ফিরে আসার পর ডঃ মুখার্জীকে অবিলম্বে দিল্লীতে পাঠাবার কথাই সরকার চিন্তা করছিলেন।

বর্তমানে কাশ্মীর উপত্যকায় ভ্রমণরত দিল্লীর শিক্ষকদের এক শুভেচ্ছা মিশনের সদস্যদের কাছে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী কথাগুলি বলেন।

এই রাজ্যে পারমিট সংক্রান্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার জন্য যে পরিস্থিতিতে জনসংঘ নেতা ডঃ মুখার্জীকে আটক ও গ্রেপ্তার করা হয় তার উল্লেখ করে শেখ আবদুল্লা বলেন, "যদিও পারমিট ব্যবস্থার দরুন আমাদের কিছু অসুবিধায় পড়তে হয় তবু ভারতের জাতীয় সুরক্ষার জন্য যা করণীয় তা মেনে নিতে হবে, কারণ প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে দেশের প্রতিরক্ষার দাবী সর্বোপরি।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে ডক্টর মুখার্জীকে আইনত আটক করে রাখা ছিল ঠিকই কিন্তু "বিশেষ করে তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সরকার তাঁকে কার্যত সবরকম সুযোগ সুবিধাই দিয়েছিলেন।"

শেখ আবদুল্লা বলেন, "ডঃ মুখার্জী অনিচ্ছা সহকারেই নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর ধারণা ছিল অসুখটা গুরুতর কিছু নয়।" —ইউ-পি-আই

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৭শে জুন, ১৯৫৩

চ

শ্রীজওহরলাল নেহরুর বিবৃতি (উদ্ধৃত অংশবিশেষ)

"জেনেভা থেকে বিমানযোগে কায়রো রওনা হবার মুখে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুসংবাদ পাই। খবরটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল, তাই একেবারে স্তম্ভিতই হলাম। মাসখানেক আগে অল্প সময়ের জন্যে শ্রীনগরে গিয়েছিলাম। তখন ডক্টর মুখার্জীর স্বাস্থ্য কেমন আছে এবং তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর করেছিলাম। তখন আমায় বলা হয়েছিল ডক্টর মুখার্জী বেশ ভালই আছেন এবং তাঁকে যেখানে রাখা হয়েছিল সে জায়গাটিও আমায় দেখানো হয়। ডাল হ্রদের ধারে এবং বিখ্যাত মোগল উদ্যান নিশাত বাগের পাশেই এক মনোরম ভিলাতে তাঁকে রাখা হয়েছিল। এই ভিলার মধ্যে ছিল ফুল ও ফলের গাছে সাজান ছোট একটি বাগান। আমি যেটুকু খবর পেয়েছিলাম তাতে জানতে পারি ডক্টর মুখার্জী বেশ স্বাস্থ্যকর ও মনোরম পরিবেশেই আছেন এবং তাঁকে বেশ ভালরকম দেখাশুনোও করা হচ্ছে। একথা জেনে খুব খুশিই হয়েছিলাম। এরূপ সুন্দর পরিবেশে এবং শ্রীনগরের চমৎকার গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার গুণে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এই আশাই করেছিলাম।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে তাই নিদারুণ আঘাত পাই কারণ খবরটা ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রায়ই আমাদের দুজনের মতবিরোধ ঘটত—সংসদেও তা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। মত-বিরোধ যাই থাকুক না কেন আমাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল, তাই তাঁর মৃত্যুতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হল। ডক্টর মুখার্জীর অভাবে সংসদ তো নিঃসন্দেহে

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের মধ্যে আজ অসাধারণ কার্যক্ষম ব্যক্তির বড় অভাব। অথচ আমাদের কাছে দেশের রয়েছে অনন্য প্রত্যাশা।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু আমাদের কাছে বড় বেশি দুঃখ ও বেদনাদায়ক। ঐ অবস্থায় কাশ্মীর সরকার যতদূর সম্ভব সৌজন্যমূলক ব্যবহার-সহ সম্ভবপর সব রকম সুবিধাই তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে ডক্টর মুখার্জীর মৃত্যু প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। তাঁর মৃত্যু নিতান্তই আকস্মিক। এরূপ ঘটনা ঘটে যাবার পর বিজ্ঞের মত কি করা উচিত ছিল বা কি করা হয় নি তা নিয়ে গবেষণা করা সহজ কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে তাঁর মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। ডক্টর মুখার্জী স্বয়ং সেদিন তাঁর উকীল বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন এবং কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে আশ্বাসপ্রদ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা করতে নিষেধ করেছেন।

মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগেই ডক্টর মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর উকীল সর্দার হুকুম সিং এবং প্রজা পরিষদের পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ঘটে। আমি শুনেছি ডক্টর মুখার্জী যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা প্রত্যাহার করার বিষয় আলাপ-আলোচনা করছিলেন। বলা বাহুল্য এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেই জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

কাশ্মীর সরকার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তা হবার নয়। শোচনীয় বিয়োগান্ত ঘটনাটি ঘটে গেল,—তাঁর মুক্তি হোল, তবে অন্যভাবে।

ডক্টর মুখার্জীর অগণিত বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য অনেকে এই একান্ত অপ্রত্যাশিত এবং চরম দুঃসংবাদ শুনে কি দারুণ আঘাত পেয়েছেন তা আমি খুব সহজেই অনুমান করতে পারি। কিন্তু দুঃখের আঘাতে বিচলিত হয়ে আমরা যেন ভারসাম্য হারিয়ে যুক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী না হই। বরং এই ঘটনা আমাদের যেন মাথা ঠাণ্ডা রেখে বৃহত্তর সমস্যাগুলির কথা গভীরভাবে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে থেকে এক বিশিষ্ট জননায়ক আজ চলে গেলেন। ফলে আমরা যারা বেঁচে আছি তাঁদের ওপর আরো গুরু কর্তব্যভার ন্যস্ত হল।

ছয়

ডঃ মুখার্জীর জনৈক সহ-আটক-বন্দী শ্রীগুরুদত্ত বৈদ-এর বিবৃতি (২৫. ৬. ৫৩)

ডঃ এস. পি. মুখার্জী, শ্রী টেকচাঁদ এবং আমি—আমরা তিনজন দিল্লী থেকে ৮ই মে সকালে রওনা হই। ডক্টর মুখার্জী তাঁর জম্মু যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। জম্মু যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে প্রকৃত তথ্য জানা এবং কয়েকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা। পাঞ্জাব ভ্রমণকালে আম্বালা থেকে ডঃ মুখার্জী শেখ

আবদুল্লাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। সেই টেলিগ্রামে তিনি জম্মু গিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্ভব হলে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জানান। ডঃ মুখার্জী টেলিগ্রামের কপি শ্রীনেহরুকেও পাঠিয়েছিলেন। দুদিন পাঞ্জাব সফরের পর ১০ তারিখে সন্ধ্যার সময় আমরা জলন্ধরে ট্রেনে উঠে দেখি সেই কামরায় এক ভদ্রলোক বসে। ভদ্রলোক ডঃ মুখার্জীর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ডঃ মুখার্জীকে পরে বললেন, তাঁকে পাঠানকোটে যেতে দেওয়া হবে না। পাঞ্জাব সরকার তাঁকে ডঃ মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশও দিয়েছেন। অবশ্য কোথায় এবং কখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে তা বলতে তিনি অক্ষম কারণ সে নির্দেশ তখনও তিনি পাননি। সিমলায় এক সভায় যোগ দিয়ে গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেখান থেকে ওই ট্রেনে ফিরছিলেন।

ইতিমধ্যে ৯ই মে ফাগওয়াড়ায় পৌঁছে ডঃ মুখার্জী শেখ আবদুল্লার কাছ থেকে তাঁর টেলিগ্রামের একটা উত্তর পেয়েছিলেন (টেলিগ্রামের কপি এই সঙ্গে দেওয়া হল)। ১১ তারিখে আমরা যখন গুরুদাসপুর জেলায় পৌঁছলাম, বাটালায় স্থানীয় এস-ডি-ও ট্রেনের কামরায় ঢুকে আমাদের কাছেই বসলেন এবং ডঃ মুখার্জীর কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তবে এস-ডি ও জানালেন যে তিনি ডঃ মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করতে আসেন নি। কেবলমাত্র তাঁর এলাকা পার হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকবেন। গুরুদাসপুরেই তাঁর এলাকার সীমা শেষ। ট্রেন থেকে নেমে গেলে গুরুদাসপুরের এস-ডি-ও এসে তাঁর জায়গায় বসলেন। এই ভদ্রলোক পাঠানকোট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গেলেন। পাঠানকোটে পৌঁছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং আরো অনেক কর্মচারীকে দেখলাম। তবে তাঁরা কেউ আমাদের গ্রেপ্তার করলেন না, এমন কি আমাদের সঙ্গে কোনো কতাবার্তাও বললেন না। বেলা ১২টা নাগাদ আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এই মর্মে একটা বার্তা পেলাম যে তিনি ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চান। বেলা ১টা নাগাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ডঃ মুখার্জীকে জানালেন সরকারের কাছ থেকে তিনি নির্দেশ পেয়েছেন ডঃ মুখার্জী এবং তাঁর দলের লোকদের যেন জম্মু রওনা হতে দেওয়া হয়।

ডঃ মুখার্জী বা তাঁর দলের কারুরই সেখানে যাবার কোনো অনুমতিপত্র না থাকা সত্ত্বেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জম্মু যাবার জন্য প্রয়োজন হলে যানবাহন দিয়ে সাহায্য করারও প্রস্তাব করলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ একজন কর্মচারী, সঙ্গে দলের কিছু লোকজন নিয়ে জিপে করে মাধোপুর চেক পোস্ট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গেলেন। মাধোপুর চেক পোস্টে পৌঁছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর অন্যান্য অফিসাররা সকলেই দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের যাত্রা শুভ হোক এই শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলেন। সেই সময় আমাদের জিপের ড্রাইভার জানায় যে তার কাছে জম্মু রাজ্যে প্রবেশের কোনো অনুমতি-পত্র নেই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের

কাছে আমরা প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবার জন্য দাবী জানাই। তিনি বললেন, আমরা যেন রওনা হই, অনুমতি-পত্র ঠিক সময় পৌঁছে যাবে। আমরা সেই মত অগ্রসর হলাম। কিন্তু রাভি ব্রীজের অর্ধেকটা পার হয়েই দেখলাম জম্মুর পুলিস অফিসাররা বেশ কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের মধ্যে কাঠুয়ায় পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ আজিজ ডঃ মুখার্জীকে জানালেন যে তাঁকে একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে হচ্ছে। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের একটা আদেশ-পত্র দেখিয়ে ডঃ মুখার্জীকে বললেন তাঁর ওপর জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারী করে এই আদেশপত্র দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি আর অগ্রসর হতে পারবেন না। এর উত্তরে ডঃ মুখার্জী বললেন, ভারত সরকার তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যাবার অনুমতি দিয়েছেন সুতরাং তিনি সেখানে যাবেন।

তাতে সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস পকেট থেকে আর একটি নির্দেশ বার করে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। আমি ও টেকচাঁদ শর্মা ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে কাশ্মীর যাব ঘোষণা করায় মিঃ আজিজ আমাদের কোন নির্দেশ না দেখিয়েই বলেন, আমাদেরও গ্রেপ্তার করা হল। লক্ষ্মণপুর চৌকিতে আমাদের আধঘণ্টার মত আটকে রাখা হল এবং এক ভদ্রলোক নিজেকে জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যের ইনসপেকটর জেনারেল অফ পুলিস বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের বলেন যে আমাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হল এবং তিনি একটি কাগজ থেকে নির্দেশটি পড়েন। তারপর আমাকে, শ্রীটেকচাঁদ শর্মাকে এবং ডঃ এস. পি. মুখার্জীকে একটি জিপে চড়ানো হল এবং পুলিস ও সামরিক পাহারায় (সামরিক পাহারা বলতে একজন ক্যাপ্টেন ও কুমায়ুন রেজিমেণ্টের কয়েক-জন সৈন্য) জম্মুতে এবং সেখান থেকে কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়া হল।

আমরা উদমপুরে পৌঁছলাম রাত সাড়ে দশটায়। সেখানে একটি ডাকবাংলোতে আমরা নৈশ আহার সারলাম। ডঃ মুখার্জী জানালেন যে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছেন এবং তিনি আরও বললেন যে তাঁর সকাল সকাল শুয়ে পড়ার অভ্যাস। সেজন্য তিনি আর এগিয়ে না গিয়ে ওখানেই থাকতে ইচ্ছুক। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেই ক্যাপটেনটি আমাদের বললেন, ডাকবাংলোয় কোন ঘর খালি নেই এবং তাঁরা টেলিফোনে বাটোট ডাকবাংলোয় আমাদের জন্য একটি ঘরের বন্দোবস্ত করেছেন এবং আমাদের সেখানে যেতে হবে। সুতরাং আধঘণ্টা সেখানে থেকে আমরা বাটোট রওনা হলাম এবং সেখানে রাত ২টা নাগাদ পৌঁছলাম। বাকী রাতটা আমরা বাটোটে থেকে গেলাম। পরদিন সাড়ে সাতটায় সকালের চা খাবার পর আমরা বাটোট থেকে রওনা হলাম। দুপুরে একটা নাগাদ আমরা কাজীকুণ্ডু পৌঁছলাম। সেখানে আমরা মধ্যাহ্নভোজন সারলাম এবং সেখান থেকে দুটো নাগাদ রওনা হয়ে বিকেল ৩টের সময়ে আমরা শ্রীনগর সেণ্ট্রাল জেলে পৌঁছলাম। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাদের বিকেল চারটের সময় নিশাতের কাছে একটি ছোট কটেজে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে জেল সুপারিনটেনডেন্ট, শ্রীনগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডাক্তার মিঃ আলি মোহম্মদ আমাদের দেখতে এলেন। তাঁরা সকলে

ডাঃ মুখার্জীর স্বাস্থ্যের বিষয় খোঁজখবর নিলেন এবং তারপর আমাদের সেখানে থাকতে দেওয়া হল।

আমাদের সেখানে আসার তিন দিন পরে ডঃ মুখার্জী ডান পায়ের যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর জ্বর আসে। আমাদের কাছে থার্মোমিটার না থাকায় তাঁর কত জ্বর হয়েছিল বলতে পারি না। পরদিন ডাক্তার এলেন। তিনি বেলেডোনা প্লাস্টার লাগাবার ও একটি মিক্‌সচার খাবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। মিক্‌সচারের প্রেসক্রিপশনে কি ছিল আমরা জানি না। হাসপাতাল থেকে এটি পাঠানো হয়। তিনি বলেন যে তাঁর মতে ডঃ মুখার্জীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভাল এবং তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। পরপর তিন-চার দিন প্রেমনাথ নামে আর একজন ডাক্তার আসতেন এবং প্লাস্টার লাগিয়ে যেতেন। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ডঃ মুখার্জী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। এর দুই সপ্তাহ পরে ডঃ মুখার্জী একই রকম পায়ের যন্ত্রণা ও জ্বরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাঃ আলি মোহম্মদ আবার এলেন এবং বেলেডোনা লাগাবার নির্দেশ দিলেন। আর একজন ডাক্তার এলেন এবং তিনি বেলেডোনা লাগিয়ে দিলেন। দুই-তিন দিন পরে ডঃ মুখার্জী সুস্থ হন।

ডঃ মুখার্জী বরাবরই জেল-সুপারিনটেনডেন্ট, কারাগার-ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল এবং শ্রীনগর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেছেন যে বাংলোটির মধ্যে হেঁটে বেড়াবার মত পর্যাপ্ত জায়গা নেই এবং তাঁকে যেন দিনে অন্তত এক ঘণ্টা বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। বস্তুত জেল-সুপারিনটেন্‌ডেন্‌ট এবং কারাগার-ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল তাঁকে পুলিস পাহারায় বাইরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিস তাঁদের কথা মানে নি এবং ডঃ মুখার্জী কখনই বাইরে বেরোবার সুযোগ পান নি। ভারপ্রাপ্ত পুলিস জেল-সুপারিনটেন্‌ডেনটের কাছ থেকে লিখিত নির্দেশ চেয়েছিল এবং তা কখনই পাঠানো হয় নি। মিঃ ত্রিবেদী যখন ১৬ই জুন দেখা করতে এলেন, তখন আমরা তাঁর কাছে শুনলাম যে তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বেড়াবার সুযোগ দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে আদেশ যখন ডঃ মুখার্জী তৃতীয়বার অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনও পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

১৯ এবং ২০ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে ডাঃ মুখার্জী পিঠে বেদনা বোধ করেন এবং তাঁর প্রবল জ্বর হয়। সকালে আমরা থার্মোমিটারে দেখলাম জ্বর ৯৯.৪°; বেদনাও দারুণ ছিল। ডাক্তারকে ডাকা হল। তিনি সাড়ে এগারোটা নাগাদ এসে ডঃ মুখার্জীকে পরীক্ষা করে জানালেন যে ডঃ মুখার্জী ড্রাই প্লুরিসিতে ভুগছেন। তিনি স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেক্‌শন এবং কিছু গুঁড়ো ঔষধ খাবার জন্য নির্দেশ দিলেন, তার প্রেসক্রিপশন আমাদের দেখানো হয় নি। ডাক্তার বললেন, রোগীর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু তাঁর হাসপাতালে যাবার আগে পর্যন্ত ঐ পরীক্ষা করা হয় নি। ডাক্তার নির্দেশ দিয়ে বলেন, রোগী দিনে ২ বার পাউডার ঔষধ (পুরিয়া) খেতে পারেন, এবং যন্ত্রণা বেশী হলে ৬ বার পর্যন্ত এই ঔষধ খাওয়া যেতে পারে। ইনজেক্‌শন দিতে আলি আসেন নি, জেলের ডাক্তারই দিয়েছিলেন।

ডঃ মুখার্জী মেডিক্যাল অফিসার মিঃ আলি মোহম্মদকে বলেছিলেন যে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ বোস তাঁকে স্ট্রেপটোমাইসিন নিতে নিষেধ করেছেন, কারণ এটা তাঁর সহ্য হয় না। তাতে আলি মোহম্মদ বলেন, সেটা তো বহুদিন আগের কথা; এখন তাঁরা এই ঔষধটি সম্বন্ধে অনেক বেশি তথ্য জেনেছেন; সুতরাং ডঃ মুখার্জীর চিন্তিত হবার কারণ নেই, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ঔষধটি এল, পুরো এক গ্রাম ইনজেকশন দেওয়া হল। তাছাড়াও এক মাত্রার পাউডার ঔষধ খাওয়ানো হল। ডাক্তার আরও পাঁচটি পুরিয়া পাউডার রেখে গেলেন। বলে গেলেন, একটা তো ডাঃ মুখার্জী খাবেনই এবং যদি সেরাত্রে প্রয়োজন হয় বেশীও খেতে পারেন। ইনজেকশনটি দিয়েছিলেন জেল-ডাক্তার, আলি মোহম্মদ নয়।

ডঃ মুখার্জী তাঁর অসুখের খবর আত্মীয়দের জানানোর জন্য সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে বলেন। সেরাত্রে ডঃ মুখার্জী খুব অস্থিরতা বোধ করেন তবে পরদিন সকালে যন্ত্রণা কিছু কমে এবং জ্বরও আগের দিনের সকালের থেকে কিছু কম ছিল। ঐদিন সকাল দশটায় জেল-ডাক্তার এসে আরও একগ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশন দেন এবং আরও কিছু পাউডার রেখে যান। সকালবেলা জেল-ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে যাবার পর সারা দিন বা রাত্রে অর্থাৎ ২২শে জুন সকালের আগে জেল-ডাক্তার বা ডাঃ আলি মোহম্মদ কেউ আসেন নি। ভারপ্রাপ্ত পুলিস সাবইনস্পেকটর অপরাহ্নে ডঃ মুখার্জী কেমন আছেন খোঁজ নিতে আসেন এবং উপরোক্ত সংবাদ সংগ্রহ করেন।

ঐ সাবজেলটিতে ডাক্তাররা তাঁর নার্সের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি। বিকেল ৪টে নাগাদ যন্ত্রণা বাড়ে এবং জ্বরও একটু বেড়ে ১০০·২° পর্যন্ত ওঠে। ২১শে জুন রাত্রি সাড়ে এগারটা নাগাদ ডঃ মুখার্জী যন্ত্রণা বাড়ছে বোধ করেন, তখন ডাক্তারের নির্দেশমত আর এক পুরিয়া পাউডার খান। সাড়ে এগারোটার পর তাঁর ঘুম আসছে দেখে আমি তাঁর ঘর থেকে চলে আসি।

পরের দিন অর্থাৎ ২২শে জুন ভোরবেলা পৌনে পাঁচটা নাগাদ জেল-পরিচারকটি আমায় ঘুম থেকে তুলে বলে ডঃ মুখার্জী আমাকে অবিলম্বে আসতে বলেছেন। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁকে দুর্বল, স্বেদাক্ত ও বিবর্ণ দেখাচ্ছে। আমি তাঁর নাড়ী দেখলাম। নাড়ী দুর্বল এবং তাঁর সারা শরীর খুব ঠাণ্ডা ছিল। ডঃ মুখার্জী আমাকে বলেন, আধ ঘণ্টা যাবৎ তাঁর ঘাম হচ্ছে। তাঁর মাথা এমনই ঘুরছে যে মনে হচ্ছে যেন তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। ডঃ মুখার্জী আমাকে এও বলেন যে মাঝরাত্তির থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়েছেন এবং ঐ সময়ে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে যন্ত্রণা ও ঘাম হতে শুরু হয়। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, কাকেও বিব্রত করতে হবে না, আপনা-আপনিই তাঁর শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অস্বস্তি বাড়তে থাকায় ও অজ্ঞান হবার উপক্রম দেখে তিনি পরিচারকটিকে ডাকেন। সে না উঠতে পারায় তাঁকে কয়েকবারই ডাকতে হয়।

সাবজেলটি ছিল ছোট একটি বাংলো বাড়ি। বাড়িটিতে ছিল তিনটি ছোট ঘর; বাংলোটি শ্রীনগর থেকে মাইল সাতেক দূরে এবং হাসপাতাল যেখানে ডাঃ আলি

মোহম্মদ থাকতেন সেখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। আমরা তখনই ডঃ মুখার্জীকে একটু দারচিনি ও সামান্য একটু চিনি দিলাম, লবঙ্গ দিলাম চোষার জন্য। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডঃ মুখার্জী আগের থেকে ভাল বোধ করলেন এবং ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে ঘাম হওয়া বন্ধ হল, নাড়ী সবল এবং বুকের ব্যথাও কমতে থাকল।

তখন আমি হাবিলদারকে জেল-সুপারিনটেনডেন্টকে ফোন করে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করতে বললাম। হাবিলদার আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি সওয়া পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার ভেতর টেলিফোনে সেণ্ট্রাল জেলে সুপারিনটেনডেটকে পেলাম এবং তাঁকে ডঃ মুখার্জীর অবস্থার বিবরণ জানালাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, ডাক্তারকে সঙ্গে করে তিনি অবিলম্বে আসছেন। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে কোন টেলিফোন ছিল না। ওয়াটার ওয়ার্কস অফিসেই একটি মাত্র টেলিফোন ছিল, অফিসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সেটি বন্ধ থাকত। সেজন্য লোক ডেকে অফিস খোলাতে কিছু সময় গেল। সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ আলি মোহম্মদকে নিয়ে সাড়ে সাতটা নাগাদ এলেন। তিনি ডঃ মুখার্জীকে পরীক্ষা করলেন। তখন ডঃ মুখার্জী আগের থেকে সুস্থ বোধ করছিলেন। আঙ্গুলের অগ্রভাগ ছাড়া শরীরের তাপ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। ডাঃ আলি মোহম্মদ বললেন,প্লুরিসি আগের থেকে অনেকটা সেরেছে। লো ব্লাডপ্রেসার ও টেম্পারেচার নেমে যাওয়ার জন্যই হার্টের অস্বস্তি দেখা দিয়েছিল। ডঃ মুখার্জীর জিভের নিচে টেম্পারেচার ছিল ৯৬·৮° কিন্তু ভোর সওয়া পাঁচটার সময়ে ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে গেছল আর দেহের তাপ বাড়ছিল। যখন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন, তখন জিভের নিচে টেম্পারেচার ছিল ৯৮°।

ডাঃ আলি মোহম্মদ তাঁকে ২ সিসি কোরামিন ইনজেকশন দিলেন। ডাঃ আলি মোহম্মদের সঙ্গে তখন আর একজন ডাক্তার ছিলেন। ডাঃ মোহম্মদ সেই ডাক্তারটিকে ২ সিসি কোরামিন নিয়ে একটি সিরিঞ্জ ঠিক করতে বলেন। কিন্তু সে ডাক্তারটি বলেন, একবারে ২ সিসি কোরামিন ইনজেকশন বড় বেশী হয়ে যাবে। তাতে ডাঃ মোহম্মদ বললেন যে ডঃ মুখার্জীর শরীরের ওজন অনেক বেশী এবং ২ সিসি দেওয়াই ঠিক হবে। তারপর তিনি ডঃ মুখার্জীকে বললেন যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি জেল-সুপারিনটেনডেন্টকে হাসপাতালে ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে আমাদের থাকার অনুমতির জন্য বললাম, আমাদের অন্ততঃ একজনেরও ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে হাসপাতালে থাকা উচিত। তিনি বললেন, সেটা সম্ভব নয়। ডাঃ আলি মোহম্মদ বললেনঃ "আমি আপনার উদ্বেগ বুঝতে পারছি, তবে আপনার চিন্তার কারণ নেই, উনি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবেন।" আমি জেল-সুপারিনটেনডেন্টকে একজন জেল-পরিচারককে নিয়ে যেতে বললাম, জেলে এরা গত কয়েক সপ্তাহ ডঃ মুখার্জীকে সেবা-যত্ন করেছে, হাসপাতালেও দেখাশুনা করতে পারবে। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, তার প্রয়োজন হবে না। জেল-সুপারিনটেনডেন্ট আরও বললেন, হাসপাতালে আমাদের থাবার ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না, ডঃ মুখার্জীর পথ্যেরই ব্যবস্থা হবে।

ডাঃ আলি মোহম্মদ সুপারিনটেন্ডেন্টকে অ্যামবুলেন্স করে ডঃ মুখার্জীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে বিদায় নিলেন। জেল-ডাক্তার আমাদের সঙ্গে রইলেন। দশটা নাগাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী এলেন ও ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করলেন। ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে মামলার বিষয়ে পরামর্শ করে তিনি ১১টা নাগাদ চলে গেলেন। সুপারিনটেন্ডেন্ট গাড়ি নিয়ে সাড়ে ১১টা নাগাদ এলেন। ডঃ মুখার্জীকে একটি চেয়ারে করে তাঁর ঘর থেকে বাংলোর বাইরে (যেখানে গাড়িটি দাঁড়িয়েছিল) নিয়ে যাওয়া হল। একটি চারজনের বসার মত ছোট মোটরগাড়ি, যা হৃদ্রোগীর পক্ষে একান্তই অনুপযোগী, তাতে করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত আমরা ডঃ মুখার্জীর কোন খবর পাই নি। সাড়ে ৭টার সময়ে আমার একটি টেলিফোন এল। যেখানে টেলিফোন ছিল সেখানে যেতে হল। জেল-সুপারিনটেন্ডেন্ট টেলিফোন করছিলেন। তিনি জানালেন যে তিনি হাসপাতাল থেকে আসছেন এবং ডঃ মুখার্জী এখন অনেকটা ভাল বোধ করছেন। পরদিন ২৩শে জুন জেল-সুপারিনটেন্ডেন্ট ভোর পৌনে চারটের সময়ে আমাকে জাগিয়ে বললেন, আমাকে, শ্রীশর্মা এবং প্রেমনাথ ডোগ্রাকে—যিনি গত তিনদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন—তাঁর সঙ্গে তখনই হাসপাতালে যেতে বললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার। তিনি বললেন, তাঁকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। কিন্তু কোনও কারণ জানান নি। তিনি নিজে এর বেশি কিছুই জানেন না।

আমরা প্রায় চারটে বাজতে ৫ মিনিটে রওনা হলাম এবং সাড়ে ৪টে নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছলাম। সেখানে শ্রীত্রিবেদী আগে থেকেই ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন, ডঃ মুখার্জী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দশ মিনিট পরে আমি ঐ ঘরে যাবার জন্য এবং মৃতদেহ নিজে দেখব বলে ডাক্তারের কাছে অনুমতি চাইলাম। আমি, শ্রীটেকচাঁদ শর্মা এবং প্রেমনাথ ডোগ্রা ঘরের ভিতর গেলাম এবং মরদেহ দেখলাম। তখন দেহের সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। যখন আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি শ্রী টেকচাঁদ শর্মা একটি নার্স যিনি আমাদের সঙ্গে ঘরে এসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "কখন ডঃ মুখার্জী মারা যান?" নার্স উত্তর দেন রাত আড়াইটের সময়ে। তিনি আরও বলেন, দুপুর ১টার সময় ডঃ মুখার্জী তাঁর সহবন্দীদের কাছে পেতে চেয়েছিলেন।

সর্বশেষ অসুস্থ হবার দুদিন আগে ডঃ মুখার্জী ক্ষুধাবোধ হারিয়ে ফেলেন এবং খুব সামান্যই আহার করেছিলেন। যেদিন জানা গেল তিনি প্লুরিসিতে ভুগছেন, সেদিন থেকে ডাক্তার বলেছিলেন, ডঃ মুখার্জী তাঁর ইচ্ছানুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ডঃ মুখার্জী চা, কফি এবং ভেজিটেবল স্যুপ ছাড়া কিছুই খান নি। ২০শে এবং ২১শে দুদিনই উনি সারাদিনে কেবল দুকাপ ভেজিটেবল স্যুপ, দু-এক কাপ চা ও এক কাপ কফি খেয়েছিলেন। এ ছাড়া ২২ তারিখ সকালে ডাক্তারের নির্দেশে তিনি সামান্য পরিমাণ কমলার রস পান করেন।

দুঃখের কথা এই যে এমনই এক পরিস্থিতিতে একটি মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়ে গেল, যেখানে আমার মতে আরও ভাল সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।

(ক) ডঃ মুখার্জী যেখানে বন্দী ছিলেন, সেখানে তাঁর শরীর যখন গুরুতর অসুস্থ হল তখনও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না।

(খ) যেখানে তাঁকে বন্দী রাখা হয়েছিল সেখানে শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

(গ) যতদিন তিনি সাবজেলে ছিলেন, ততদিন কোন ল্যাবরেটারী (প্যাথলজিক্যাল) পরীক্ষা করা হয় নি।

(ঘ) যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সহকর্মী কোন বন্দীকেই তাঁর শয্যাপার্শ্বে থাকতে দেওয়া হয় নি।

ডঃ মুখার্জী তাঁর সঙ্গী বন্দীদের হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশের পরেও তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁদের কোন খবর দেওয়া হয় নি।

(ঙ) কাশ্মীর সরকার জাস্টিস মুখার্জী, তাঁর মা এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনকে কোন সংবাদ জানাননি এবং বাইরের কোন যোগ্য চিকিৎসকের সাহায্য নেবার কোন চেষ্টাই করা হয় নি।

(চ) কলকাতায় পূর্ব-অসুস্থতার সময়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁকে স্ট্রেপটোমাইসিন নিতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁদের উপদেশের ভিত্তিতে ডঃ মুখার্জী প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও, আগে প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা না করে বা কলকাতায় তাঁর ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ না করে (টেলিফোনে যা সহজেই করা যেতো) তাঁকে স্ট্রেপটোমাইসিন দেওয়া হল।

ছ২

২৫. ৬. ৫৩ তারিখে প্রদত্ত ডঃ মুখার্জীর কৌঁসিলী শ্রীইউ. এম. ত্রিবেদীর বিবৃতি

ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করি ১২ তারিখে, যে বাড়িতে তিনি বন্দী ছিলেন সেখানে। আমার সঙ্গে ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কিছু সৌজন্যমূলক সম্ভাষণের পর আমি ডঃ মুখার্জীকে অনুরোধ করলাম আর একটি ঘরে যাবার জন্য, যেখানে তাঁর কাছ থেকে একান্তে কিছু নির্দেশ নিতে পারি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন, তাঁর কাছে সরকারের আদেশ আছে যে যাবতীয় নির্দেশ তাঁর সামনে এবং তাঁর শ্রুতিসীমার মধ্যে দিতে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ এভাবে কোন নির্দেশ নিতে আপত্তি জানাই এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ডঃ

মুখার্জী যেখানে বসেছিলেন সেখানে নিয়ে গিয়ে ডঃ মুখার্জীকে যে সব শর্তে আমাদের সাক্ষাৎকার মঞ্জুর হয়েছে জানালাম। তিনিও আমার সঙ্গে একমত হলেন এবং ঐ শর্তে কোন নির্দেশ দিতে চাইলেন না। সুতরাং আমি ডঃ মুখার্জীর কাছ থেকে চলে আসি। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারেই আমার মনে হয়েছিল, তাঁকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে না। হোটেলে ফিরে আসার পর কয়েকজন প্রেস রিপোর্টার আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি ডঃ মুখার্জীকে নিরানন্দ দেখানোর কথা তাঁদের জানাই। আমার মনে হয় এ সংবাদটি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে আমি আবার সাক্ষাৎ করি ১৮ তারিখে নটার সময়ে। তিন ঘণ্টা যাবৎ তাঁর সঙ্গে আমার খোলাখুলি আলোচনা হয়। আমি তাঁর জন্য একটি আবেদনপত্র ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ করবার জন্য একটি হলফনামার খসড়া তৈরি করি। তাঁকে যে নিরানন্দ দেখাচ্ছিল আমার এই মন্তব্য তাঁর পছন্দ হয়নি, কারণ তিনি মনে করেছিলেন তাঁর বাড়ির লোকেরা হয়তো এটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবে। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ডঃ মুখার্জীকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। আমি তাঁকে জানালাম তিনি যে বাইরে গিয়ে হাঁটাচলা করার জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, সরকার তা মঞ্জুর করেছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

আমি ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে আবার দেখা করি ২২ তারিখ সকাল ১০টা নাগাদ। তাঁর বন্দীশালায় যাবার আগে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জানান যে ডঃ মুখার্জী অসুস্থবোধ করেছিলেন বলে চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নার্সিং হোমটি কোথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুবই সংক্ষিপ্তভাষী, নার্সিং হোমটির নাম-ধাম প্রকাশ করলেন না। এই দিন ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার মত হয়।

আমি গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, তবে তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, খুব ভোরবেলায় তিনি হয়তো মারাই যেতেন—"মেরে ভাই, পাঁচ বাজে তো চলা যাতা থা।" তাঁর অসুস্থতার গুরুত্ব কতটা তা তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি এখন কেমন বোধ করছেন। তিনি বললেন, তাঁর এখন আর কোন যন্ত্রণা নেই এবং পুরোপুরি ভালই বোধ করছেন। যাই হোক, আমি খুব একটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারলাম না। বললাম, কোর্টে যেতে হবে, সেজন্য আমাকে এখন চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বিকেলে আবার তাঁকে অবশ্যই দেখতে আসব। ১১টা নাগাদ আমি ডঃ মুখার্জীর কাছে বিদায় নিলাম। কোর্টে যাবার পথে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোল তাঁরা একটি ছোট গাড়িতে আসছিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জানালেন, তিনি ডঃ মুখার্জীকে একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাবেন। এরপর আমি কোর্টে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, কতকগুলি রেফারেন্স বই আমি হোটেলে ফেলে

এসেছি। সেজন্য আমি ডঃ মুখার্জীর তরুণ বন্ধু শ্রীদেওকী প্রসাদকে আমার হোটেল থেকে বইগুলি নিয়ে আসতে পাঠালাম। তখন বেলা প্রায় বারটা। দেওকী প্রসাদ ফিরে এসে আমাকে বললেন যে তিনি দেখলেন ডঃ মুখার্জীকে একটি ছোট গাড়ি করে শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি আমাকে একথাও জানালেন যে যেদিকে গাড়িটা যাচ্ছিল সেদিকে কোন নার্সিং হোম নেই।

বিকেল সওয়া পাঁচটা নাগাদ কোর্টের কাজ শেষ হলে আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং বলি যেখানে ডঃ মুখার্জীকে রাখা হয়েছে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে। তার আগে আমি অন্ততঃ পাঁচজন যুবককে কাছেপিঠে প্রায় সব ক'টি জানা নার্সিংহোমে খবর নিতে পাঠিয়েছি এবং খবর পাই নার্সিং হোমগুলির কোন-টিতেই ডঃ মুখার্জীকে রাখা হয় নি। ইতিমধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজের গাড়িতে আমাকে ডঃ মুখার্জীর কাছে নিয়ে যেতে এলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন আমার হোটেল থেকে প্রায় ৩½ মাইল দূরে সরকারী হাসপাতালে। সরকারী হাসপাতালের দোতলায় স্ত্রী-রোগ-সংক্রান্ত ওয়ার্ডের ১নং ঘরে ডঃ মুখার্জীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি দেখলাম ডঃ মুখার্জী বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। হাসিমুখ সত্ত্বেও তাঁকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। আমি তাঁকে বললাম, সকালে তাঁকে যত ভাল দেখেছিলাম এখন সেরকম লাগছে না। তিনি কিন্তু সে কথা মানতে চাইলেন না, বললেন, আগের চেয়ে সুস্থবোধ করছেন। সে সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তাঁর সমস্ত চিঠিগুলি দিলেন (গোটা পনেরো হবে)। তিনি সব চিঠিগুলি পড়লেন। তার মধ্যে একটি টেলিগ্রাম ছিল, পুনা থেকে মীরা নামের একজন পাঠিয়েছিলেন। আমি সেটি পড়ে দিলাম।

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর আত্মীয়স্বজন অথবা পুনায় হাসির কাছে কোন টেলিগ্রাম পাঠাতে চান কিনা। তিনি জানালেন তিনি ইতিমধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তিনটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্টেট আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে বললেন। আমি ডঃ মুখার্জীকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঐসব টেলিগ্রামে যা বলেছেন, তাছাড়া আরও কিছু জানা-বার আছে কিনা। তিনি বললেন, তাঁর বেশী কিছু আর জানাবার নেই এবং বিশেষ কোন চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ নেই। সে সময়ে লিকুইডেশনে যাওয়া একটি ফার্মের কতকগুলি কাগজপত্র এসেছিল। ডঃ মুখার্জী বিছানায় উঠে বসে ফাউন্টেন পেন নিলেন ও চিঠিপত্রগুলি পড়ে ছ-সাতটি কাগজে স্বাক্ষর করলেন এবং ২টি চেকও সই করলেন।

তারপর তিনি শৈলেনকে একটি চিঠি লিখতে বললেন। তিনি আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'আপনার হাতের লেখা ভাল নয়। আমি পড়তে পারি বটে, কিন্তু আর কেউ তো পারবে না। আপনাকে ডিক্‌টেশন দিয়ে চিঠি লিখিয়ে কি লাভ!' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি লিখে চিঠিটা পড়ে শোনালাম, তিনি সই করে দিলেন। সে সময়ে যে ডাক্তারটি ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং মেডিক্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গিরিধারী-

লাল আমাকে বললেন ডঃ মুখার্জীকে জানিয়ে দিতে যে তাঁর বিছানায় উঠে বসা উচিত নয়। সইসাবুদ করার পর ডঃ মুখার্জী আবার হেলান দিলেন। সে সময়ে তাঁর হাতটি হৃৎপিণ্ডের উপর রাখলেন এবং তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি যন্ত্রণা বোধ করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে কিছু এটা-সেটা কথা বললাম। সন্ধ্যা ৭-১৫ বা ৭-২০ মিনিট পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে ছিলাম—হয়তো ৭-২৫ মিনিটেরও বেশী হতে পারে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি বড় একটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি নি। আমি ডাক্তারকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ডঃ মুখার্জীর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কি মনে করছেন? তিনি বললেন, ভয় পাবার মত কিছু নেই। সংকট কিছু হয়ে থাকলেও তা কেটে গেছে, পরদিন সকালে তাঁর x-ray হবে। তিনি আমাকে আরও বললেন, ২/৩ দিনের মধ্যে ডঃ মুখার্জী সুস্থ হয়ে উঠবেন।

যাই হোক, তাতেও আমি স্বস্তিবোধ করতে পারি নি, কারণ ডঃ মুখার্জীর মুখ-চোখের চেহারা আমার ভাল বোধ হচ্ছিল না। পরদিন সকালে আমি প্লেনে পাঠানকোট চলে যাবার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু সে পরিকল্পনা বর্জন করে তাঁকে বললাম, পরদিন সকালে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ না দেখে আমি যাব না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি চলে আসছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর জন্য কিছু পত্র-পত্রিকা আনতে বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের পত্র-পত্রিকা তিনি চান। উত্তরে তিনি বললেন, আমার পছন্দই তাঁর পছন্দ। তিনিও তো মানুষ, যা অপরের ভাল লাগবে, তাঁরও তা ভাল লাগবে। আমি যা পড়তে পারি, তিনিও তা পড়তে পারবেন।

"যা হোক কিছু, তবে কিছু এনো এবং খরচ যা হয় কোর।"

আমি তখন তাঁর হাতে আমার হাত রাখলাম তাঁর জ্বর আছে কিনা দেখার জন্য। দেখলাম তাপ স্বাভাবিক। পরদিন সকালে অবশ্যই আসব বলে বিদায় নিলাম।

ঘরের মধ্যে আমি একজন নার্সকে দেখেছিলাম, সর্বক্ষণই তিনি পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। ঘরের বাইরে দেখেছিলাম কয়েকজন পাহারাদারী পুলিস রয়েছে। তাই পরদিন সকাল ৯টায় তাঁর সঙ্গে যাতে দেখা করতে পারি, তার অনুমতির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু ডাক্তারটি আমায় সকাল ৮টায় আসার জন্য বললেন, কারণ ৯টা নাগাদ ডঃ মুখার্জীকে এক্স-রে করার কথা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তব্যরত প্রহরীকে বললেন আমায় ঢুকতে দিতে। এই সাক্ষাৎকারের সময়ে আমার সঙ্গে ডঃ মুখার্জীর হয়ে যিনি আবেদনপত্র পেশ করবেন তিনি ছিলেন এবং তাঁকেও ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়ে রাখা হল।

এরপর আমি ডঃ মুখার্জীর খবর পাই ২৩ তারিখের খুব ভোরে পৌনে চারটে নাগাদ। পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে জানালেন ডঃ মুখার্জীর অবস্থা কিছু গুরুতর এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে হাসপাতালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হতে বলেছেন।

আমি তখনই রওনা হয়ে ৪টা বাজতে ৫ মিনিটের সময় হাসপাতালে পৌঁছই। দেখলাম ডঃ মুখার্জীর ঘরের দরজা বন্ধ এবং ভিজিটারদের ঘরে একজন ডাক্তার বসে

আছেন। আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। কিন্তু ঐভাবে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হল। তাই মিনিটখানেক বসেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ডঃ মুখার্জী কেমন আছেন?

পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবশ্য বললেন, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তখন আমি বললুম, 'চলুন, আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে বসি, গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আমি ভেতরে যেতে পারি কিনা।'

তিনি ভিতরে গেলেন এবং একজন ডাক্তারের সঙ্গে ফিরে এলেন। ডাক্তারটি আমায় জানালেন, ডঃ মুখার্জী আমার হাসপাতালে পৌঁছনোর ৫ মিনিট আগে মারা গেছেন।

তারপর আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। আমি দেখলাম ডঃ মুখার্জীর সমস্ত দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত। তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখলাম, তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন।

আমার আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে জানালাম, আমি মৃতদেহ এখনই কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই এবং তাঁকে অবশ্যই সে ব্যবস্থা করতে হবে। এবং যদি তিনি না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাকে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দিতে হবে।

তিনি আমাকে কথা দিলেন যে ঐ ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন। তখন আমি তাঁকে ডঃ মুখার্জীর পরিবারবর্গের কাছে এই সংবাদ অবিলম্বে পাঠাতে বললাম। আরও বললাম, তাঁর কলকাতার বাড়িতে অবিলম্বে যোগাযোগ করা দরকার যাতে তাঁর মা রেডিওয় এই খবর শোনার আগে যেন কোন আপনজনের কাছে তা জানতে পারেন। আমি তাঁকে ডঃ মুখার্জীর সব সহবন্দীদের নিয়ে আসতেও বললাম, তিনি জানালেন তাঁদের আনতে পাঠানো হয়েছে। আমি তখনও হাসপাতালে আছি, তিন সহবন্দীই এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁদের খবরটি জানালাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোলাম মহম্মদ বক্সী সেখানে আগেই পৌঁছেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ঐ তিনজন বন্দীকে যেন মুক্তি দেওয়া হয় ও আমার সঙ্গে বিমানে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তাঁদের তখনই ফিরে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বললেন।

তখন ভোর ৪টে ৩৫ মিনিট হবে। সহকারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খবরটি জানাবার জন্য আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমিও ৪টে ৫০ মিনিটে হোটেলে ফিরে এলাম এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া এবং ইউ. পি. আই. সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিদের ফোন করে হোটেলে আমার ঘরে আসতে বললাম। টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধিরা ৫ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন। আমি তাঁদের খবরটি দিলাম। তখনও পর্যন্ত তাঁরা কিছু জানতেন না।

তারপর আমি দিল্লীতে মৌলীচন্দ্রকে টেলিফোনে ডাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। এরপর জম্মুতে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম, তাও পেলাম না। অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধিটি আমায় জানালেন, তিনি এর আগে পুরো ২ ঘণ্টা

ধরে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেন নি। ৮টা নাগাদ আমি আবার হাসপাতালে গেলাম, সেখানে সহকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমায় বললেন, কলকাতায় সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন নি। কিন্তু তিনি অপারেটর মারফত জাস্টিস মুখার্জীকে খবরটা জানিয়েছেন এবং দিল্লী মারফত বোম্বেতেও খবর পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বললেন, ৫টার আগেই ডাঃ কাটজুর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালে ৫০০ জন লোক এসে সামনের গেটে জড়ো হয়েছিল। সেজন্য পিছনের দরজা দিয়ে শবদেহ বার করতে হল।

আটটা নাগাদ আমি তাঁর জিনিসপত্রগুলি চাইলাম। তাঁর হাতঘড়ি, কলম এবং একটা সুটকেস পেলাম। অ্যাটাচি কেসটি ছিল না। সুটকেসে কোন তালা বা চাবি ছিল না। চটিজোড়া বাইরে পড়েছিল। চশমা ছিল কিন্তু তার কোন খাপ ছিল না।

আমরা এরোড্রোমের দিকে ৮-৪০ মিঃ নাগাদ রওনা হবার সময়, পুলিসবাহিনীর ভিতর যাঁরা হিন্দু ছিলেন—সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সাব-ইনসপেক্টর এবং একজন হেড কনস্টেবল,—তাঁরা মুসলমান কর্তৃক মৃতদেহ স্পর্শ হয় তা চান নি।

পুলিস অফিসাররা আমায় পরামর্শ দিলেন, শবদেহ যদি স্ট্রেচারে তুলতে হয়, আমি যেন তাঁদের সাহায্য নেবার কথা বলি এবং মুসলমানদের স্পর্শ করা উচিত হবে না, এটাও যেন জানিয়ে দিই। সেজন্য আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সহবন্দীদের ডাকতে বললাম। আমি আগেই তাঁদের মুক্তি দেবার জন্য বলেছিলাম। প্রেমনাথ ডোগরা, যিনি বহুদিন যাবৎ কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করলাম।

শবদেহ তোলার আগেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য বলেছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল, শবদেহ তোলার জন্য অন্ততঃ দশজন লোক লাগবে। ৮-৪০ মিনিটে ঐ তিনজন সহবন্দী এসে পেঁৗছলেন। কিন্তু তাঁরা আসার আগেই পুলিস ও সেনা বিভাগের অফিসারদের সাহায্যে শবদেহ বাহিরে আনা হয়। আমরা শবদেহ অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গেলাম। আমরা সবাই, যারা শবদেহ বহন করেছিলাম, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে বসলাম। ৯টা ৫ মিনিটে আমরা এরোড্রোম পেঁৗছলাম।

এরোড্রোমে মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ছাড়া আর সব মন্ত্রীই উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে মন্ত্রীরা সবাই তাঁদের গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। অর্থমন্ত্রী দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও আবার ভেঙে পড়েন। সকাল ১০টা ১৫ মিঃ নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী এসে পেঁৗছলেন। এর মধ্যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ডাকোটা বিমান ব্যবহার নিয়ে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষের কিছু বাধাবিপত্তি দেখা গেল। উইং কমান্ডার এবং অন্য যেসব অফিসার সেখানে ছিলেন, তাঁরা সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন এবং বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার থেকে আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। প্রতিরক্ষা

মন্ত্রকের শ্রীবি. বি. ঘোষকে ফোন করা হল. কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। প্রায় আধঘণ্টা ধরে দিল্লী হেড কোয়াটার্স থেকে কেবল নিষেধাত্মক আদেশই আসতে থাকল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন সহকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডঃ কাট্জুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।

যখন ডঃ কাট্জুকে পাওয়া গেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে তাঁর সঙ্গে দশ মিনিট ধরে কথা বললেন এবং ডঃ কাটজুকে তখনই উইং কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ডাকোটা বিমানটি ব্যবহার যাতে করা যায়, তার নির্দেশাদি পাঠাতে বললেন। আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। অসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। ডঃ কাট্জু ডাকোটা ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

তখন গোলাম মহম্মদ বক্সী তাঁকে বললেন (আমি পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁদের কথোপকথন শুনছিলাম), তাঁর এ-ব্যাপারে রাজী না হওয়া ঠিক হবে না। তখন ডঃ কাট্জু উইং কমান্ডারের সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু তাঁকে কি বলা হল বুঝতে পারলাম না, কারণ ঐ ফোনের পরেও উইং কমান্ডার প্লেন দিতে রাজী হলেন না। বক্সী গোলাম মহম্মদ তাঁর ওপর রেগে আগুন হয়ে সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে তাঁকে আদেশ মানতে বাধ্য করালেন।

টেলিফোনে এইসব কথাবার্তা চলাকালীন শেখ আবদুল্লা এসে পৌঁছলেন। সব মন্ত্রীরা তখন স্ট্রেচার তুলতে হাত লাগালেন এবং মাল্যভূষিত করে স্ট্রেচার বিমানে তোলা হল। শেখ আবদুল্লা একটা বিশেষ ধরণের ফুলকাটা শাল এনেছিলেন, সেটি মরদেহের উপর রাখা হল। সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে আমরা এরোড্রোম ছাড়লাম. আমরা ধরে নিয়েছিলাম দিল্লী যাচ্ছি এবং সেখান থেকে আর একটি বিমানে কলকাতা যাব।

কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা পেরোবার পর পাইলটের কাছ থেকে জানলাম তাঁকে জলন্ধরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আম্বালা নয় কেন? তিনি আমাকে বললেন, আম্বালায় বিমান অবতরণের জায়গাটি ভাল নয়। কিন্তু জলন্ধরে পৌঁছে তিনি অবতরণ করবার কোন নির্দেশ পেলেন না। তিনি রেডিও মারফত নির্দেশ পাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। জলন্ধরের আকাশে আমরা পৌঁছেছিলাম সাড়ে বারোটায়। আধঘণ্টা জলন্ধরের উপর চক্কর দিয়ে দক্ষিণে ৫০ মাইল চলে গিয়ে আবার জলন্ধরের ওপর উড়ে এলাম। ফের জলন্ধর ছেড়ে আদমপুর বিমানবন্দরে এসে ২টোর সময় নামলাম।

২টোর সময়ে যখন নামলাম তখন সেখানে I N A প্লেনের পাইলটের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি সেখানে কেন? তাঁর দিল্লীতে যাবার কথা। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বললেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। তাঁকে তেল ভর্তি করতে হবে—কোথায় তিনি জানেন না—তারপর কলকাতা রওনা হবেন।

আমরা দুপুরে আড়াইটেয় আদমপুর ছেড়ে কানপুর সামরিক বিমানবন্দরে নেমে তেল ভর্তি করার পর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফের রওনা হলাম। কানপুরে আমরা সেখান থেকে কলকাতার দূরত্ব হিসেব করে দেখলাম আমাদের তখনও ৫৬০ মাইল পথ উড়ে যেতে হবে। অফিসারটি আমাকে বললেন, রাত নটার আগে কলকাতা পৌঁছানো যাবে না। তিনি অবশ্য তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, তাহলেও রাত নটার আগে পেঁাছানো সম্ভব হবে না। আমরা রাত নটা বাজতে ৫ মিনিট আগে কলকাতা পৌঁছই।

পণ্ডিত গুরুদত্ত বৈদের বিবৃতি পড়ে এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা আমার বিবৃতিতে বলেছি, সে দুটি মেলাবার পর নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি চোখে পড়ে—

১। ২২ তারিখ ভোর চারটের সময় ডঃ মুখার্জীর প্রথম হৃদ্‌রোগের আক্রমণের পর তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবার উপদেশ দেওয়া হয়নি।

২। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি। উপরন্তু ৭ ঘণ্টা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে।

৩। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি। নিয়ে যাওয়া হয় একটা ছোট ট্যাক্সিতে অসুবিধাজনক অবস্থায়।

৪। হাসপাতালে যাবার পরেও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু হয় নি।

৫। অসুস্থতার গুরুত্ব লক্ষ্য করা হয় নি।

৬। জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ভোরবেলাতেই ডঃ মুখার্জীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি সময় নষ্ট করেন, আসলে তিনি প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে মিঃ রায়নার সঙ্গে খোশগল্প করছিলেন।

৭। ডঃ মুখার্জীকে যন্ত্রণা কমানোর জন্য যে ঔষধ দেওয়া হয় সে ঔষধ তা তাঁর হৃদ্‌দৌর্বল্যের বিষয়টি পূর্বাপর বিবেচনা করে দেওয়া হয় নি।

৮। যখন ডাক্তাররা তাঁর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার কথাটি জানতে পারলেন, তখন তাঁরা অবিলম্বে একটি বুলেটিন প্রকাশ করে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি এবং রোগটি যখন হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত বলে জানা গেল, তখনও যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে বিষয়টি দেখা হয় নি।

৯। তাঁর মানসিক কষ্টের সমস্ত কারণগুলি দূর করা উচিত ছিল। তাঁর ঘরে পুলিসপ্রহরা রাখা এবং যাঁরা তাঁকে চিনতেন জানতেন তাঁদের একজনেরও সাহচর্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা এ সবই ছিল অন্যায়।

১০। প্লুরিসির চিকিৎসা তাড়াতাড়ি হয়েছে বলা যেতে পারে কিন্তু সে চিকিৎসা ছিল রোগের বহিঃপ্রকাশের ওপর নির্ভর করে। ডঃ মুখার্জীর শারীরিক অবস্থা বিচার করে এবং তাঁর শরীরের পূর্বতন স্বাস্থ্যের ইতিহাস বিচার করে চিকিৎসা হয় নি।

১১। যে ডাক্তার ডঃ মুখার্জীর চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁকে না জানিয়েই চিকিৎসার ভার তাঁর অধস্তনদের হাতে ছেড়ে দেন এবং স্ট্রেপটো-মাইসিন কম মাত্রায় দেবার ও ঘুমের ওষুধ না দেবার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন।

ঙ

কাশ্মীর সরকারের বিবৃতি প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত

ডাঃ এন. বি. খারে, এম. ডি.—

ডাঃ খারে ২৫শে জুন, ১৯৫৩ তারিখের একটি বিবৃতিতে বলেন ঃ—"সদ্য প্রয়াত এস. পি. মুখার্জীর অসুস্থতার বিষয়ে মেডিকেল রিপোর্টসহ কাশ্মীর সরকারের প্রদত্ত বিবৃতিটি যত্ন করে পড়ে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ডঃ মুখার্জীকে যে চিকিৎসা করা হয়, নিম্নলিখিত কারণে তা ভুল চিকিৎসা বলে আমার মনে হচ্ছে।

১। যে রোগী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে—বিশেষ করোনারী ধরণের—তাঁকে কখনই তাঁর বাসস্থান থেকে সরানো উচিত হয় নি। এসব ক্ষেত্রে নড়া-চড়া একেবারে নিষিদ্ধ।

২। ২২ তারিখে নার্সিংহোমে দুপুর ১২টায় যখন করোনারী আক্রমণ হয়েছে সিদ্ধান্ত হল, করোনারী আক্রমণের জন্য পরীক্ষিত ফলদায়ী ঔষধ অ্যামিনোফিলিন অবিলম্বে দেওয়া উচিত ছিল। রাত ১১টায় অর্থাৎ ১১ ঘণ্টা দেরি করে এটা দেওয়া হল কেন?

৩। ব্লাডপ্রেসার দেখা গেছল নেমে গেছে, অর্থাৎ ১০০।৮০ এবং অ্যামিনোফিলিন দেবার পর দেখা গেল আরও তা নেমে গেছে—৯০।৭০এ। কেন শক্ নিবারক চিকিৎসা করা হয় নি এবং ড্রিপ ব্যবস্থায় ইন্‌ট্রাভেনাস ডেক্‌স্‌ট্রান ইনজেক্‌শন করে ব্লাডপ্রেসার ওঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি?"

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ২৬শে জুন, ১৯৫৩

ডা. এন. বি. খারে ৩রা জুলাইয়ের একটি বিবৃতিতে আরও বলেন, "ডঃ এস. পি. মুখার্জীর মৃত্যু-বিষয়ে কাশ্মীর সরকারের দীর্ঘ এবং সংশোধিত বিবৃতিতে আমার পূর্বতন অভিযোগের কোন উত্তর তো দেওয়া হয়ই নি, বরং এতে এই ব্যাপারে নিগূঢ় তদন্তের জন্য সমস্ত জাতির পক্ষ থেকে দাবী জোরদার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।"

ডাঃ খারে বলেন, "আমার ২৫শে জুনের বিবৃতিতে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছিল, তার উত্তরে এই দীর্ঘ বিবৃতি ডাক্তারী শাস্ত্রমতে সেগুলি এড়িয়ে যাবার এক অসাধু প্রয়াস। তবে যে উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছিল, বিবৃতির মধ্যে প্রকট পরস্পর-বিরোধিতায় তা পণ্ড হয়েছে। চিকিৎসার ত্রুটিবিচ্যুতি যা আগে দেখিয়েছিলাম, তাছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করার আছে।"

ডাঃ খারে বলেন, "ডঃ মুখার্জীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আলি মোহম্মদের চিকিৎসাধীন থাকার কথা। রোগের একেবারে শুরু থেকে তিনি দেখছিলেন। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে ২২শে রাত ৯টার পর থেকে, যখন তিনি ব্লাডপ্রেসার মেপে দেখলেন নীচে নেমে গেছে, তারপর তাঁর নামের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যেল না। রাত নটার পর, রোগীর ভার গিয়ে পড়ল একজন হাউসসার্জন জে এন জুট্‌সির ওপর, যিনি আগে কখনও ডঃ মুখার্জীকে চিকিৎসা করেছেন বলে জানা যায় নি। সামরিক ডাক্তার এবং ডাঃ চোপরার সাহায্য যে চাওয়া হয়েছিল এবং যদিও

দেরিতে, তাতে এই তথ্য প্রমাণিত হয় যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা উপযুক্ত ছিল না এবং অবস্থা চিকিৎসা-রত চিকিৎসকের বিদ্যাবুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে গেছল। ডাক্তাররা যে মৃত্যুর পর এসে পেঁছান তাতে বোঝা যায় যে তাঁদের খবর দেওয়া হয় অনেক দেরিতে, দুপুর ১টায়, যখন অবস্থার অবনতি ঘটে তখন নয়। এমন হতে পারে যে ডাক্তাররা তাঁদের ডেরায় ছিলেন না অথবা অবস্থার গুরুত্ব তাঁদের সেভাবে জানানো হয় নি।"

ডাঃ খারে উল্লেখ করেন যে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "হাসপাতালের সদর ফটক থেকে ডঃ মুখার্জীকে চাকা-লাগানো চেয়ারে বসিয়ে লিফ্‌ট্‌ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং লিফ্‌ট্‌ থেকে আবার সেই চেয়ারেই তাঁকে নার্সিংহোমের বেড্‌এ নিয়ে যাওয়া হয়।" "এই রকম রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন এই চাকা-লাগানো চেয়ারের প্রয়োজনই হল তখন ডঃ মুখার্জীকে তাঁর বাংলোর ঘর থেকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে সেই চেয়ার ব্যবহার হল না কেন?" তিনি প্রশ্ন করেন। ডাঃ খারে আরও বলেন, "এতে বোঝা যায়, তাঁকে তাঁর ঘর থেকে গাড়ি পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এটা নিছক অবহেলা অথবা নির্দয়তাসূচক। এই ধরণের রোগীদের বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না, স্ট্রেচারে শয়ান অবস্থায় নিয়ে যেতে হয়।"

"বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দুপুর ১২টায় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং দুপুর ২টোয় জাস্টিস মুখার্জীকে তিনি একটি টেলিগ্রাম পাঠান। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, পরীক্ষাদি (প্যাথলজিকাল) করা হয় এবং হৃদ্‌রোগের আক্রমণ (করোনারী ধরণের) হয়েছে মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা হয়। টেলিগ্রামে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। অথচ কর্তৃপক্ষ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্থানান্তরকরণের কথা আত্মীয়স্বজনকে জানাবেন কিনা এবং মনে রাখবেন, হৃদ্‌রোগের আক্রমণের কথা তাঁরা বলেনেই নি যদিও তা আগেই নির্ণয় করা হয়েছিল।"

"২৩ তারিখ সকালের সংবাদপত্রে ডঃ মুখার্জীকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। বুলেটিনে বলা হয়েছিল ডঃ মুখার্জী ড্রাই প্লুরিসিতে আক্রান্ত হয়েছেন। ২২ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে ২টোর মধ্যে যখন স্থানান্তর ও রোগ নির্ণয় করা হল, সেই সময়, সংবাদদাতা সংস্থাগুলিকে স্থানান্তরকরণের সংবাদ দেবার আগেই কাশ্মীর সরকার জানতেন, ডঃ মুখার্জী গুরুতর এবং বিপজ্জনক রোগে, অর্থাৎ করোন্যারী জাতীয় হৃদ্‌রোগে ভুগছেন, যে রোগে সর্বদাই আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। তাহলে এটি প্রেস বুলেটিনে প্রকাশ করা হয় নি কেন? তাছাড়া জাস্টিস মুখার্জীকে কেন ২০ অথবা ২১ তারিখে ড্রাই প্লুরিসির আক্রমণের কথা, যেটা মোটেই একটি সাধারণ অসুখ নয়, এমন কি ২২ তারিখে হৃদ্‌রোগের আক্রমণের কথা, জানানো হল না কেন?"

ডাঃ খারে এরপর আরও বলেন যে, এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার জন্য সারা দেশময় যে দাবী উঠেছে তা সম্পূর্ণ ন্যায্য। (পি. টি. আই.)

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৫ই জুলাই, ১৯৫৩

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম. ডি.—

কাশ্মীর সরকারের প্রেস রিপোর্টে ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুবিষয়ক যে মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদত্ত হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন।

১। জাস্টিস শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে যে, তাঁর অসুস্থতার প্রথম ১০ দিনের মধ্যে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। অন্তত চিকিৎসার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। আরও ভাল ভাবে চিকিৎসার জন্য ডঃ মুখার্জীকে ভারতে পাঠানো উচিত ছিল অথবা ভারত থেকে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে দ্রুত সাহায্য চেয়ে পাঠানো উচিত ছিল।

২। ডঃ মুখার্জীকে অসুস্থতার প্রথম ১০ দিনের মধ্যেই আরও ভাল পরিবেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

৩। ২০শে জুন সকালবেলা তাঁর ড্রাই প্লুরিসি হয়েছে নির্ণীত হয়। জুন ২০-২১ রাত্রি তাঁর তীব্র অনিদ্রা ও অস্থিরতায় কাটে। এতৎসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, তারপর সারাদিন বা রাত্রে, ২২ তারিখে ভোর চারটেয় যখন তিনি গুরুতর হৃদ্‌রোগের আক্রমণে প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে যান, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সর্বাক্ষণিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রেস বিবৃতিতে দেখা যায়, জেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেবার পরেও সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কোন ডাক্তার আসেন নি।

৪। ডঃ মুখার্জীর রোগটি ছিল স্পষ্টতই করোনারী থ্রম্বসিস। ২০ তারিখ সকাল থেকে ২৩ তারিখ ভোর ৬টা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পরেও, কাশ্মীরে সরকারী মহলে ধারণা ছিল ডঃ মুখার্জী প্লুরিসি রোগে মারা গেছেন, করোনারী থ্রম্বসিসে নয়। সুতরাং ডাক্তার রোগটাকে করোনারী থ্রম্বসিস বলে নির্ণয় করেছিলেন, এ কাহিনী হয় সাজানো ব্যাপার নয়তো এ বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। এটি মনে হয় এই ঘটনা থেকে যে, যখন রোগীকে সকাল সাড়ে সাতটাতেই যথোপযুক্ত চিকিৎসা করে চাঙ্গা করে তুলতে হয়েছিল, তারপরে তাঁকে শহর থেকে ১০ মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হল, করোনারী রোগের ক্ষেত্রে যা এক অভাবনীয় ব্যবস্থা। ঘটনাবলীর বিবরণ দেখে বোঝা যায়, ডাক্তার কখনই এটি করোনারী রোগ বলে ধরতে পারেন নি এবং সমস্ত কিছু ঘটার পর এই রোগের কথা মনে হয়েছে।

৫। যে মানুষটি স্পষ্টই এই রকম গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে এমন লোকদের তত্ত্বাবধানে রাখা—যারা এরকম গুরুতর রোগ নির্ণয় করতে পারে না এবং নির্ণয় করার পরেও রোগীকে হাতুড়ের মত চিকিৎসা করে, এটি মারাত্মক ত্রুটি, যার ফলে নিশ্চিতভাবে রোগীর জীবননাশ ঘটল এবং এ ব্যাপারটি ক্ষমা করার বা অব্যাহতি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৬। চিকিৎসারত ডাক্তাররা বইয়ে করোনারী থ্রম্বসিসে যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা দেওয়া আছে তাই হুবহু উল্লেখ করে গেছেন কিন্তু মরফিন অ্যান্টি-কোয়াগুলান্ট দেওয়া

হয়েছিল কিনা তা একবারও উল্লেখ করেন নি। কোন উপযুক্ত চিকিৎসকই অ্যান্টি-কোয়াগুলান্ট ছাড়া করোনারী থ্রম্বসিসের চিকিৎসার কথা ভাবতে পারেন না। এবং মরফিন হচ্ছে এই রোগে আমাদের প্রধান প্রতিরক্ষা। পেথিড্রিন হচ্ছে এর অনুপযুক্ত বিকল্প, এবং সেটাও দেওয়া হয়েছে রাত ১টায়, আক্রমণের ১৮ ঘণ্টা পরে। সুতরাং এসব দেখে মনে হয়, চিকিৎসক এই রোগটি যে করোনারী থ্রম্বসিস তা বুঝতে পারেন নি, অথবা বুঝতে পারলেও এই রোগের আধুনিক চিকিৎসার বিষয়ে তিনি এমনই অজ্ঞ যে তাঁর হাতে করোনারী থ্রম্বসিসের রোগীকে চিকিৎসার ভার দেওয়া যায় না।

৭। যদি করোনারী থ্রম্বসিস বলেই রোগটি নির্ণীত হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসার সহায়ক হিসাবে অনেক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু তার কোনটাই করা হয় নি।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম, ডি.—

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী তাঁর মন্তব্যে বলেন, তাঁর মনে হয়েছে, চিকিৎসারত ডাক্তারদের রোগনির্ণয়ে ভুল হয়েছে। কাশ্মীর সরকারের প্রেস বিবৃতি পড়ে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করেন ঃ—

ড্রাই প্লুরিসি প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্লুরা পর্যন্ত স্ফীতিব্যাপ্তির পরোক্ষ পরিণতি। সেজন্য মনে হয় হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ কয়েকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। আসলে অসুখের আক্রমণজনিত স্ফীতির ব্যাপ্তি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়াতে কিছু সময় লাগে। ড্রাই প্লুরিসি নিউমোনিয়া রোগেরও পরোক্ষ পরিণতি হতে পারে। আর এই দুটি রোগই—নিউমোনিয়া এবং করোনারী—বিশেষ করে এই বয়সের রোগীর, যাঁর করোনারী রোগ-আক্রমণের পূর্ব ইতিহাস আছে—তাঁর ক্ষেত্রে খুবই গুরুতর।

তাঁর বন্দী-নিবাস থেকে দশ মাইল দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর বসা এবং অর্ধশয়ান অবস্থায় নাড়ীর গতি, ব্লাডপ্রেসার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মাপা হয় নি বলেই মনে হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে এগুলি দেখা খুবই উচিত ছিল।

চিকিৎসার বিষয়ে, ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ রিপোর্ট অনুযায়ী যদি এটা করোনারী রোগের আক্রমণই ছিল, তাহলে এই আঘাত সামলাবার সর্বোত্তম চিকিৎসা-ব্যবস্থা পেথিডিন ইন্‌জেক্‌শন নয়, মরফিন জাতীয় আরও শক্তিশালী ওষুধ, অবশ্য যদি সেসব ওষুধে প্রতিক্রিয়াজনিত সমস্যা না হয়। তারপর প্রোথ্রমবিন টাইমও (প্লাজমায় যে প্রোটিন থাকে, তা থ্রমবিন-এ পরিণত হয়ে রক্তকে জমাট করার সময়) গণনা করা উচিত ছিল এবং অ্যামিনোফিলিনের পরিবর্তে ইন্‌জেক্‌শন ও অ্যান্টি-কোয়াগুলান্ট ওষুধ দেওয়া উচিত ছিল। পেথিডিন দেওয়া হয়েছিল রাত ১টায়। পেথিডিন আদৌ দিতে হলে তা দেওয়া উচিত ছিল যখন হৃৎপিণ্ডের সংলগ্ন স্থানে যন্ত্রণা দেখা দিল তখনই। (প্রেস বিবৃতি অনুযায়ী) তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে নয়।

তারপর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার বিশদ কোন বিবরণ নেই। এই ধরনের রোগের আক্রমণে যখন ব্লাডপ্রেসার নেমে যায় এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, তখন সাধারণত ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সেজন্য মনে হয়, চিকিৎসায় নিশ্চয়ই কোথাও বিভ্রান্তি ঘটেছিল এবং এই রোগীর ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২৮শে জুন, ১৯৫৩

ডাঃ টি. এন. ব্যানার্জী—

পাটনা, জুন ২৩—জনসংঘ নেতা ও লোকসভার সদস্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানের বেদনাদায়ক সংবাদ শুনে ডাঃ টি. এন. ব্যানার্জী এম. এল সি. বলেন, 'সংবাদটি শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আজ সকালে সংবাদপত্রে পড়লাম, শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্লুরিসি হয়েছিল। কিন্তু কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে আমাদের দেশের এক মহান বুদ্ধিজীবী ও সত্যকারের দেশপ্রেমিক এই রোগে অত শীঘ্র মারা যাবেন, যে রোগ সময়ে ধরা পড়লে এবং আধুনিক ঔষধপত্রে ঠিকমত চিকিৎসা হলে শতকরা ৯৯ জন রোগীই আরোগ্যলাভ করে।'

—সার্চলাইট, ২৪শে জুন, ১৯৫৩

আজমেরের ডাক্তারদের মন্তব্য—

আজমের, জুন ২৯—ডাঃ অম্বালাল শর্মার নেতৃত্বে প্রখ্যাত চিকিৎসকদের একটি বোর্ড ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর পূর্বে যে চিকিৎসা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রেস-বিবৃতিটি প্রকাশ করেন ঃ

"ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর রাজনৈতিক প্রসঙ্গে না গিয়ে, আমরা কেবলমাত্র চিকিৎসক হিসেবে প্রেস-রিপোর্টে বিবৃত ডাঃ আলী মোহাম্মদের চিকিৎসার বিষয়ে মন্তব্য করছি।

"আমাদের মতে, করোনারী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাঁর শয্যা থেকে কোন কারণেই নড়ানো উচিত হয়নি এবং হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

"অ্যামিনোফিলিন এসব রোগে কেবল প্রথম অবস্থাতেই দেওয়ার কথা, কিন্তু এটা দেওয়া হয়েছিল ধমনীর ভিতর ইঞ্জেকশন করে, যখন ব্লাডপ্রেসার ছিল ১০০ এবং রোগী মুমূর্ষু অবস্থায়। নিয়মানুসারে, অ্যামিনোফিলিন ব্লাডপ্রেসার নামিয়ে দেয় এবং ঐ অবস্থায় এর ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন বিপজ্জনক হতে পারে। আমরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে খেলন, ল্যাকারনল, কার্ডিয়াজোল, কোরহর্ন প্রভৃতি আধুনিক এবং পরীক্ষিত ঔষধ ব্যবহার করে থাকি। মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসার জন্য প্লাজমা, ইনট্রাভেনাস গ্লুকোজ প্রভৃতি দেওয়া হয় না। মতের মিল হয়তো না হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখছি, আমরা এই ধরণের বহু রোগে

চিকিৎসা করে ফল পেয়েছি। যদি কোন রোগী অকস্মাৎ মারা যান তাহলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু যদি সময় পাওয়া যায়—যেমন ডঃ মুখার্জীর ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই পাওয়া গিয়েছিল,—আমরা জানি এই ধরণের চিকিৎসায় রোগীর জীবনরক্ষা করা সম্ভব।

"কারও প্রতি ব্যক্তিগত দোষারোগ না করে আমরা উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করছি এবং এ বিষয়ে অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মন্তব্য আহ্বান করছি।"

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩০শে জুন, ১৯৫৩

গোয়ালিয়রের ডাক্তারদের মন্তব্য—

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীইউ. এম. ত্রিবেদীর কাছ থেকে আমরা যে সংবাদ পাই, তাতে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ২২ তারিখ সকালে ডঃ মুখার্জীর যাই ঘটুক না কেন, তা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। তিনি আগে থেকেই অসুস্থ বোধ করছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ তাঁকে নার্সিং হোমে পাঠানোর কথা ভাবছিলেন।

১। তাঁর আত্মীয়স্বজনকে এবং সেই সঙ্গে ভারত সরকারকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির সংবাদ জানানোর তখনই ছিল সঠিক সময়। শ্রীইউ. এম. ত্রিবেদী তাঁকে অর্ধশয়ান অবস্থায় দেখেছিলেন এবং সে সময় তিনি যে কথাগুলি বলেন, তাতে স্পষ্টতই তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে অসহায়তা ও নৈরাশ্য প্রকাশ পেয়েছে, এবং যা তিনি বলেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

২। একজন সাধারণ লোকও বুঝতে পারত তাঁর শরীরের অবনতি ঘটছে। সরকারী হাসপাতালে তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন, বিকেল সওয়া ৫টা পর্যন্ত কোর্টে শ্রীত্রিবেদীকে জানানো হয় নি।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীত্রিবেদীকে তাঁর নিজের গাড়ীতে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি ডঃ মুখার্জীকে অর্ধশয়ান অবস্থায় দেখেন। তিনি হাসলেও তাঁকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল এবং চিঠিপত্রের বিষয়ে তিনি শ্রীত্রিবেদীর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন তা সহজ বিষয়ক ছিল না। তিনি তাঁর একটি হাত বুকের ওপর রাখেন, তাঁর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সেখানে যন্ত্রণা হচ্ছে। তখনও পর্যন্ত চিকিৎসার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

১৬ থেকে ২২শে জুন পর্যন্ত দৈনন্দিনের সংবাদ থেকে আমরা যেটুকু তথ্য পেয়েছি, তাতে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এটা নিশ্চিত ভাবেই ড্রাইপ্লুরিসির সঙ্গে করোনারী থ্রম্বসিসের আক্রমণ ছিল। মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ যেভাবে চিকিৎসা চালিয়েছেন তাকে শুধু তাচ্ছিল্যকর না বলে অপরাধজনক বলা যায়।

ড্রাইপ্লুরিসি প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্লুরা পর্যন্ত স্ফীতির পরোক্ষ পরিণতি। এবং সেজন্য মনে হয়, হৃৎপিণ্ডের প্রথম গোলযোগ কয়েকদিন আগেই শুরু হয়। আসলে স্ফীতির ব্যাপ্তি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়াতে কিছু সময় লাগে। ড্রাইপ্লুরিসি নিউমোনিয়া রোগেরও পরোক্ষ পরিণতি হতে পারে।

নিউমোনিয়া এবং করোনারী দুই-ই—বিশেষ করে এই বয়সের রোগীর যাঁর করোনারী রোগ আক্রমণের পূর্ব-ইতিহাস আছে—তাঁর ক্ষেত্রে খুবই গুরুতর।

করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হচ্ছে শয্যায় পূর্ণ বিশ্রাম এবং যন্ত্রণা উপশমের জন্য পূর্ণমাত্রায় মরফিন ইনজেকশন দেওয়া। তাঁর বন্দিনিবাস থেকে ১০ মাইল দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে তাঁর বসা এবং অর্ধশয়ান অবস্থায় নাড়ীর গতি, ব্লাডপ্রেসার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মাপা এবং নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রস্রাব পরীক্ষার কোন রেকর্ড নেই।

মরফিনের বদলে মরফিনের থেকে অনেক কমজোরী পেথিডিন ব্যবহার করা হয়, যার আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণা উপশমে কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই। যদি এই ইনজেকশন ইন্ট্রাভেনাস অর্থাৎ শিরার মধ্যে দেওয়া হয়, তাহলে এটা ব্লাডপ্রেসার নামিয়ে দেয়। যদি রোগী কর্মরত অবস্থায় বা দূরে থাকেন, সে সময় যদি এই রোগের আক্রমণ হয়, তাহলে রোগ পরীক্ষা করে তখনই ¼ অথবা ⅙ গ্রেণ মরফিন দেহত্বকের নিচে ইনজেকশন করা উচিত এবং অ্যামবুলেন্স করে নার্সিং হোম বা হাসপাতালে পাঠানো উচিত। তাঁর পোশাক পরিবর্তনে সাহায্য করা উচিত এবং প্রথম থেকেই দেখা উচিত রোগীর যেন কোন কারণেই পরিশ্রম না হয়। বাথরুমে যাবার জন্য তাঁকে কোনমতেই শয্যা থেকে ওঠানো হবে না, এমন কি বেডপ্যানের ওপরেও বসানো হবে না। একমাত্র পায়খানা করা অথবা পোশাক পরিবর্তনের জন্য তাঁকে শয্যায় অল্প তোলা যেতে পারে, কিন্তু যে কোন রকম অবস্থান পরিবর্তনের সময়ে দুজন সমর্থ ও শিক্ষিত নার্সের সাহায্য বাঞ্ছনীয়। রোগীর নিজের কাজ নিজে করার প্রবণতার ফল মারাত্মক হয়। রোগ দেখা দেবার কয়েকদিন পরে রোগীর অবস্থা যখন সঙীন হয়ে ওঠে তখন হাসপাতালে পাঠানো অপেক্ষা রোগ-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ। যে খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, এর বিপরীত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছিল।

বলা হয়েছে, অ্যামিনোফিলিন (পিউরিন থেকে প্রস্তুত) ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। এই ঔষধটিই দারুণ ক্ষতিসাধন করেছে, কারণ এটি অনেক দেরিতে দেওয়া হয়েছিল।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, "Occasionally an Intravenous Injection of Aminophyllin may cause alarming Symptoms, even death, in gross Myccardian Degeneration and Coronary Ocdersion, but is safe in uncomplicated Asthma and control the paroxysm (ডাঃ মজুমদারের Mat. Med. 1951 পৃষ্ঠা ৫৩৩, পংক্তি ৩৬-৩৯)

নাইট্রাইট এবং অন্যান্য ভ্যাসোডাইলেটর (vasodilator) করোনারী থ্রম্বোসিসে

ফলদায়ক নয় এবং দেওয়া উচিত নয় এই কারণে যে এতে সাধারণত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও ব্লাডপ্রেসার ভীষণভাবে নামিয়ে দেয় (এক্ষেত্রে যা আগে থেকেই অনেক নেমে গিয়েছিল)।

ডঃ মুখাজী' বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আলী মোহাম্মদের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি কি জানতেন না যখন দ্রুত ব্লাডপ্রেসার নেমে আসছে তখন অ্যামিনোফিলিন দিলে বিপরীত ফল হয় ?

যখন পূর্ণ' বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তখন কেন স্ট্রেচার ব্যবহার হয় নি ? কেন ডঃ মুখাজী'কে পায়ে হেঁটে যেতে দেওয়া হল ? আমবা গোয়ালিযরের চিকিৎসকেরা মনে করি এটি নিছক অমানবিকতা অথবা অবহেলা। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার রোগটিকে ড্রাই প্লুরিসি ভেবেছিলেন কিন্তু বিবৃতি দেবার সময়ে সঠিক রোগ—করোনারী থ্রম্বসিস নির্ণয় করেন—যদিও সেটি অনেক বিলম্বে হয়, ফলে কোন লাভ হল না।

আমরা ভারত সরকারকে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে খুঁটিয়ে দেখার জন্য এবং বেসরকারী চিকিৎসকদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি দিয়ে এই রোগ চিকিৎসার ব্যাপারটির খুঁটিনাটি বিষয়ে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং সমস্ত জাতিকে জানানো হোক, ডাঃ আলী মোহাম্মদ · ইচ্ছে করেই উক্ত ঔষধটি ব্যবহাব করেছেন কিনা এবং ঐভাবে ডঃ মুখাজী'র মৃত্যু ঘটিয়েছেন কিনা।

ডাঃ কমল কিশোর
গোয়ালিয়র ডাঃ এস. এস. সাপ্রে
বৈদ্য জি. এইচ মারাঠে

—অর্গানাইজার, ২৭শে জুলাই, ১৯৫৩

ঝ

তদন্তের দাবিতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির বিবৃতি

ডঃ এম আর জয়াকর—

পুণা, ২৩শে জুন—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী'র মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত, এই মন্তব্য করে ডঃ এম. আর. জয়াকর বলেন, "কিছুদিন আগে যাদের সঙ্গে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের দ্বারা, নিজের দেশের স্বদেশী সরকার কর্তৃক বন্দী হওয়া ও কারাগৃহে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু এক সংগ্রামী জীবনের আদর্শ' সমাপ্তি। আমরা আশা করব, আমেরিকান পর্যটকদের প্রশংসাপত্রে আত্মতুষ্টিমগ্ন ভারত সরকার সভ্য জগতের স্বীকৃত ন্যায় এবং আইনানুগ আচরণবিধির সব ধারা উল্লঙ্ঘনকারী তাঁদের কার্যকলাপের মারাত্মক তাৎপর্য এই মৃত্যুতে উপলব্ধি করবেন।"

—ইউ. পি. আই

(১০. ৮. ৫৩ তারিখের পত্র থেকে উদ্ধৃতি)

রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্ত যে অত্যন্ত

প্রয়োজন সে কথা আমি আগেই পরিষ্কার ভাবে বলেছি। এখন আমি রাজনীতি থেকে দূরে থাকি, সেজন্য আমার উক্তি দিল্লীতে পৌঁছবে কিনা বলা শক্ত। শ্যামাপ্রসাদজীর মৃত্যুর ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী সোচ্চার করার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক আমি এই কামনা করি।

—এম. আর. জয়াকর

শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন—

এলাহাবাদ, ১লা জুলাই—প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন শ্রীনগরে ডঃ এস. পি. মুখার্জীর মৃত্যুর তদন্তের দাবিকে আজ সমর্থন করেছেন।

এখানে অখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আহুত এক সভায় সভাপতি হিসাবে শ্রীট্যাণ্ডন বলেন, তিনি মনে করেন ডঃ মুখার্জীর চিকিৎসা "ঠিকমত হয় নি।" শ্রীট্যাণ্ডন আশা করেন যথোপযুক্ত তদন্তের পর ভারত সরকার সমস্ত ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেবেন।

শ্রীট্যাণ্ডন বলেন, ডঃ মুখার্জীকে কাশ্মীর যেতে দেওয়া এবং সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কাশ্মীর সরকারের উচিত ছিল।

শ্রীট্যাণ্ডন বলেন যে, তাঁর মন্তব্যের সমস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকেই তিনি বলছেন যে কাশ্মীরের ভিতরে কি ঘটছে ভারতবাসীর তা জানার উপায় নেই। সমস্ত অঞ্চলটি ঘিরে এক 'লৌহ যবনিকা' বিরাজ করছে। এমন কি সংবাদপত্রগুলিও যা জানে, তা প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদের নেই।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২রা জুলাই, ১৯৫৩

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ—

প্রজা সোস্যালিস্ট নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ গতকাল এখানে (লখনৌ) বলেন যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নেওয়ার বিষয়ে কাশ্মীর সরকারের অবহেলা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

প্রজা সোস্যালিস্ট দলের নেতা তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় যখন আজ সকালের সংবাদপত্রে দেখি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅতুল্য ঘোষের পত্রের উত্তরে জোর দিয়ে বলছেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চিকিৎসার ব্যাপারে কাশ্মীর সরকার কোন অবহেলা করেন নি।

"আমি জানি না প্রধানমন্ত্রীকে কি তথ্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমি যে সব তথ্য জানি তা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

"তিন দিন আগেই আমি কলকাতায় ছিলাম। তখন ডঃ মুখার্জীর পরিবার-বর্গের কাছে শোকসান্ত্বনা ও প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাবার সুযোগ ঘটে।

"সেই সময় জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখার্জী আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলেন যা প্রখ্যাত বিচারক বলেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ ঘটনা শুনে

আমার মনে কোন সন্দেহই নেই যে কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ শ্যামাপ্রসাদবাবুর স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা শুধু অবহেলা বললে ঠিক হবে না, অপরাধজনক অবহেলা করেছেন। আমি নিশ্চিত যে আরও একটু যত্ন নিলে এই মহান ভারতীয়র জীবন রক্ষা সম্ভব হত।"

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আরও বলেন, "আমার মনে হয় এরূপ একটি জাতীয় শোকাবহ ঘটনার পর ভারত সরকার অন্তত সমস্ত ব্যাপারটির একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারতেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এরূপ একটি বিতর্কিত বিষয়ে রায় দেওয়া এবং যাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল তাদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করা উচিত হয়েছে বলে মনে হয় না।"

শ্রীনারায়ণ বলেন, এই ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য প্রকাশ হওয়ার ফলে এক দারুণ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে যার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, তারিখ ৯।৭।৫৩

ডাঃ বি. সি. রায়—

কাশ্মীরে বন্দীদশায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গে যে জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছে, সে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ডঃ মুখাজীর মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর তদন্তের জন্য গণদাবীর উল্লেখ করে ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে এক বার্তায় জানিয়েছেন যে এই ঘটনার ফলে ডঃ এম. আর. জয়াকর, শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু বা সুপ্রীম কোর্টের কোনও বিচারক দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটির তদন্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থাতেই উত্তুঙ্গ জন-অসন্তোষ প্রশমিত হতে পারে। এই পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের ভার শ্রীনেহরুর হাতেই ডাঃ রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

ডঃ মুখাজীর চিকিৎসার ব্যাপারে কাশ্মীর সরকার চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলে জনসাধারণ যে অভিযোগ করছে সে বিষয়েও ডাঃ রায় প্রধান-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে জানা গেছে।

—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, তারিখ ১।৭।৫৩

শেখ আবদুল্লা ডাঃ রায়কে তাঁর জন্মদিনে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলেন, "আপনার শুভ জন্মদিনে আমার হার্দিক অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। শুনেছি আপনি শীঘ্রই ইউরোপ যাচ্ছেন। আপনাকে মনে করিয়ে দিই, আপনি এই বছরেই কাশ্মীরে আসবেন বলেছিলেন।

"আমি খুবই আনন্দ পাব যদি আপনি ইউরোপ যাবার আগেই এখানে আসেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের দুর্ভাগ্যজনক তিরোধানে যে সব সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, এই সংকট-কালে আপনি এখানে এলে সেগুলি দূরীভূত হবে। কারণ আপনি সরেজমিনে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি দেখার সুযোগ পাবেন।"

ডাঃ রায়ের উত্তরের ভাষ্য নিচে দেওয়া হল ঃ—

আজ ৩রা জুলাই আপনার তারবার্তা আমার কাছে পৌঁছল, যার বিষয়বস্তু তার আগেই সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেছে। আমার জন্মদিনে আপনার শুভেচ্ছা এবং আপনার রাজ্যে যাবার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর্র দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সময়কার ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য আপনি আমাকে যে সুযোগ দিতে চেয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ঐগুলি জানতে হলে আমাকে শ্রীনগর যাওয়া ছাড়াও, ডঃ মুখাজীর্র যেসব বন্ধুরা তাঁর অসুস্থতার সময়ে এবং মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে হবে। এইসব বন্ধুদের অনেকেই হয়তো এখন কাশ্মীরে নেই। আমি পরশু দিন ইউরোপ রওনা হচ্ছি, কারণ আমার ডাক্তারকে ১০ই জুলাইয়ের পর পাওয়া যাবে না। আমি ফিরেই ঐসব বন্ধু ও সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং কাশ্মীরেও যেতে পারি। এই কাজটির ভার নিতে আমি প্রস্তুত হলেও আমার মনে হয়, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন এমন কয়েকজন ব্যক্তিদের দিয়ে এই কাজটি করালে ভাল হয়। আমার এই পরামর্শ যদি মনঃপুত না হয়, তাহলে আমি যখন এই কাজ নিজে করব, তখন আপনি আমার সঙ্গে এইজাতীয় দু'একজন ব্যক্তিকে কাজ করতে দেবেন। আমার মনে হয়, এরূপ যৌথভাবে আমাদের সংগৃহীত তথ্যগুলি জনসাধারণকে আরও ভালভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবে। ইতিমধ্যে আমি বলব, ডঃ মুখাজীর্র অসুস্থতা ও মৃত্যু বিষয়ক সমস্ত কাগজপত্র, রোগ বিবরণের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিষয় যা আছে তা যত্ন করে রেখে দিন।

ডাঃ বি. সি. রায়ের পরবর্তী বিবৃতি—

ইউরোপ যাবার আগে ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে ডঃ মুখাজীর্র মৃত্যুর ব্যাপারে আর তদন্তের প্রয়োজন নেই ঃ এই মর্মে সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছিল সে বিষয়ে সাংবাদিকরা তাঁর মতামত বা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা ঠিক যে তিনি শ্রীনেহরুকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে ডঃ মুখাজীর্র মৃত্যুকালীন পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রথম যেসব সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছিল, পরবর্তী সংবাদে বিশেষতঃ কাশ্মীরের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে তা দূর হয়েছে। তিনি বলেন, "কিন্তু তার মানে এই নয় যে তদন্ত করার মত কোন বিষয় নেই।

ডাঃ রায় আরও বলেন, "ডঃ মুখাজীর্র মা যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন তা থেকে বহু বিষয়ে দেখা গেছে যার কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এখনও বলছি না আগে কখনও বলি নি যে ডঃ মুখাজীর্র মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করার কিছু নেই।"

ডাঃ রায় আরও বলেন, "আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, সারা দেশ জুড়ে যে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে আমি এ কাজের ভার নিলেই তাতে দেশবাসী সন্তুষ্ট হবে এ কথা আমি মনে করি না। সেজন্যই কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীকে আমি আমার

প্রথম তারবার্তায় জানাই, এই তদন্ত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা করা উচিত। বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসক হিসেবে আমি কাজে লাগতে পারি কিন্তু আমি খুশী হব যদি আরও কয়েকজনকে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন তাঁদের এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। এটা বিশেষতঃ এই কারণে যে, ডঃ মুখার্জীর পরিবারের সঙ্গে আমার গত কয়েক দশকের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে আমি কোন মন্তব্য (ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুকালীন চিকিৎসার ব্যাপারে) করলে কোন না কোন জায়গা থেকে তার প্রতিবাদ উঠতে পারে। সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শুধু আমার একার ওপর তদন্তের ভার দেওয়া উচিত নয়। শেখ আবদুল্লাকে প্রেরিত আমার সর্বশেষ তারবার্তায় (যার এক কপি শ্রীনেহরুকে পাঠিয়েছিলাম) আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, তদন্ত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের দিয়েই করানো উচিত। আমি এখনও সেই সিদ্ধান্তে অবিচল আছি।

—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৬ই আগস্ট, ১৯৫৩

শ্রীএইচ. ভি. কামাথ—

(নাগপুরে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে সংগৃহীত)

"এক পক্ষকাল আগে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থার যখন উন্নতি হল না, তখন কেন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল না? কখন তাঁর আত্মীয়দের খবর দেওয়া হল? চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হয়েছিল? স্বভাবতই এ ধরণের অনেক প্রশ্ন ওঠে।" শ্রীএইচ. ভি. কামাথ বলেন, প্রথম দৃষ্টিতেই চিকিৎসার ব্যাপারে যে মারাত্মক গোলযোগ চোখে পড়ে, তাইতেই অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি ওঠে। যেহেতু তিনি লোকসভার একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন, আমি প্রস্তাব করি এই তদন্ত করুক স্পীকার মনোনীত লোকসভার একটি সর্বদলীয় কমিটি, যে কমিটিতে কেবল কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা থাকবে না। লোকসভার অধিবেশন এখন না চললেও কমিটি সরাসরি নিয়োগ করা যেতে পারে।"

শ্রী কামাথ আরও বলেন, "যদি শেখ আবদুল্লার লুকোবার কিছু না থাকে, তাহলে এই তদন্তকে তাঁর স্বাগত জানানো উচিত। যদি তিনি বাধা দেন, তাহলে লোকসভার উচিত তাঁর এবং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা। আমি আশা করি প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অবিলম্বে কিছু করবেন। এখন আমাদের কর্তব্য, যে জাতীয় ঐক্যের জন্য ডঃ মুখার্জী এইরকম সাহসের সঙ্গে নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন, সেই ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করা।"

—ইউ. পি. আই
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, জুন ২৬

পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা—

কাশ্মীরে বন্দীদশায় যে অবস্থায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর্র মৃত্যু হয় সে ব্যাপারে তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগের দাবি জানিয়ে শ্রীপ্রেমনাথ ডোগরা কলকাতায় মঙ্গলবার দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ঘটনাবলী যা তিনি জেনেছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব সংবাদ তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি নিশ্চিন্ত যে এই ঘটনা (মৃত্যু) ইচ্ছাকৃত অবহেলাপ্রসূত। এর পেছনে যে রহস্য আছে তার সমাধান কেবলমাত্র ঐরূপ তদন্ত কমিশন গঠন করেই সম্ভব।

ডঃ মুখাজীর্র জীবনরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাকে সন্তোষজনক বলেছেন সেকথা উল্লেখ করে শ্রী ডোগরা বলেন, মন্তব্য প্রকাশ করার আগে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে স্থিরনিশ্চয় হওয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্তব্য ছিল। তিনি এবং অন্যান্য যেসব ব্যক্তি ডঃ মুখাজীর্র সঙ্গে শ্রীনগর সাব জেলে ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত ঘটনা জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কারো কাছ থেকে এ ব্যাপারে খোঁজখবব নেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। তিনি বলেন, "অতএব তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগ করাব ব্যাপারে তাঁকে চাপ দেওয়া এখন জনগণের কর্তব্য। একমাত্র এইভাবেই আমরা আমাদের প্রয়াত নেতার শোকগ্রস্তা মাতাকে কিছু সান্ত্বনা দিতে পারব।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, জুলাই ১৫

শ্রী এস. এস. মোরে—

(পুণায় ২৩. ৬. ৫৩ তারিখে এক জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে)

শ্রীএস. এস. মোরে (কৃষক ও শ্রমিক পার্টি) লোকসভায় ডঃ মুখাজীর্র অতুলনীয় অবদানেব কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "লোক-সভায় গণতন্ত্র রক্ষার কাজে তিনি ছিলেন কলোসাপ-সদৃশ এক অতিমানব।" স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেওয়া মাত্র কেন ডঃ মুখাজীর্কে মুক্তি দেওয়া হল না এটা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। তিনি আশা করেন, প্রধানমন্ত্রী যথাযথ তদন্ত কবে সমস্ত ব্যাপারটি দেশবাসীকে বুঝিয়ে বলবেন। শ্রীমোরে বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, তাঁকে বন্দী করার ব্যাপারে কাশ্মীর সরকারকে সৎ পরামর্শ দেওয়া হয় নি।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৫শে জুন, ১৯৫৩

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু—

শোলাপুরে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা, "যে

পরিস্থিতিতে শ্রীনগরে ডঃ মুখার্জীর মৃত্যু হয় সে ব্যাপারে সরকারী তদন্তের জন্য" ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

২৫শে জুন, ১৯৫৩'র অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী—

১৯৫৩'র ২৩শে জুলাই তারিখে কলকাতায় এক জনসভায় শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এম. পি. প্রদত্ত একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ ঃ—

যে পরিস্থিতিতে ডঃ মুখার্জীর মৃত্যু ঘটে সে ব্যাপারে তদন্তের দাবি করে প্রজা সোস্যালিস্ট নেতা শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এম. পি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আজকের স্বাধীন ভারতে কি ভাবে ডঃ মুখার্জীর মত নেতাকে বন্দীশালায় এবং ঐ পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়!

*   *   *

ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্তের দাবির সঙ্গে জনসাধারণের নিরাপত্তা আটক আইন প্রত্যাহারের জন্যও দাবি জানানো উচিত, তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন, 'সরকার যদি এ ব্যাপারে তদন্তের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে জনসাধারণ ধরে নেবে ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু রহস্য আছে যা সরকার গোপন করতে চান।'

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৪শে জুলাই ১৯৫৩

শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জী—

মুসৌরী, জুলাই ৯—শ্রীচ্যাটার্জী আজ রাত্রে এখানে এক বিবৃতিতে বলেন, অপরাধ-বোধ না থাকলে কোন সরকারেরই অন্তরীণ অবস্থায় কোন বন্দীর মৃত্যুর ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

শ্রীচ্যাটার্জী বলেন, বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়ার ফলে দিন দিন ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। এই মহান ভারতীয় যে সরকারের কার্য-ধারার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বাধা দিয়েছিলেন, সেই সরকারেরই অবহেলার ফলে তাঁর মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হয়েছে, এই কারণে জনসাধারণের মনে গভীর সংশয় জেগেছে। তদন্তের দাবির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সাড়া না দেওয়ায় এবং কাশ্মীর সরকারের অনুকূলে তাঁর একতরফা রায় ঘোষণার ব্যাপারে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ যে দৃঢ় মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক একমত। দেশ এই রায় মানতে রাজী নয়।

শ্রীচ্যাটার্জী বলেন, তদন্তের দাবি কেবল তথাকথিত সাম্প্রদায়িকরা নয়, শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ বি. সি. রায় এবং ডাঃ জয়াকর-এর মত বিখ্যাত ব্যক্তিরাও করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বোঝা উচিত যে

জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ গভীরভাবে গেঁথে গেছে যে শ্রীনগরে ডঃ মুখার্জীকে কারারুদ্ধ করার ব্যাপারে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর সরকারও সমানভাবে দায়ী।

পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই আমি এই মন্তব্য করছি যে প্রাথমিক দৃষ্টিতে (প্রাইমা ফেসি) এটি মারাত্মক অবহেলার পরিণতি। শেখ আবদুল্লাও এটি বুঝেছেন, তা না হলে তিনি ডাঃ রায়কে শ্রীনগরে এসে এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য বলতেন না।

সরকারের উচিত অবিলম্বে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা, কারণ ডাঃ রায় বেশ কিছুকালের জন্য বাইরে যাচ্ছেন।

শিরোমণি অকালী দল—

[শিরোমণি অকালী দলের প্রেসিডেন্ট মাস্টার তারা সিংয়ের সভাপতিত্বে শিরোমণি অকালী দলের ওয়ার্কিং কমিটির অমৃতসরে ১২.৭.৫৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃতি।]

অবিলম্বে স্বাধীনচেতা ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং খোলাভাবে তদন্তের যে দাবী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মাতৃদেবী করেছেন, তার প্রতি শিরোমণি অকালী দল তাদের দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে।



শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীজওহরলাল নেহরুর মধ্যে পত্র-বিনিময়

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আমি রাজ্য কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন সদস্যের এবং সেই সঙ্গে আমারও মানসিক অবস্থা আপনার কাছে নিবেদন করছি।

এখন পর্যন্ত যেসব খবর পাওয়া গেছে তাতে আমরা জেনেছি প্রয়াত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রোগের গুরুতর অবস্থার কথা কাশ্মীর সরকারের কর্তৃপক্ষকে ২২ তারিখ ভোরবেলায় জানানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর পরিবারবর্গকে অথবা তাঁর চিকিৎসক ডাঃ বি. সি. রায়কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন খবর পাঠালেন না। কাশ্মীর সরকারকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মনে হয়।

যেভাবে ডঃ মুখার্জীর বাড়িতে খবরটি দেওয়া হয় তা অত্যন্ত আপত্তিকর। টেলিফোনে জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখার্জীকে একটি সংবাদে জানানো হয়—ডঃ এস. পি. মুখার্জী মারা গেছেন। এটি বলা হয় চাঁচাছোলা ভাবে এবং ঐসঙ্গে আর কোন খবর দেওয়া হয় নি। মনে হয় বৃদ্ধা জননীর মাসসিক অবস্থার কথা চিন্তা করা হয় নি। আপনি জানেন প্রয়াত ডঃ মুখার্জী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং সারা ভারতে না হলেও অন্ততঃ আমাদের রাজ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁকে কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নি, তিনি যে অসুস্থ ছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাকেও কোন খবর দেওয়া হয়নি, বন্দী অবস্থায় পীড়িত থাকাকালীন

তাঁকে দেখে যাবার জন্য তাঁর পরিবারের লোকজনের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয় নি। আমাদের রাজ্যে জন-অসন্তোষ খুবই উত্তুঙ্গে। আমি আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দিতে চাই না, তবে আমার মনে হয়, ডঃ জয়াকর বা শ্রীকুঞ্জরু অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের মত বেসরকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা কিছু একটা তদন্তের ব্যবস্থা হলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। অবশ্য এই পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে সেটা আপনিই সব থেকে ভাল জানেন।

আমি এই চিঠির একটি প্রতিলিপি ডাঃ বি. সি. রায়কে পাঠাচ্ছি।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু — আপনার অন্তরঙ্গ
প্রধানমন্ত্রী — অতুল্য ঘোষ
ভারত সরকার, নয়া দিল্লী

নয়া দিল্লী
জুলাই ২, ১৯৫৩

প্রিয় অতুল্যবাবু,

আপনার ২৯শে জুন তারিখের চিঠি আমি পেয়েছি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুতে বাংলায় যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তা আমি জানি। আমার মনে হয় তার কারণ প্রধানতঃ প্রকৃত ঘটনা না জানার জন্য। আমি এই ব্যাপারগুলি সযত্নে পর্যালোচনা করেছি এবং আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, কাশ্মীর সরকারের পক্ষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সৌজন্য ও বিবেচনা দেখানোর ব্যাপারে তাঁদের যতটুকু সাধ্য ছিল তা তাঁরা করেছেন। কাশ্মীর সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামলাল সরফ কতকগুলি তথ্যসহ একটি বিবৃতি দিয়েছেন, তা আজকের সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। এটা নিশ্চয় আপনার নজরে পড়বে। আমার মতে কাশ্মীর সরকারের মনোভাব কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিল একথা বলা খুবই অন্যায় হবে। তাঁদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাশ্মীরে আটক হওয়ার প্রথম থেকেই ডঃ মুখার্জীর প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করা হয়। একটি সুন্দর বাংলো তাঁর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাস করার জন্য সারা ভারতে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কেউ পেতে পারেন না। বাংলোটির সামনেই ছিল লেক এবং কাছেই ছিল একটি বিখ্যাত মোগল গার্ডেন। যাঁরা ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে ছিলেন অথবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কাশ্মীর সরকার ডঃ মুখার্জীর সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

২২ তারিখে যখন তিনি সামান্য অসুস্থ বোধ করেন, তখনও কেউ সন্দেহ করে নি যে তাঁর পীড়া গুরুতর ছিল। যাতে আরও ভালভাবে তাঁর চিকিৎসা হয়, সেজন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার ডাক্তাররা তাঁর পরিবার-

বর্গকে খবর পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ মুখার্জী নিজেই তাঁদের খবর দিতে নিষেধ করেন এবং তিনি কলকাতায় তাঁর পরিবারবর্গের তিনজনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। এই টেলিগ্রামগুলি যে পাঠানো হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি মূল টেলিগ্রামগুলির ফটোস্টাট কপি দেখেছি। আপনি বুঝবেন, এ ব্যাপারে কাশ্মীর সরকার বা ডাক্তারের দোষের কিছু নেই। পরে ঐদিনই সন্ধ্যায় ডঃ মুখার্জীর কৌঁসিলী ত্রিবেদী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, কথাবার্তা বলেন ও তাঁকে কিছু কাগজপত্র দেখান। তখনও পর্যন্ত কেউ কোনরকম বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে এমন সন্দেহ করে নি। রাত ১১টা নাগাদ তাঁর শরীরের অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসকরা সর্বদাই হাজির ছিলেন। অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়, তারপর আবার খারাপ হতে থাকে। কাশ্মীর সরকারের এক মন্ত্রীকে খবর পাঠানো হয়। তিনি শোনামাত্র তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে ভারতীয় সৈনিক হাসপাতালে ছুটে যান ডাক্তার আনতে। শ্রীনগরে সব কিছুই বড় দূরে দূরে। ডাক্তাররা যখন এসে পৌঁছলেন তখন শ্যামাবাবুর একেবারে শেষ অবস্থা বা মারাই গেছেন।

আমি জানি না এর চেয়ে আর কি করা যেতে পারত। বলা যেতে পারে, সংবাদটি রাত্রে আরও কিছু আগে দেওয়া যেত। কাশ্মীর সরকারের কেউই মধ্য-রাত্রির অনেক পরেও এই গুরুতর পরিণতির কথা জানতে পারেন নি।

জাস্টিস মুখার্জীকে টেলিফোনে যেভাবে সংবাদটি জানানো হয় আপনি তার উল্লেখ করেছেন। আসলে টেলিফোনে যোগাযোগ করতেই অনেকক্ষণ সময় চলে যায়। যখন সেটা পাওয়া গেল, শুনতে না পাওয়ার জন্য সরাসরি কথা বলা সম্ভব হল না। মন্ত্রী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর, যিনি শ্রীনগর থেকে টেলিফোন করছিলেন, শেষ পর্যন্ত দিল্লীর টেলিফোন কর্মীকে কলকাতার টেলিফোন অপারেটারকে খবরটি জানাতে বলেন, সে-ই জাস্টিস মুখার্জীর কাছে সংবাদটির পুনরুক্তি করে। আপনি ভালভাবেই জানেন, দুবার 'রিলে' করে পাঠানোর ফলে মূল সংবাদের কি অবস্থা ঘটে। ফলে এটির বিকৃতি ঘটে এবং সংক্ষিপ্ততম আকারে সংবাদটি দেওয়া হয়। আমার সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদ ধরের কথা হয়েছে। তিনি একটি দীর্ঘ বার্তা পাঠিয়েছিলেন বলেছেন, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তা খণ্ডিত বা বিকৃত ভাবে পৌঁছেছে। আমি নিশ্চিত যে জাস্টিস মুখার্জীকে যদি সমস্ত ব্যাপারটি জানানো হয়, তাহলে তিনি বুঝবেন যে আদৌ কোন অসৌজন্য প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রীরা শ্যামাবাবুর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা তাঁকে শীঘ্রই মুক্তি দেবার কথা ভাবছিলেন।

আপনার অন্তরঙ্গ

স্বাঃ জওহরলাল নেহরু

শ্রীঅতুল্য ঘোষ
সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি
৫৯-বি চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০

ট

লেডি মুখার্জী এবং শ্রীজওহরলাল নেহরুর মধ্যে পত্রবিনিময়

পত্র নং ৪৯৯—পি. এম.—নয়া দিল্লী, জুন ৩০, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জী,

কিছুদিন আগে যখন আমি জেনেভা থেকে কায়রো রওনা হচ্ছি, সে সময়ে আপনার পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের সংবাদ শুনে মর্মাহত হই। সংবাদটি আমায় আঘাত হেনেছিল, কারণ রাজনীতিতে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালওবাসতাম। আপনি তাঁর মা, আপনার কাছে এ আঘাত অত্যন্ত বেশী এবং আপনার দুঃখ লাঘব করার মত কোন ভাষা আমার নেই।

আমি কায়রো থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে আপনাকে আমার গভীরতম সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানাতে বলি। শ্যামাবাবুর মৃত্যু আমার কাছে আরও দুঃখের বিশেষ করে এই কারণে যে এটা ঘটল তাঁর বন্দীদশায়। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে যখন আমি কাশ্মীর যাই, তখন আমি বিশেষ করে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাঁর শরীর কেমন আছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। আমাকে জানানো হয়, তাঁকে কোন কারাগারে না রেখে শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি প্রাইভেট বাংলোতে রাখা হয়েছে। আমি দেখলাম কাশ্মীর সরকার তাঁকে যথাসম্ভব আরাম ও সুবিধা দেবার জন্য তৎপর এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভাল আছে। আমি তখন এ খবর শুনে সন্তুষ্ট হই। আসলে আমি আশা করেছিলাম, কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় শ্যামাবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

কিন্তু তা হবার নয় এবং সেইজন্যই আঘাত ও দুঃখ আরও বেশী করে লাগে।

আমার মনে হয়, মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতায় আর কিছু করার ছিল না এবং আয়ত্তাতীত পরিস্থিতির কাছে আমাদের হার মানতে হয়।

শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহোদয়া, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও আমার দুঃখ নিবেদন করছি। আপনার কোন সেবায় আমার প্রয়োজন হলে আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে জানাবেন।

ভবদীয়

স্বাঃ জওহরলাল নেহরু

৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীনেহরু,

আপনার ৩০শে জুন তারিখের চিঠি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার কাছে ২রা জুলাই তারিখে পাঠিয়েছেন।

আপনার সান্ত্বনা ও সমবেদনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রিয় সন্তানের তিরোধানে সমস্ত জাতি শোকমগ্ন। সে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে। আমি তার মা, আমার কাছে এই দুঃখ এত গভীর ও পবিত্র যে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি আপনার কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা পাবার জন্য এ চিঠি লিখছি না। আপনার কাছে আমার যেটা দাবি সেটা হচ্ছে ন্যায়বিচার। আমার পুত্র বন্দীদশায় মারা গেছে—যে বন্দীদশার আগে কোন বিচার হয় নি। আপনার চিঠিতে আপনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কাশ্মীর সরকারের যা যা করা উচিত ছিল সবই করেছিল। কাশ্মীর সরকার আপনাকে যে সংবাদ দিয়েছে তারই ভিত্তিতে আপনি ও-কথা বলেছেন।

আমি প্রশ্ন করি, যেসব লোকদের নিজেদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কথা, তাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই সংবাদের মূল্য কি? আপনি বলেছেন, আমার পুত্রের বন্দিত্বকালে আপনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তার প্রতি আপনার ভালবাসা ছিল তাও বলেছেন। আমি জানি না, আপনার তার সঙ্গে দেখা করে তার স্বাস্থ্য ও তার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে কি বাধা ছিল?

তার মৃত্যু রহস্যাবৃত। এটা কি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আঘাতজনক নয় যে তার বন্দী হওয়ার পরে তার প্রথম সংবাদ কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে আমি তার মা যা পেলাম তা হোল যে আমার ছেলে আর নেই, এবং সে সংবাদও পেলাম সব শেষ হয়ে যাবার দুই ঘণ্টা পরে? আর কি নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত ভাবেই না সংবাদটি পাঠানো হয়েছিল! হাসপাতালে ভর্তি করার পর আমার পুত্র যে টেলিগ্রাম করেছিল সেটাও আমাদের কাছে এসে পৌঁছল তার নিদারুণ মৃত্যুসংবাদের পর। বন্দী হওয়ার পর থেকেই যে আমার পুত্রের শরীর খারাপ যাচ্ছিল এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ আছে। সে পর পর কয়েকবারই এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিতভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশ্মীর সরকার অথবা আপনার সরকার কোন সংবাদই আমাকে বা আমাদের আত্মীয়বর্গের কাউকে পাঠায় নি কেন?

যখন তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল, তখনও তারা খবরটি আমাদের বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অবিলম্বে জানানো প্রয়োজন বোধ করে নি। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের পূর্ব ইতিহাস জানার এবং তার সেবা ও প্রয়োজনের সময়ে আপৎকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে কোন গা করে নি। তার পুনঃ পুনঃ অসুস্থতার ধাক্কাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এর ফল হল মারাত্মক। আমি স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিপন্ন করতে পারি, আমার পুত্রের নিজের কথাতেই, ২২ তারিখ ভোরবেলায় সে অবসন্ন বোধ করেছিল। আর সরকার কি করেছিলেন? চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে অযথা বিলম্ব, অত্যন্ত অবিবেচকের মত ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে পাঠানো, হাসপাতালে তার কাছে তার দুই সহবন্দীকেও থাকতে না দেওয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন আচরণের কয়েকটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

শ্যামাপ্রসাদের চিঠিগুলি থেকে এলোমেলো ভাবে কতকগুলি বেছে নিয়ে, তার থেকে আবার বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু মন্তব্য উদ্ধার করে "তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল" বলে কাশ্মীর সরকার এবং তাদের ডাক্তারদের দায়-দায়িত্ব কিছুতেই কোন ভাবেই এড়ানো বা লাঘব করা যাবে না। উদ্ধৃতিগুলির সার্থকতা কি? কেউ কি সত্যি বিশ্বাস কববে যে তার মত লোক আত্মীয়স্বজনবর্গ থেকে দূরে বন্দীদশায় থেকে কখনও তার অসুবিধার কথা বা শারীবিক অসুস্থতার কথা চিঠিতে লিখে জানাবে? সরকারের দায় ছিল অসীম এবং গুরুতর।

তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ যে তারা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়েছে। আপনি বন্দীদশায় আমার আদরের শ্যামাপ্রসাদকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেছেন। এটা খতিয়ে দেখার বিষয়। কাশ্মীর সরকার তার পরিবারবর্গের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান করতে দেওয়ার ভদ্রতাটুকু দেখায় নি। চিঠিগুলি অনেক দিন পর্যন্ত আটকে রাখা হত এবং কতকগুলি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গেছল। বাড়ির খবরের জন্য, বিশেষ করে তার রুগ্ন কন্যার জন্য এবং এই অধমের জন্য দুশ্চিন্তা তাকে পীড়া দিত। আপনি শুনে অবাক হবেন কিনা জানি না, আমরা ১৫ই জুন তারিখের লেখা চিঠিগুলি পেলাম ২৭শে জুন, সেগুলি কাশ্মীর সরকাব ২৪শে অর্থাৎ তার মরদেহ পাঠাবার একদিন পরে ডাকে দিয়েছিলেন। সেই প্যাকেটে আমার এবং এখানকার অন্যান্যদের শ্যামাপ্রসাদকে লেখা চিঠিও আমাদের কাছে ফেরত এসেছে। এগুলি ১১ই এবং ১৬ই জুন শ্রীনগরে পৌঁছলেও তাকে দেওয়াই হয় নি। এটি মানসিক নির্যাতন করার নিদর্শন। সে বারংবার হেঁটে বেড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা চেয়েছিল। এর অভাবে সে অসুস্থ বোধ করছিল। কিন্তু তাকে বার-বারই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এটা কি শারীরিক নির্যাতনের একটা উপায় নয়? আপনি যখন আমাকে বলেন, "তাকে কোন কারাগারে নয়, শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি আলাদা বাংলোতে রাখা হয়েছে", তখন আমার মন বিস্ময়ে এবং অপমানে ভরে ওঠে। একটি সামান্য প্রাঙ্গণওলা ক্ষুদ্র বাংলোয় দিবারাত্র একদল সশস্ত্র রক্ষীদের পাহারায় বন্দী থাকা—এই হল তার সেখানকার জীবন। সোনার খাঁচা হলে বন্দী সুখী হয়, এ কথা কি যথার্থ বলে মানা যায়? এ ধরণের নির্লজ্জ প্রচার আমার শুনলেও গা ঘিনঘিন করে। আমি জানি না তার কি চিকিৎসা বা সেবাযত্ন হয়েছিল। আমি শুনেছি সরকারী খবরগুলি সব পরস্পর-বিরোধী। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা তাঁদের মন্তব্যে বলেছেন, এটা আর কিছু না হোক চূড়ান্ত অবহেলার নিদর্শন। ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আমি এখানে আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য বিলাপ করছি না। স্বাধীন ভারতের এক নির্ভীক সন্তান বন্দী অবস্থায় বিনাবিচারে চরম শোচনীয় এবং রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই মহান প্রয়াত বীরের মা হিসেবে

আমি অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করছি। যে জীবন চলে গেছে তা আর কিছুতেই আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না তা আমি জানি। কিন্তু যা আমি অবশ্যই চাই তা হল স্বাধীন ভারতে এই যে বিরাট শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তার প্রকৃত কারণগুলি এবং আপনার সরকারের তাতে কি ভূমিকা ছিল, ভারতের জনগণ নিজেরা তার বিচার করুক।

কোথাও যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করে থাকে,—যত উঁচুপদেই সে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হোক্ না কেন,—তার সঠিক বিচার হোক এবং জনগণ সতর্ক হোক যেন স্বাধীন ভারতে আর কোন জননীকে আমার মত দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় ও দুঃখে অশ্রুপাত করতে না হয়।

আপনি দয়া করে বলেছেন, আপনার কাছে কোন সেবা বা সাহায্যের দরকার হলে যেন নির্দ্বিধায় আপনাকে জানাই। আমার এবং ভারতের জননীদের পক্ষ থেকে এটাই আমার দাবি, সত্যকে উদ্ভাসিত করার কাজে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।

চিঠি শেষ করার আগে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করব। কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদের যেসব জিনিস ফিরত পাঠিয়েছেন তার ভিতর তার ব্যক্তিগত ডায়েরী এবং হাতে লেখার কাগজপত্র আসে নি। বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়েছে তার প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিলাম। আপনি যদি কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলি এবং ডায়েরীটি উদ্ধার করে দেন, তাহলে বিশেষ অনুগৃহীত থাকব। এগুলি নিশ্চয় তাদের কাছে আছে।

আশীর্বাদান্তে

আপনার শোকমগ্ন
যোগমায়া দেবী

নয়া দিল্লী
৫ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জী,

আপনার ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিটি এইমাত্র আমার কাছে এসেছে।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে জননীর দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা কি হয়, তা আমি ভালই বুঝতে পারি। যে আঘাত আপনি পেয়েছেন, আমার কোন কথাতেই তার উপশম হবে না।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বন্দীদশা এবং তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান না করে আমি আপনাকে লিখতে সাহস করি নি। তার পরেও যাঁদের কিছু প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ

করেছি। আমি এইটুকু বলতে পারি যে রহস্যের কিছু ছিল না এবং ডঃ মুখার্জীকে যে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে আমার পরিষ্কার ও যথার্থ (clear and honest) ধারণা জন্মেছে।

কাশ্মীরে চিঠিপত্র বিমানে যায়, কিন্তু আবহাওয়ার গোলমালে বিমান চলাচল খুবই অনিয়মিত এবং কখনও কখনও এক সপ্তাহ বা তারও বেশী বন্ধ থাকে। সত্য বলতে কি বর্তমানেই এক সপ্তাহের ওপর বিমান চলাচল বন্ধ আছে, যে কারণে আমি যে সব জরুরী চিঠি পাঠিয়েছি সেগুলি পেঁছিতে দেরি হচ্ছে।

জেলে আমার দশবছর জীবন কেটেছে এবং ভারতের নানা ধরণের অসংখ্য কারাগারে আমাকে থাকতে হয়েছে এবং সেই জন্যেই বন্দীর মনের অবস্থা কি হয় এবং বন্দীদশার অবস্থা সাধারণত কি রকম হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে।

ডঃ মুখার্জী হঠাৎ যেদিন মারা গেলেন, কাশ্মীর সরকারের এক মন্ত্রী জাস্টিস মুখার্জীকে টেলিফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দীর্ঘসময় ধরে চেষ্টা করেও লাইন পান নি এবং তার পরেও সরাসরি কথা বলতে পারেন নি। দুজন টেলিফোন অপারেটর মারফৎ তাঁর কথা 'রিলে' করে পাঠান হয় এবং নিঃসন্দেহে সেগুলি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পেঁছেছিল।

ডঃ মুখার্জীর ডায়েরী এবং অন্যান্য কাগজপত্রর জন্য আপনি যে অনুরোধ করেছেন সেটি বক্সী গোলাম মহম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি নিশ্চিত তাঁর কাছে কোন কাগজপত্র যদি থেকে থাকে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সেগুলি পাঠিয়ে দেবেন।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা
৯ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার ৫ই জুলাইয়ের চিঠি আমার কাছে ৭ তারিখে পেঁছেছে।

আপনার চিঠিটি গোটা পরিস্থিতির ব্যাপারে এক দুঃখজনক ভাষ্য। আপনার মনোভাব রহস্য অনাবৃত করার ব্যাপারে সাহায্য না করে বরং রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। আমি প্রকাশ্য তদন্ত চেয়েছিলাম, আপনার পরিষ্কার ও যথার্থ ধারণা জানতে চাই নি।

সমস্ত ব্যাপারটির বিষয়ে আপনার মনোভাব এখন সর্বজনবিদিত। ভারতের জনগণকে এবং আমাকে, শ্যামাপ্রসাদের মাকে, এর যাথার্থ্যে বিশ্বাস করাতে হবে। বহু লোকের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। যা দরকার তা হোল অবিলম্বে প্রকাশ্য ও অপক্ষপাত তদন্ত।

আমার চিঠিতে উল্লিখিত নানা বিষয়ের উত্তর পাই নি। আমি আপনাকে পরিষ্কার জানিয়েছিলাম যে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিপন্ন করার মত নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রমাণ আমার কাছে আছে। আপনি সেগুলি জানতে বা দেখতে আগ্রহী নন। আপনি জানিয়েছেন যে, "যাদের প্রকৃত ঘটনা কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল তাদের কয়েকজনকে" জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এটা আশ্চর্য লাগে যে আমরা—তার পরিবারবর্গ যে বিষয়টির ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারি তা গণ্য করা হল না। এবং এতৎসত্ত্বেও আপনি আপনার ধারণাকে 'যথার্থ' বলেছেন।

কাশ্মীর বিমান ডাকের অনিয়মিত চলাচলের যে কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা এখানে খাটে না। তাতে বহুক্ষেত্রে অপরিমিত বিলম্ব এবং চিঠিপত্রের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা হয় না। আপনি যদি আমার চিঠিটি মন নিয়ে যত্ন সহকারে পড়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেন, আমি নিশ্চিত যে তাহলে আপনি এই রকম বাজে অজুহাত দিতে ইতস্তত করতেন। আমাদের কাছে যে চিঠিগুলি আছে তার খামের ওপর ডাকঘরের ছাপের তারিখগুলিই নিশ্চিতভাবে বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করছে।

জেলে আপনার অভিজ্ঞতার কথা সকলেই জানে। এটা এক সময়ে আমাদের বিরাট জাতীয় গর্ব ছিল। কিন্তু আপনি কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিদেশী শাসনাধীনে আর আমার ছেলে বিনা বিচারে বন্দীদশায় মৃত্যুবরণ করল এক জাতীয় সরকারের আমলে। যদি ব্রিটিশ শাসনাধীনে কারান্তরালে এইরকম শোচনীয় এবং রহস্যময় সমাপ্তি ঘটত তাহলে কি হত?

আপনাকে আর বেশি কিছু লেখা বৃথা। আপনি প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন। আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি কাশ্মীর সরকারকে দায়ী করছি। আপনার সরকারকে এই অপকর্মের অংশীদার হিসেবে অভিযুক্ত করছি। আপনি আপনার হাতে যা বিপুল ক্ষমতা তার সব কিছু দিয়ে বেপরোয়া প্রচার চালাতে পারেন, কিন্তু সত্য নিজে তার প্রকাশের পথ খুঁজে নেবেই, এবং একদিন আপনাকে ভারতবাসীর কাছে এবং স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

আমি আমাদের পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পেশ করছি। প্রধান মন্ত্রী যখন অকৃতকার্য হন, তখন ভারতবাসীই বিচার করুক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।

আপনার শোকমগ্না
যোগমায়া দেবী

বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে পত্রবিনিময়

১৯৫৩র ২৮শে জুন তারিখে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
বক্সী গোলাম মহম্মদকে প্রেরিত তারবার্তা

Bakshi Gulam Mohammed
Home Minister
Srinagar (Kashmir)

Do please send immediately Syamaprasad Mookerjee's personal diary and manuscript writings not sent with the body and any other personal belongings that are still there.

Rama Prasad Mookerjee.

ঐদিনই উপরোক্ত তারবার্তার মর্মে লিখিত পত্র

77, Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta-25.
The 28th June, 1953.

Dear Mr. Gulam Mohammed,

I have sent the following telegram to you to-day :

"Do please send immediately Syamaprasad Mookerjee's personal diary and manuscript writings not sent with the body and any other personal belongings that are still there."

Syama Prasad had been regularly keeping a diary and it was with him while in detention at Srinagar. It is a black bound book. He had also been writing some literary work there. The diary and the manuscript writings have not been sent with his other belongings that came with his body. There may be other personal articles still lying at Srinagar.

I earnestly request you to send immediately all those articles, particularly the diary and the manuscript without fail. It is needless to explain the value we attach to these articles.

Your personal attention to this matter will be much appreciated.

Yours sincerely,
Sd/- Rama Prasad Mookerjee

কাশ্মীরের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের
২৯শে জুন তারিখে প্রেরিত তারবার্তা

X R SRINAGAR KMR 29 RAJ 37
Justice Rama Prasad Mookerjee, Calcutta.
IS/2374/D/53, Your telegram stop all personal belongings of Syamaprasad Mookerjee carried by Tek Chand his personal Secretary and Mr. Trivedi his Counsel please contact them—Bakshi, Home Minister—

১৯৫৩র ৩রা জুলাই শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
বক্সী গোলাম মহম্মদকে প্রেরিত পত্র

77, Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta 25,
The 3rd July, 1953.

My dear Mr. Gulam Mohammed,

I am greatly surprised at the reply you have sent. As I said before, the personal belongings that were sent by you with Syama Prasad's body did not include his diary and manuscript writings. Syama Prasad, we know, had been regularly keeping his diary while in detention at Srinagar. It must have been with him at the Hospital. It is most surprising and regrettable that it was not sent along with his other belongings. Messrs. Tek Chand and Trivedi informed us that they had brought only those articles that had been made over by the Kashmir authorities. Some articles had been handed over to Mr. Trivedi at the Hospital but they did not contain the diary. We also know that Syama Prasad had been writing a good deal in detention. Curiously enough, the articles sent by you do not include any of his manuscripts as well.

I earnestly entreat you again to find out his diary and the manuscripts immediately and send them to us.

Yours sincerely,
Sd/ Rama Prasad Mookerjee.

ঠ

২০শে জুলাই, ১৯৫৩ তারিখের "দি অর্গানাইজার" পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত একটি নিবন্ধ

প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহ করে জানিয়েছেন, প্রকৃত ঘটনা যাদের জানার সুযোগ হয়েছিল এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং প্রয়াত শহীদ ডঃ মুখার্জীকে যে একটি 'সুন্দর বাংলো'তে রাখা হয়েছিল এবং তাঁকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছিল এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে আমরাও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এইসব ঘটনার কয়েকটি আমরা প্রকাশ করেছি। এখানে আরও কয়েকটি প্রকাশিত হল।

যে বাড়িতে আমাদের প্রিয় নেতাকে রাখা হয়েছিল সেটা 'সুন্দর বাংলো' নয়। এটা না সুন্দর না বাংলো। এটা একটি জরাজীর্ণ ছোট বাড়ি। বাড়িটি সরকারী নয়, বেসরকারী। কিন্তু এমনই জনশূন্য স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় যে কোন পর্যটক কখনও এটি ভাড়া নিতে আগ্রহ দেখায় নি। বাড়িটি মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। এটি ডাল লেকের ধারে অবস্থিত বললে অসত্যভাষণ হয়। এমন কি সদর রাস্তার ওপরেও বাড়িটি অবস্থিত নয়। চারপাশটা যেমন জঙ্গলী তেমনি ভূতুড়ে—মনে হয় যেন এ জগতের নয়, অন্য কোন গ্রহের। বাড়িটিতে পেঁচা ও সাপ ভর্তি। আবদুল্লা এই দুর্গন্ধময় বাড়িটিতে কয়েকটি জীর্ণ চৌকি ঢুকিয়ে দেন এবং এখানেই আমাদের প্রিয় শ্যামাপ্রসাদকে রাখেন।

ডঃ মুখার্জী কয়েকবারই তাঁর পাশ দিয়ে সাপ চলে যেতে দেখেছেন। প্রায়ই তিনি এ বিষয়ে মালীদের কাছে অভিযোগ করেন। উত্তরে মালীদের চোখে বোবা নিরুপায়তা ফুটে উঠত। চারপাশের পাহাড় থেকে দমকা বরফঠাণ্ডা বাতাস বাড়িটিতে সোজা ঢুকে পড়ে। এমন কোন সমতলবাসী ব্যক্তিকে এই রকম ঠাণ্ডা জনকনে সাপের আস্তানায় রাখা গর্হিত অপরাধ ছাড়া কিছু নয়। মালীদের এক বিবৃতিতে আছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ঠাণ্ডার জন্য প্রায়ই অভিযোগ করতেন। তিনি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে গরম কাপড়জামা চেয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে বক্সী একটি ওভারকোট এবং কতকগুলি কম্বল পাঠান।

জায়গাটার শীতল নিঃসঙ্গতার জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে তাঁর দুর্বলতা ও যন্ত্রণার কথা বলেছিলেন। একমাত্র শ্রীনগর জেলের ভারপ্রাপ্ত একজন সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জনের (এল. এম. পি) কাছ থেকেই তিনি যা কিছু চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পান। সুতরাং অসুস্থতার গোড়াতে অন্যান্য হাজারো বন্দীর ভাগ্যে যে চিকিৎসা জোটে তার থেকে কিছুমাত্র বেশি চিকিৎসা তাঁর ক্ষেত্রে হয় নি।

২২শে জুন সকালবেলা যখন ডাঃ আলি মহম্মদ তাঁকে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি চিকিৎসার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন বলে শোনা যায়।

দুপুর বারোটায় ১৫৯ নম্বর যুক্ত একটি ছোট ভ্যানে করে ডঃ মুখার্জীকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে গাড়ী পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কোন বালিশের ঠেসান বা কম্বলের আচ্ছাদন ছাড়াই তাঁকে সোজা ভাবে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি যে আবদুল্লার বন্দী তাঁকে এটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই যেন জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট তাঁর ডান দিকে বসেছিলেন। নেদৌ হোটেলের কাছে কয়েকজনই তাঁকে এই ভাবে বসে যেতে দেখেছে।

বন্দী-গৃহ ত্যাগের আগে ডঃ মুখার্জী ভৃত্যদের করজোড়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর সহবন্দীদের কাকেও যে তাঁর সঙ্গে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় নি এ তথ্য তো সকলেরই জানা।

শ্রীত্রিবেদী এবং দেবকীপ্রসাদ যখন ডি. সি'র সঙ্গে বিকেলবেলায় তাঁকে দেখতে যান, তখন সেখানে কোন চিকিৎসক ছিলেন না। একজন মাত্র নার্স তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁরা আধঘণ্টা ডঃ মুখার্জীর কাছে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁর কোন চিকিৎসা বা ঔষধপত্র দেওয়া হয় নি।

এই তথাকথিত নার্সিং হোমে তাঁর ১২ ফুট × ১২ ফুট মাপের ঘরটি ছিল শ্রীহীন পর্যাপ্ত-আসবাব-হীন খোপবিশেষ। আবদুল্লার সশস্ত্র প্রহরীর সর্বক্ষণ প্রহরার মধ্যে এই ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি বন্দী ছিলেন। আসবাবপত্র বলতে ছিল একটি খাট, একটি পুরাতন আধ-ভাঙা চেয়ার, এবং একটি টুল। অপ্রস্তুত বোধ করে ডি. সি. নিজে টুলের ওপর বসেন এবং শ্রীত্রিবেদীকে উপরোধ করে চেয়ারে বসান। দেবকীপ্রসাদকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ডঃ মুখার্জী বলায় তাঁর জন্যেও একটা চেয়ার যোগাড় হয়।

যে খাটে ডঃ মুখার্জী শুয়েছিলেন, তার কালো রঙ ডঃ মুখার্জীর হাতে লেগে যায়। তিনি জলে ধুয়ে রঙ ওঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। জলে দাগ না ওঠায় তিনি সাবান চান। কিন্তু ঐ হাসপাতালে কোথাও একটুকরো সাবান পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি নার্সকে দিয়ে তাঁর অ্যাটাচি কেস থেকে একটি সাবান বার করতে বলেন এবং নার্স সেইমত সাবানটি বার করে দেন।

যে ডাক্তারের ওয়ার্ডে ডঃ মুখার্জীকে ভর্তি করা হয় তিনি তখন ছুটিতে ছিলেন বলে জানা গেছে। সেই কারণে আর এক ওয়ার্ডের ডাঃ জুটসিকে ডেকে এনে ডঃ মুখার্জীর ভারও তাঁর ওপর চাপানো হয়। আবদুল্লার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডঃ মুখার্জী ডাঃ আলী মোহম্মদ এবং ডাঃ পারহার-এর চিকিৎসাধীন ছিলেন, কিন্তু এঁরা কেউই হাসপাতালের এলাকার মধ্যে বাস করতেন না। তাঁদের বাসস্থান ছিল হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে। খোঁজখবর করে সর্বশেষ যা জানা গেছে তা হোল সেই 'কাল' রাত্রিতে এই বিশেষজ্ঞদের কেউ ডঃ মুখার্জীর কোন চিকিৎসা করেন নি।

রাত সাড়ে নটায় যে নার্সরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিল তাদের কাছে তিনি তাঁর প্রতি আবদুল্লার দুর্ব্যবহারের কথা বলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভাল হয়ে ভারতে ফিরে গিয়ে তিনি আবদুল্লার অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে দেবেন।

রাজদুলারী টিকু নামে একজন মাত্র নার্স তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রস্রাব ত্যাগের প্রয়োজনে ডঃ মুখাজীর্র তাঁকেই কন্যা সম্বোধন করে ডাকতে হত এবং তাঁকে প্রস্রাবের পাত্রটি ধরতে হত বলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। রাজদুলারীর মুখে শোনা গেছে শেষ অবস্থায় নেতা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ডাক্তারকে ডেকেছিলেন, কিন্তু সে সময় কোন ডাক্তার ছিলেন না। রাজদুলারী দৌড়ে গিয়ে নূর আমেদ নামে এক ঝাড়ুদারকে দিয়ে ডাঃ জুট্সিকে ডেকে পাঠান। ডাঃ জুট্সি ছুটে আসেন, কিন্তু তিনি দেখেন রোগীর অবস্থা খুব গুরুতর। তিনি ঐ অবস্থায় কি করণীয় জানবার জন্য ডাঃ আলীকে ফোন করেন। ইতিমধ্যে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং রাত ২টো ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আধঘণ্টারও পরে ডাঃ আলী এসে পৌঁছান। সরকারী বিবৃতিতে যে মৃত্যুর সময় রাত ৩টে ৪০ মিঃ বলা হয়েছে তা একেবারেই মিথ্যা। তাঁরা সওয়া ঘণ্টা সময় ব্যয় করে বিবৃতির উপযোগী মিথ্যা কাগজপত্র তৈরী করে ফেলেন। পুরো বিবৃতিটিই মিথ্যার বুনানি। যখন নার্সটি দেখতে পান সব শেষ হয়ে গেছে, সে উচ্চস্বরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

পরে মন্ত্রীদের আগমন ঘটে। আবদুল্লা এবং পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন মন্ত্রী আফজল বেগ যে আসেন নি সেটা বেশ লক্ষ্য করা গেছল।

এর পরেও কি প্রধানমন্ত্রী সন্তুষ্ট থাকবেন এই বলে যে আমাদের শ্যামাপ্রসাদের অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য করার কিছু ঘাটতি হয় নি ?

পরিশিষ্ট ২

ডঃ মুখাজীর্কে যখন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন তিনি তাঁর ব্রিফ-কেসটি বন্ধ করে সাবু জেলে রেখে যান। সেই ব্রিফ কেসে ডঃ মুখাজীর্র নিজের হাতে লেখা নিম্নলিখিত "নোট্" দুটি পাওয়া গেছে। প্রথমটি হল টেম্পারেচার চার্ট, এটিতে তিনি ২০শে, ২১শে এবং ২২শে জুন সকাল এই তিন দিনের দেহের তাপ লিখে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় নোটটি কাশ্মীর হাইকোর্টে 'পিটিশন' পেশ করার জন্য তিনি তৈরী করেছিলেন।

পরিশিষ্টের এই অংশে প্রথম সংস্করণে ইংরাজী "নোট"গুলি মুদ্রিত হয়। তখন মূল ইংরাজী গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নি। বর্তমান সংস্করণে ঐ অংশ পূর্ণাঙ্গরূপে পরিশিষ্ট ৬-এ মুদ্রিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকেরা অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট ৬-এ মুদ্রিত ইংরাজী Appendix II অংশ দেখবেন।

পরিশিষ্ট ৩

ক

কাশ্মীর যাত্রাপথ থেকে লিখিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

Member of
The House of the People

করনাল
৯।৫
সকাল ৬টা

ভাই বৌদি

কাল সকালে ট্রেনে দিল্লী ছাড়লাম। বেলা ২টায় আম্বালা পেঁছিলাম। পথে সব স্টেশনে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিল। সে এক দৃশ্য যা জীবনে ভুলব না। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আম্বালাতে মিটিং সেরে মোটরে ৫টায় বাহির হলাম। পথে দু জায়গায় বড় মিটিং হল। তারপর এখানে এলাম রাত আটটায়। রাত ১০টায় মিটিং শেষ হল। এখানে রাত কাটালাম। ছাদে শুয়েছিলাম —খুব বাতাস ছিল। ৭টায় এখন যাব পানিপথে। সেই পানিপথ যেখানে ভারতের ভাগ্য ডুবেছিল। পাশে কুরুক্ষেত্র। ১০টায় ট্রেনে এগিয়ে চলব। জলন্ধর যাব কাল ভোরে। তারপর অমৃতসহর সন্ধ্যায়। পরশু পাঠানকোট। পথে আটকাবে কি না জানি না। কাল আবদুল্লা ও জওহরলালকে টেলিগ্রাম দিলাম। এখানে লোকের সাড়া দেখে অবাক হতে হয়।

হাসুকে একা রেখে এলাম—মন তাই খুব ব্যস্ত হয়ে আছে। উপায় কোন নেই। সে বলে তার জন্য যেন না ভাবি—একা বেশ থাকবে। যদি আমাকে জম্মু কাশ্মীর যেতে দেয়—তাহলে ১৩ই।১৪ই দিল্লী ফিরব। যদি ধরে—তাহলে কি হবে জানি না।

তোমার চিঠি কবে পাব ঠিক নেই। ঠিকানা দিতে পারছি না—কোথায় কখন থাকব জানি না। আমি মাঝে মাঝে চিঠি দেব।······কোথায় কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজে বুঝি না। তবে যে কাজে নেমেছি—তা ঠিক কাজ—এ বিশ্বাস না থাকলে এ ভাবে চলতে পারতাম না—বা এত হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ সঙ্গে আসত না। তাই না!

তোমার মেজঠাকুরপো

খ

শ্যামাপ্রসাদের বন্দীজীবনের একখানি পত্র

C/o Superintendent, Central Jail
Srinagar, June 6

ভাই বৌদি,

সেদিন তোমাকে চিঠি লিখে রাখার পর ডাকের চিঠি এল। একসঙ্গে তোমার আগের লেখা বাংলায় তিনখানা চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। এই সব চিঠি আগে আমাকে দেওয়া হয়নি—হয়ত যিনি বাংলায় লেখা চিঠি পড়ে 'পাস' করবেন তিনি ছিলেন না। আমার সব চিঠি ঠিক পেয়েছ আশা করি। আমি মোটের উপর ভালই ছিলাম—কিন্তু আবার দুদিন ডান-পায়ে ব্যথা বেড়েছে—কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন যেন না দাঁড়াই—এই বলেন। এমনি ত বেড়াবার উপায় নেই—বাগানের মধ্যে ছাড়া—তাতে কোন রকম ক্ষিধে হয় না—তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বসে থাকতে হয়, তাহলে আরো মুশকিল। ক'দিন আবার সন্ধ্যার পর একটু জ্বর হচ্ছে—বেশী নয়, ৯৯°। চোখমুখ জ্বালা করে। ওষুধ খাচ্ছি। খাওয়া ত খুব সাবধানে খাই। সিদ্ধ খাওয়া—তরকারি। মাছ পাওয়া যায় না। দুদিন এনেছিল। ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। তবে সাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না। মুখ ধুয়ে একটু বাগানে ঘুরি—ঘরে বসি—সে সময়টা খুব সুন্দর থাকে—চণ্ডীপাঠ করি। ৭টায় এক কাপ চা। তারপর বসে পড়া ও কিছু লেখা। সাড়ে আটটার আগে বাগানে গিয়ে বসি—রোদ আসে সেখানে তখন। মুখ পুড়ে কালি হয়েছে—তাই মুখটা গাছের ছায়ায় রাখি ও তার জন্য চেয়ার সরাতে সরাতে চলতে হয়। তখন খাবার আনে। দুখানা ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট হাসু পাঠিয়েছে—একটু মাখন দিয়ে আধসিদ্ধ ডিম একটা ও এক কাপ দুধ কফি। তারপর সেখানেই বসে থাকি—বা একটু ঘুরি। বই আর বই—এই চলে—বারোটা অবধি। তখন স্নান করি—ও প্রায়ই বাগানে গাছতলায় খাই। একঘণ্টা বিশ্রাম হয়—চিঠি লিখি বা পড়ি। সাড়ে তিনটায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসেন—খবরের কাগজ বা ডাক নিয়ে। খালি চা—লেবু দিয়ে—ও ফল (যদি থাকে) খাই। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলো থাকে। তারপর ঘরে এসে বসি। বই, কবিতা, গীত—এই সব চলে তখন—পৌনে নটা পর্য্যন্ত। তখন বারান্দায় খাওয়া হয়—দুবেলার খাওয়া একই। একখানা রুটি খাই। সিদ্ধ তরকারি—কোনদিন মাংস—দই দুবেলাই খাই। মিষ্টি দু-একদিন এনেছিল। রাত ১০টা পর্য্যন্ত জেগে থাকি। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম প্রথম রাতে ভাল হয় না। তারপর একঘুমে ভোর হয়। হাতে অগাধ সময়—ভাবতে আরম্ভ করলে তার সীমা পাওয়া যায় না। শুধু যা দিন, বছর পার হয়ে গেছে তার কথা ভাবি না—তার ভিতরেও অনেক জিনিস আছে যা দুঃখ ও সুখ

মিশান, কাজেই তাদের ভুলব কেমন করে—তাই ভাবি সেই সব কথা। তার সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের কথা ভাবি—মানুষ ও ঘটনা—ছবির মত মনে আসে—কে কোথায় আছে, কি করছে, কোন্ ঘটনা কেমন ঘটছে—নানা ভাবে এই সব মনে আসে। আবার যখন ভাবি অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যতের কথা—তখন আর একরকম ভাবে সব ভাবনা জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখি—পরাজয়ের মধ্যে বিজয় দেখি—সবার ভালো দেখি। বেশী দেখেছি এই ক'দিনে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ অথচ কত গর্বিত ও মদমত্ত আমরা—অথচ তা জানি না। বুঝি না যে যন্ত্রচালিত হয়ে চলেছে এ জগৎ ও যাঁর কৃপায় এই সৃষ্টির জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ হচ্ছে তাঁর কথা ভাবি না। জীবনের সব সময় কেটে এল—কি করলাম এর ভিতর জানি না। কত ছোট কত বাজে কথায় ও কাজে সময় কেটে গেছে—ভুল ও অন্যায় কত করেছি তাই ভাবি। বই পড়তে খুব ভাল লাগে, তুমি জান। বই পড়ছি নানা বিষয়ের উপর—নতুন ও পুরাতন আর শিখছি কত নতুন করে। লিখতে খুব ইচ্ছা করে—কিন্তু ঠিক সম্ভব হচ্ছে না। বাবার জীবনী একটা লেখা হল না এই ত্রিশ বৎসরে—এর জন্য দুঃখ হয়। এখনও চেষ্টা করলে তাঁর সময়ের অনেক কথা লেখা ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। কদিন ধরে আমারই ইচ্ছা করছে এই লিখতে। নিজের জীবনেও কম অভিজ্ঞতা হয়নি—তাও লিখতে মন চায়। ভাবি তোমাদের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, নাতিনাতনীর কথা—আর যে হাজার হাজার ছেলেরা আজ বন্ধ জেলে রয়েছে তাদের কথা। কতদিন এভাবে থাকব জানি না। ভবিষ্যতে কাজ কি করব তাও জানি না। তবে মনে কোন দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং আগে যে অফুরন্ত বিশ্বাস নিজের উপর রাখতাম, তা এ ক'দিনে রাখতে পেরেছি—এই অজানা পরমশক্তির উপর—যাঁর নির্দ্দেশ বিনা আমরা চলতে বা বাঁচতে পারি না। এতে আনন্দ হয়, মনে জোর হয়। সবাই ভাল থাক ও সুখী হও। আজ এই থাক্। চিঠি দিও।

তোমার মেজঠাকুরপো।

পরিশিষ্ট ৪

SPEECH BY DR. H. C. MOOKERJEE, GOVERNOR OF WEST BENGAL AT THE MEMORIAL MEETING CALLED BY THE SHERIFF OF CALCUTTA ON SUNDAY, THE 28TH JUNE, 1953

Following is the full text of Governor Dr. H. C. Mookerjee's presidential speech :—

"We have met here today under the shadow of a national calamity—the sudden and premature passing away of a truly great son of Mother India, born in this city of West Bengal, Syamaprasad —a name to conjure with—has been snatched away in the fullness of his manhood, with its immense potentialities, regard being had to his glorious record, of past achievements in the service of the country in various fields, by the cruel hand of death.

What has added to the poignancy of our grief is that he died in detention, while still seeking to serve the country according to his own lights, far away from his home and from his near and dear ones, including his old mother, for whose presence by his bed-side he seemed to have expressed a passionate yearning in his last moments.

It has fallen to my lot as the titular head of this State to give expression to the profound sorrow and sense of irreparable loss surging in the hearts of the citizens of Calcutta and the people of West Bengal in general over this tragic happening. It is an unenviable lot that I should have been called upon to perform this melancholy duty. For, not only as his teacher during the formative years of his life did I stand in *loco parentis* to the daparted great but he maintained the ties so formed of the closest association and intimate personal touch with me till his end. I am weighed down with a sense of personal bereavement and overwhelmed as I am by my own

emotions, I feel unequal to the task which I have to discharge in my representative capacity.

I need hardly remind you of the Sanskrit adage about the natural ambition of a father or a teacher to see his son or pupil surpass him. My ambition in this respect had its fulfilment in Syamaprasad in an abundant measure when I lived to see him grow to an immense stature, towering head and shoulders above his fellow-beings, including myself. But, then, it is against the order of nature that I, of the older generation, having had the rare privilege of experiencing this unalloyed joy, should also live to mourn his loss.

It is in the fitness of things that we have assembled together to pay our loving homage and respectful tribute to his memory here in this Senate Hall which witnessed his earliest triumphs as a student and his mature achievements as an administrator of outstanding merit in the educational sphere.

Born at the turn of the century, viz., in 1901, when Bengal still claimed the leadership of India as the second son of the late Sir Asutosh Mookerjee of hallowed memory, who was rightly regarded as the main architect of the Calcutta University and acclaimed as a jurist of international renown, Syamaprasad impressed everybody even in his teens as a chip of the old bloc, having a career full of promise, and soon distinguished himself with a string of academic successes, taking the top place at almost every examination.

His long association with the administration of the Calcutta University, which was to be so fruitful of results, commenced in 1924, when, at the early age of 23, he became a member of the Senate. And very soon it became apparent that the mantle of his illustrious father had fallen upon his shoulders in this sphere. He made the University his own, even as his distinguished father had done before him, serving it with single-minded devotion for more than two decades in various capacities as President of the Councils of Post-Graduate Studies in Arts and Science, Dean of the Faculty of Arts and Vice-Chancellor, and making unparalleled contributions to the cause of advancement of learning, its declared motto.

Having realised that "University education originated in this

country, not in the desire for conservation and betterment of our traditional culture, our arts, crafts and industries, but mainly for imparting to us western ideas through the medium of a foreign tongue" and for "ensuring a regular supply of an indigenous machinery of the smooth working of a powerful bureaucracy," as he himself said in his Convocation speech as Vice-Chancellor in 1938, he wanted "to see the syllabus, and courses of studies so remodelled, systems of training and examinations so reorganised that the young learner may grow up not as a mechanised recorder of information and theories, not as a dry specialist, but as one whose latent power is well roused, whose critical judgement is strengthened and whose capacity for wide thinking and application of knowledge to problems of life is developed to the fullest extent", and also "to see such an education being imparted through the language of the province in all stages without neglecting a study of the English language."

During the four years of his service as the Vice-Chancellor, Syamaprasad did not spare time, energy, health, convenience, or anything worth having in life, where they stood in the way of the performance of what he considered his duty and this he did against the advice of his doctors. He initiated certain new departments and courses and developed and improved existing ones. The departments of Science are particularly indebted to him, the untiring labours of the son fulfilled the dream of Sir Asutosh—the dream of departments claiming as a matter of right, the admiration of the world. In the department of Arts he introduced various reforms, all aimed at broadening the basis of culture, liberalising, in the process, literary facilities and, above all, adopting Bengali as the medium of teaching and examination.

Without any encouragement from the Government of the day, he put into effect a scheme for agricultural education and introduced the diploma course in Agriculture. He was deeply intersted in women's education and implemented noteworthy scheme with the endowment of the late Viharilal Mitra.

The organisation of the Teachers' Training Department and the introduction of short-term training courses, including a vacation

course to provide trained teachers for our schools, the establishment of Chinese and Tibetan studies, the foundation of the Asutosh Museum of Indian Art and Fine Arts Gallery, the work of archaeological excavations undertaken by the University, the establishment of the Appointment and Information Board, the construction of the new Central Library Hall with research and reading room facilities on modern lines, the introduction of Hindi in the B. A. course and of Honours courses in Bengali, Hindi and Urdu as second languages—these were some of his achievements.

At his instance, a Bengali Paribhasa of scientific terms was prepared and published and a special scheme for training students for Public Services Examinations was put through.

A special series of Bengali publications in different branches of knowledge was undertaken. The series was intended for the benefit of students and general readers. Bengali spellings were standardised on his initiative.

The College Code was formulated for the first time during his Vice-Chancellorship and the new Matriculation regulations were framed and the age restriction of students was abolished.

The systems of compartmental examinations and concessions to failed students for appearing at examinations without getting themselves admitted into colleges were introduced during the tenure of his office.

The question of giving military training to our students engaged his serious attention and, in spite of discouraging factors, he succeeded in initiating military training course in our scheme of studies. This was no mean achievement in the days when he was Vice-Chancellor.

The welfare of the younger generation and of the country at large was the ideal he set before himself and with single-minded devotion he laboured hard to attain it. To this end, he took steps to improve and expand the Students Welfare Department for the promotion of the physical health of our pupils and abolished hostels reserved for students coming from the so-called backward classes, providing accommodation for them in the general hostels and messes attached

to colleges. Primarily intended to create the spirit of brotherhood among them, Syamaprasad saw the special reduced seat-rents were charged from them.

It was during his Vice-Chancellorship that the University Foundation Day (*i.e.* January 24) was celebrated every year. Students of different colleges attended the ceremony with banners and badges and teachers of colleges and schools also attended it. This was an attempt at bringing teachers and students into closer personal relationship.

During his time, a scheme was initiated in the Applied Chemistry department for imparting training in large-scale production of certain industrial goods.

His wide interest in the promotion of cultural fellowship and human brotherhood was manifested in the work done by him as President of the Maha-Bodhi Society.

In all that he did, Syamaprasad, while facing every problem courageously, knew how to act in a spirit of sweet reasonableness and was eminently successful not merely in maintaining but enhancing the prestige and reputation of his *Alma Mater*.

What has been said just now may appear a dry and not very interesting catalogue of the achievements of my late pupil. It is admittedly so, for it would take a large volume to give some idea of the implications, immediate and remote, of the improvements he introduced in the Calcutta University.

But I am quite clear in my mind that as years roll by, the people of Bengal will not only feel more and more grateful to him for what he did for them but they will see the ideas behind the different steps he took finding approval from and acceptance by other centres of learning. And, in this sphere at least, Syamaprasad, though dead, will continue to live in our memory and to maintain the prestige of the people of this State for generations to come.

Syamaprasad joined the legal profession in his early manhood, first as a Vakil and then as a member of the English Bar but, fortunately for the country as a whole, he did not take his career at

the Calcutta High Court very seriously. With his keen intellect, logic and great gift of eloquence he was probably the last of the great giants which Bengal produced in the field of oratory—he could have easily risen to the top of the profession and shone as a luminary in the legal firmament, as his father had done, but law is a jealous mistress and from the point of view of the interests of our motherland, he certainly made a better choice, as the present Chief Justice of the Calcutta High Court—another distinguished pupil of mine—has said in course of a reference to his death, by refusing to be content with only pleading for justice for his clients and preferring to make justice to the whole of India his special concern and for that justice not only to plead but to fight "with all the great powers which he possessed and all the capacity for leadership which has made his name famous with everybody."

Syamaprasad started his political career in a small way in 1929 when he entered the Bengal Legislative Council as the member representing the University constituency. Gradually he drifted into the fold of the Hindu Mahasabha, which he galvanised into new life as an instrument for the service of the country. His association with the Hindu Mahasabha was the outcome of his strong reaction to the communal politics of the Muslim League and the anti-national and disruptive forces let loose by it.

Syamaprasad was himself imbued with an intense patriotic fervour and his own outlook was always a national one—never communal or parochial. There was nothing reactionary about him. He espoused the idals of the Congress and fought for the realisation thereof in his own way, whenever these were in accord with his personal convictions. And be it remembered that he wanted to see the Mahasabha turn itself into a cultural organization in the post-independence period and that he severed his connection with it immediately after the assassination of Mahatma Gandhi.

Even as a member of the Hindu Mahasabha, he joined the Cobinet of Mr. Fazlul Huq in 1941 as Finance Minister of undivided Bengal with the object *inter alia* of fighting the communal menace then stalking the land. He expressed himself later in these terms in

his famous letter of the 16th November 1942, to Sir John Herbert, the then Governor of Bengal, when resigning from his office :

"When I accepted office nearly a year ago, I was fully aware of the difficulties of the task I was undertaking. The province was then surcharged with communal tension almost unprecedented in its history."

"I have striven during the period of my office to maintain a healthy communal atmosphere, believing as I do that this province can never advance unless the two great communities comprised within it feel that its administration is being carried on in a fair and just manner."

In his letter of the same date addressed to the Chief Minister he said :

"Whatever may happen in future, I hope you and I will be able to work together for the protection of popular rights and for maintaining a healthy communal atmosphere in the province."

That his national outlook was never blurred by his association with the Hindu Mahasabha and that he yielded to none in his desire to free India from alien rule is borne out by the following extracts from his letter of the 12th August, 1942 to the then Viceroy, Lord Linlithgow :

"The demand of the Congress as embodied in its last resolution virtually constitutes the national demand of India as a whole. It is regrettable that a campaign of misrepresentation is being carried on in some sections of the foreign Press characterising the Congress demand as a virtual invitation to Japan and a surrender to chaon and confusion.

"Repression is not the remedy at this critical hour. Indeed the history of all countries struggling for freedom amply discloses that the greater the repression from the ruling power, the more intense is the spirit of resistance of the people who regard themselves as oppressed and downtrodden.

"I therefore appeal to you to take a realistic view of the Indian situation which must be examined in the light of rapidly-changing world movements. There is none who is satisfied with the present

Indian administration and an immediate transfer of power is essential for the solution of the Indian deadlock. The substance of the Congress demand is nothing more than this.

"What is regarded as the most unfortunate decision on the part of the British Government was its refusal to negotiate with Mahatma Gandhi even after he gave his emphatic assurance that the movement would not start until all avenues for an honourable settlement had been explored.

"I have intimated to the Governor of Bengal that I disapprove of the policy launched by the British Government and their representatives at the present juncture. I am making this appeal to you in the hope that you will not allow false prestige to stand in the way, but take immediate action for solving the deadlock. In case, however, you feel that the British Government should not move further but allow the present impasse to continue, I must regretfully ask my Governor to relieve me of my duties as minister, so that I may have full freedom to help to mobilise public opinion in demanding a settlement."

Syamaprasad expressed himself more or less in identically emphatic terms in his letter of the 16th November, 1942, by which he tendered resignation of his office, as the following extracts will show :

"If it is a crime to see one's country free and shake off foreign domination, including British, every self-respecting Indian is a criminal. There are administrators in India who dream constantly of fifth columnists walking on the roads and lanes of Indian towns and villages. These estimable gentlemen themselves belong to this category, if treachery to India's genuine interests is the real criterion of a fifth columnist in India.

"The doctrine of benevolent trusteeship stands exploded and you can no more throw dust into our eyes. Indian representative therefore demand that the policy administration of their country in all spheres, political, economic and cultural, must be determined by Indians themselves, unfettered by irritating acts of unsympathetic bureaucrats and bungling Governors.

"Instead of doing what is just and natural, for three months Government has carried on a reign of repression, which will serve as a good model to those deeply attached to totalitarian rules of conduct and whose alleged misdeeds are widely circulated through British agencies. During these months people have lost their fear of bullets. What can possibly be your next sanction to hold India in chains ?"

Among the immediate causes of his resignation, apart from the failure of the British Government to a reasonable settlement with the Indian leaders for transfer of power into their hands with a view to the successful prosecution of the war, were the refusal of the Governor to take the ministry into confidence in respect of such matters arising out of the war as the denial policy, the repression carried on in the district of Midnapore as a counterblast to the disturbances connected with the August 1942 movement and the extreme callousness of the Government in the matter of rendering relief to the victims of the unprecedented havoc caused in that district by the cyclone and tidal wave of the 16th October, even the news whereof was suppressed for over a fortnight for fear of the Japanese taking advantage of the situation to land an invading army there. In his letter of resignation to the Governor, he referred to them in these terms :

"The Congress movement in Midnapore took a very serious turn and none can say anything in respect of any legitimate measures taken to deal with the persons guilty of serious offences against the law. But in Midnapore repression has been carried on in a manner which resembles the activities of Germans in occupied territories as advertised by British agencies. Hundreds of houses have been burnt down by the police and the armed forces. Reports of outrages on women have reached us.

"Orders were issued from Calcutta that it was not the policy of Government that houses should be burnt by persons in charge of law and order. I have ample evidence to show this order was not carried into effect and even after the unprecedented havoc caused by the cyclone on the 16th October and our visit to the affected areas

a fortnight later, the burning of houses and looting were continued in some parts of the district. Apart from the manner in which people were fired at and killed, these acts of outrage committed by Government agencies are abominable in character.

"The reports which I have received about the callousness and indifference of some of the officers even after the cyclone perhaps find no parallel in the annals of civilised administration. The suppression of news of the havoc by Government and even of appeals for help for more than a fortnight was criminal."

* * *

"After the cyclone, curfew orders are continuing even in areas where people offered every co-operation. Our intervention in this respect proved fruitless. Transport facilities and movements were extremely restricted even when we visited the district a fortnight later."

* * *

"One officer's report in writing to Government was that relief, whether organized by Government or any private agency, should be withheld for a month and thereby people taught a permanent lesson. Relief measures adopted by local officers were utterly inadequate. Even *bona fide* private relief workers from Calcutta, though they produced their credentials, found themselves in jail under the Defence of India Rules. There is no chance on our part to get these officers removed from that area because prestige will then suffer. There is no chance of any enquiry being held,...for then again prestige will suffer. The only chance that people of this province apparently have is to suffer patiently at the hands of the upholders of law and order and wait for the day when nemesis is bound to come."

Having freed himself from the shackles of office, Syamaprasad threw himself heart and soul into the task of organising effective relief for the unfortunate victims of the cyclone in Midnapore through non-official agencies. In the following year, when Bengal, as a whole, was in the grip of what was probably the worst famine in recorded human history, at least partly because of the denial policy and other erroneous war measures, he again rose to the occasion and

did his best to alleviate the widespread distress and mitigate the horrors which followed in its wake. His activities at this critical juncture were typical of the large-hearted humanitarianism which was one of the essential ingredients of the character of this born fighter. It should be remembered that most of the Congress leaders were behind prison bars at this time and as such could take no part in giving succour to suffering humanity. Bengal can never, therefore, forget how Syamaprasad stood by her in the dark days of this devastating famine when she was so sorely in need of relief from every quarter.

I need not recount in detail Syamaprasad's activities during the last decade, these being matters of recent history with which everybody is familiar. Briefly speaking, although he was an ardent believer in the integrity of the country that he loved so well, when he found that the emergence of Pakistan had become inevitable, he joined with similarly minded leaders in saving a part of Bengal for the Indian Union.

Thereafter Syamaprasad accepted the position of a Union Minister and was placed in charge of the Supply and Industries department. He proved an able administrator and, according to many, there is at least some justification for the veiw that he was primarily respon-sible for the adoption by India of the policy of mixed economy in the industrial field which is still in vogue and forms the keynote of the recommendation of the Planning Commission.

But he was not made of the stuff that would agree to a compromise with one's convictions for love of self or power. He was not the sort to succumb to the lure of office. He had therefore no hesitation in resigning from the Cabinet when he found himself unable to subscribe to the policy, which resulted in the Nehru-Liaquat Ali agreement in connection with the upheaval of 1950 in East Pakistan.

Here again, it is necessary to remember that Syamaprasad took pains to make it clear in his letter to our Prime Minister that the stand taken by him was not a communal one. He considered the problem to be a purely political one and differed from the Prime Minister as regards the approach to a solution thereof.

Syamaprasad, thereafter, became the most outstanding figure in our Parliament on the side of the Opposition. He formed a new party known as the Jan Sangh on the eve of the last general elections and virtually became the leader of the Opposition in the reconstituted Parliament. A strong but informed and responsible opposition is the very foundation of parliamentary democracy and this was furnished by Syamaprasad in recent years. As the *Statesman* has put it, he was the chief assayer of Government policies and measures and his searching analysis and criticism, the principal safeguard against complacency on the part of the party in power by reason of its large and comfortable majority.

As regards the late phase of his political career, which concerns his participation in the Jammu Parishad agitation, I should only like to say that he did not launch upon it for the sake of anything in the nature of a political stunt designed to earn cheap popularity for himself and create embarrassment to the powers that be. Knowing him as I do, I cannot but assert that he joined the movement from the purest of motives and in the sincerest belief that he could thus bring about an effective solution of the problem. He had the courage of his convictions and was prepared to stake his life for them. Again there was no communal mentality behind his move. The effect of his activities might conceivably be regarded by the authorities as being conducive to communalism ; but that must have been far from his intention.

We may recall in this connection that the non-co-operation movement launched more than once by Mahatma Gandhi with the purest of motives had to be judged by the British Government as an indirect incitement to mass disturbances, lawlessness and hooliganism, not altogether without reason.

Considered from his own point of view, Syamaprasad will be regarded by many as having died a martyr's death in Kashmir. In any case, it is in the nature of a grim tragedy that a great patriot of his stature should have died while in detention without trial.

Occupying the position I do, it would be improper on my part to criticise in even the most temperate language the actions of those

responsible for the administration of what we all regard as a sister State. Moreover, as a sincere believer in allegiance both in letter and in spirit to the principle of clarity under all circumstances, it would be wrong to express any opinion until and unless the other side in what is admittedly a painful and controversial matter has had an opportunity of stating its position and explaining its conduct.

Nonetheless, as the mouthpiece here of all sections of the people of West Bengal, I desire to make it absolutely clear that even those who were unable to see eye to eye with my late pupil in his last public activity, maintain that it is unfortunate that a man like Dr. Syamaprasad Mookerjee, with a large number of very close relatives, thousands of devoted followers and lakhs of admirers, should have passed away without any one of them being present beside him at the hour of death. This very largely explains the feelings of grief and soreness felt today by every son and daughter of Bengal.

পরিশিষ্ট ৫

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কাজী নজরুল ইসলামের একটি পত্র

"শ্রীচরণেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief & relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমার মৃত্যু হ'ত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবুলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, "আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না", আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণদলের লীডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। "নবযুগের" সম্পাদনার ভার যখন নিই ; তার কিছুদিন আগে ফিলমের music-direction-এর জন্যে সাত হাজার টাকার কনট্রাকট্ পাই। হক সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু-মুসলমান supporter আমায় বলেন যে, তাঁরা ও ঋণ শোধ ক'রে দেবেন। আমি film-এর contract cancel করে দিই। পরে যখন দু' তিন মাস তাগাদা ক'রে টাকা পেলাম না, তখন হক সাহেবকে বললাম, "আপনি কোন ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ ক'রে দেন, আমার মাইনের অর্দ্ধেক প্রতিমাসে কেটে রাখবেন।" হক সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব্।" তারপর সাতমাস কেটে গেল, আজ নয় কাল ক'রে। তাঁর supporter-রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানেন Secretariate-এ আপনার সামনে হক সাহেব বললেন, "কাজীর ঋণ শোধ ক'রে দিতে হবে। আপনিও আমাকে বললেন "ও হবে যাবে।" আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করলাম। আপনি জানেন, হিন্দু মুসলমান unity-র জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে সব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে —সে গান বাঙলার হাটে, ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি; যদি হক মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তাহলে অবার coalition ministry-র জন্য। হক সাহেক একদিন বললেন, "কিসের টাকা ?" আমি চুপ করে চলে এলাম। তারপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariate-এ যখন বলেছিলেন, "ও হয়ে যাবে", তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে

রইলাম, "আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি—আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব—সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে—আপনারাই হবেন এ দেশের সত্যকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu-muslim Equity fund থেকে আমার ঋণ-মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশ টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিগ্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়তো Body-warrant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আপনার আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য্য সাহস—আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম-পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন। প্রণত—কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আগে শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কি পরিমাণ সচেষ্ট ছিলেন, সেটি শ্যামাপ্রসাদকে লেখা নজরুলের এই চিঠির ওপর শ্যামাপ্রসাদের মন্তব্যটি থেকে উপলব্ধি করা যায়। শ্যামাপ্রসাদ লিখছেন: "কী ব্যবস্থা করা যাবে সে বিষয়ে জুলফিকার হায়দরের সহিত করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে ফেরৎ আসে।"

পরিশিষ্ট ৬

FOREWORD

For a mother to lose a son—and a son so brave and noble—is a tragedy unbearable. But for a mother to write a Foreword to a book unfolding the tragic tale of the last days of her beloved son makes the tragedy more poignant. And yet I sit to write and I write with a pen dipped in tears.

I have been overwhelmed by the mass of condolence messages, pouring in from far and near. They all ring with sincere sentiments. Innumerable persons—known and unknown—have come to me to console me and by consoling me to console themselves. They all come with a genuine gift of tears and mingle theirs with mine. And as I weep with them, proudly do I feel that the loss of my son is a a loss to Mother India.

Death is inevitable. But a death in detention—and a detention without trial—is neither normal nor inevitable. Yet, such was the death of my son. Imprisoned by persons whose political activities he had the courage to oppose, surrounded by armed guards till his last moments in the hospital, far away from his near and dear ones, without even one familiar face within his last sight, my gallant son—for whose life many would have offered their own lives—met his tragic end. With what words on his lips, in whose presence, and under whose care and treatment did he depart—even I, his mother, it seems, shall never know. I am filled with horror to think of that last night ! They—the official dignitaries—have drawn an iron curtain over the whole mystery. They speak to me of the Will of God—and I to hear from their lips the name of God !

But, let me not lament here the aching void created in me by the death of my beloved son.

I demanded Justice from Shri Jawaharlal Nehru. I asked for

an immediate impartial open enquiry into this whole tragic episode. But, he has failed and failed miserably. With an air of infallibility he replied to say that he could "only" give his "clear and honest conclusion" to me. But, unfortunately, the facts so far revealed, and as disclosed in the following pages, unmistakably show that his conclusions have no basis in fact and the official versions bristle with inaccuracies and mis-statements. The Prime Minister of India possibly thinks that truth can be sacrificed on the altar of Government Policy. But Truth, I say, shall prevail.

Out of the facts revealed here arise vital questions of far-reaching effect on the destiny of our Motherland.

Had my son, a citizen of India, a Member of the House of People, a leader of the Opposition, the Fundamental Right to enter Kashmir without any obstruction from any quarters ?

Was the detention of my son, without any trial, by the Kashmir Government lawful and justified ?

Are the charges of malafides made by my son himself against the Kashmir Government sustainable ?

Were the Kashmir Government guilty of culpable negligence ? Did they do all that should or could have been done by them ?

Was there any complicity of the Government of India in this tragic episode ?

These are the questions, amongst others, which must be answered and all the facts must be brought to light.

I had long dedicated my son for selfless service to the country, and my son sacrificed his life for the cause of the Motherland. He had the courage of conviction to oppose the Party in power. Am I to believe that in Free India to lead an Opposition is a crime ? And yet my son suffered detention till death, as a condemned criminal, with this difference that the criminal gets a trial, but for him there was not even a show of trial. It seems, malice and jealousy of persons in Authority, armed by the people with unlimited powers, pursued him persistently, and a huge machine of organised injustice was set against him. But my son's courage proved greater than their malice, stronger than any torment their cruelty could devise.

And he shall ever live even in death, for while thinking of him I cannot but think of those martyrs who had died for the love of God or for a cause—martyrs who had "died on the wheel, in the flames, under the sword, riddled with arrows, torn and devoured by wild beasts".

May the facts so far revealed open the eyes of the doers to their own misdeeds that they may repent, and the people of India judge for themselves and take such action as will, for ever, put an end to this agony of Mother India.

May God be with My Country !

77, Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta,
July 30, 1953.

JOGMAYA DEBI

APPENDIX I

A

AMRITA BAZAR PATRIKA—DATED 23RD JUNE, 1953

(From Our Special Representative)

Srinagar, June 22.

Dr. Syama Prasad Mookerjee, now in detention here, was today admitted in Government Nursing Home following an attack of pleurisy. Government doctors are now attending on hlm.

An official spokesman said Dr. Mookerjee's condition was not serious and that he was receiving the best medical attention.

B

KASHMIR GOVERNMENT COMMUNIQUE, DATED 23-6-53 PHYSICIANS' REPORT

Srinagar, June, 23.—The two doctors attending on Dr. Syama Prasad Mookerjee, Dr. Ali Mohammad, M. R. C. P. (*Edin.*) and Dr. Ramnath Parhar, M.D. (*Edin.*), issued the following report, according to a Press Communique issued by the Jammu and Kashmir Government.

"Dr. Mookerjee had an attack of pain lasting two minutes in chest over the heart area on the morning of 22nd June, 1953, The pain was accompanied by perspiration and a feeling of general weakness. There was fall of blood-pressure, a constant feeling of heaviness in the chest and a feeling of lack of energy. He was seen at his detention camp at Nishat Bag at 7 a.m. by medical officer (Jail) and Dr. Ali Mohammad, physician, State Hospital. After restorative measures were given on the spot his condition improved and arrangements were made for his removal to the Nursing Home of the State Hospital where he was admitted at 12 noon. Blood, urine and electro-cardiographic investigations were carried out

and a provisional diagnosis of heart attack (coronary type) was made and treatment started with sedatives. Antibiotics were given and oxygen administered as necessary. His condition improved and he was cheerful. The physicians attending were Dr. Ali Mohammad, M.R.C.P. (*Edin.*) and Dr. Ramnath Parhar, M.D. (*Edin.*).

At 7-30 p.m. he was seen by the District Magistrate and Sri Trivedi, his counsel, to whom he dictated some notes and signed some cheques.

At 9 p.m. his general condition was fairly good except for low blood-pressure and rapid pulse.

At 11 p.m. oxygen was given to allay restlessness which started at that time, his blood-pressure fell to 100/80. Glucose with aminophylline was given intravenously.

At 1 a.m. he got pain in the heart area and became restless. Pulse was feeble and blood-pressure 90/70. Oxygen was continued. To relieve pain, pethidine, one c.c. was given.

At 2-30 am. his condition was as above. Respiration and pulse became imperceptible, coramine and aminophylline were given intravenously.

At 3 a.m. condition was as above. Pulse was slighty perceptible. Oxygen was continued with intravenous coramine given again.

At 3-20 a.m. pulse was again imperceptible. Respiration feeble and irregular. Oxygen was continued.

At 3-40 a.m. respiration and pulse stopped.

—U.P.I.

C

STATEMENT OF Pt. S. L. SHARAF, MINISTER FOR HEALTH & JAILS, KASHMIR, DATED 1-7-53.

The circumstances leading to the tragic demise of Dr. Syama Prasad Mookerjee have already been explained in a Press communique issued by the Jammu and Kashmir Government on June, 23. Some details of the illness and the treatment administered at

various stages were given in the medical report quoted in the communique.

I observe that there is an understandable desire on the part of some of our countrymen to have fuller information about the sad and untimely death of a national figure. I appreciate their anxiety. We spared no efforts to save the precious life of Dr. Mookerjee. That these efforts should have failed has caused us as much sorrow as to our other countrymen.

Dr. Mookerjee was arrested on May 11, 1953 along with Sri Guru Dutt Vaid and Sri Tek Chand Sharma. They reached Srinagar on the following day and were put up in a private Bunglow above the Nishat Garden, known as Heather Villa.

Commanding the full view of the Dal Lake and its surroundings, Heather Villa has a garden and an orchard attached to it. The Villa is well furnished and has modern sanitary fittings. For the convenience of Dr. Mookerjee and his companions the use of a telephone in the vicinity of the Villa was arranged. The extent to which these arrangements were to the satisfaction of Dr. Mookerjee and his colleagues may be judged from the following extracts from their letters :

Writing to his sister-in-law on May 25, 1953 Dr. Mookerjee said :

"......The house and the garden are situated at the foot of mountain. The road runs right below the garden. After that the land moves up again to the mountains. Again there is a road beyond that. Below that is the Dal Lake which I can see clearly both from the house and garden. The garden is full of fruits and flowering trees. Straw-berries and cherries are now in full bloom......a stream runs through the garden......The Jail Superintendent comes every afternoon with kitchen provisions and my mail and papers. The milk here is very good—I drink it every morning. The butter is good and fresh......I spend my time in reading books and in writing and in my thoughts."

In the course of another letter to his sister-in-law on June, 4, 1953, Dr. Mookerjee wrote :

"Two employees of the jail do our cooking, washing, cleaning, making beds and serving the food. They are both very nice persons. They look after me so solicitously that I am often amazed."

Again on June 4, 1953 he wrote to Sri S. C. Banerjee in London :

"......the authorities are taking all care to meet my physical comforts. My health is fairly all right except I had a bad pain in the right leg for one week due to cold perhaps."

On June 2, 1953 Sri N. C. Chatterjee wrote to Dr. Mookerjee in Srinagar :

"I am glad to know that the Kashmir Government has been treating you properly."

Dr. Mookerjee's Private Secretary, Sri Tek Chand Sharma, who was with him in the camp, wrote to Sri Mahesh Chandra Sharma at Dehra Dun. "Everything is well here. We are all happy......we have no difficulties whatsoever."

Again on May 15 Sri Sharma wrote : "Over here, we are all well and spending a peaceful time......the food is good and the living comfortable......we have only to ask for a thing, as if 'Alladin's Lamp' is at our disposal. The days are spent in eating, reading, writing and conversation. Every day we get the 'Hindusthan Times', 'Hindusthan Standard' and 'Taj' from Delhi by air which give us all the news."

On June 5, 1953 Sri Tek Chand wrote to Sri Bhupal Singh Gupta of Delhi : "......and so in this state of mind we are enjoying a fine, long picnic. It is really an exciting and stirring sensation to be enjoying all the lovely beauty of Kashmir in this capacity.

Well, we are all happy and in good health. Doctor Sahib is slightly indisposed today. There is little pain in his right leg but there is nothing serious to be worried about......".

On the day of his arrival, Dr. Mookerjee was examined by Dr, Ali Mohammed, M.R.C.P. (*Edin.*), physician specialist of the State Hospital.

Dr. Mookerjee made his own choice of food. The Superintendent of Jail, Sri Sri Kanth, an officer with long experience, was personally made responsible to look after the comforts and amenities in Dr.

Mookerjee's camp, and a jeep was specially provided for the purpose.

He and his colleagues were provided with newspapers, books and articles of stationery and arrangements were made to carry mail to and from the camp every day.

They moved about freely in the garden. Later on, in response to his desire, as conveyed through Sardar Hukam Singh, M.P. and Col. Sir Ram Nath Chopra, Director of Health Services and Inspector-General of Prisons, it was agreed that Dr. Mookerjee, if he so liked, may be permitted to have longer walks outside the premises of the garden.

On May 15, 1953, Col. Chopra inspected the camp and sent the following report to the Minister of Health :

"Accompanied by the Superintendent of Jail, Srinagar, I inspected the sub-jail which is at present housed in a small rented house. The house is situated in a beautiful garden with excellent outlook and view. The house has ample furniture for the comforts of the detenus. The accommodation is sufficient for the three detenus who are housed there at present. The arrangements made by the Superintendent of Jail with regard to their food are excellent and the quality of the food supplies cannot be improved upon.

The health of the three detenus is good. Dr. Syama Prasad Mookerjee is in good health and desires :

(1) That he may be allowed to have longer walks (outside the the premises of the garden) ;

(2) That (more) literature in the form of journals and books may be supplied to him :

(3) He said that he was anxious about his daughter who was recovering from tuberculosis of lungs. She had returned from Switzerland after treatment and was at present in Delhi in a very warm climate quite unsuitable for her condition.

Dr. Mookerjee said that as he was not sure how long he would have to stay here, he was anxious that his daughter should get away from Delhi and should come up to Kashmir provided arrangements could be made to give her treatment of lung collapse by injecting air twice a month which she was receiving. I said that there would

be no difficulty about this and our tuberculosis specialist would attend her and do the needful."

The request for journals and books was complied with immediately. Besides, the detenus were allowed to get books and journals from their friends also.

On May 19 Dr. Mookerjee complained of pain in the right leg in the right calf. It was accompanied by slight swelling and varicose veins were observed. The pain disappeard within two days under rest and treatment but as a precautionary measure after-care was continued for about a week more.

Again on June 5 he had a slight pain of the aching type in the right calf without any temperature and swelling. He was seen by Dr. Ali Mohammed, accompanied by Dr. Prem Nath Dhar, House Surgeon of the State Hospital the same day. The past history of osteoarthritis and probably also of gout was taken into consideration and treatment given accordingly. He recovered within a couple of days.

On June 9, Col. Sir Ramnath Chopra again visited the camp and sent the following report :

"Today I found Dr. Mookerjee quite cheerful and fit although there is still some pain in the leg. He is being looked after very well and his feeding arrangements are in every way satisfactory. He is being supplied plenty of reading material, papers etc., to keep him occupied."

The period between June 9 and the date of Dr. Mookerjee's demise, 3-40 a.m. June 23, is covered by a subsequent report received from Col. Sir Ramnath Chopra which says :

"He remained in perfect health up to June 19. The Superintendent of Jail, Pt. Sri Kanth was with him on the said date up to 6-00 p.m. and Dr. Mookerjee had no complaint of any ailment to make."

On June 16, 1953, Sardar Hukam Singh, M.P. met Dr. Mookerjee and, as has been publicly stated by him, found the latter "quite all right."

Sardar Hukam Singh, it may be stated, had met Dr. Mookerjee

in an attempt to find ways and means of ending the Praja Parishad agitation of Jammu. Subsequently, he met Sheikh Sahib and conveyed to him Dr. Mookerjee's suggestion for facilities for a meeting with Pt. Prem Nath Dogra. Accordingly Pandit Dogra was brought to Srinagar on 19th June 1953 and put up with Dr. Mookerjee.

On 20th June the jail authorities received a telephone message that Dr. Mookerjee was indisposed. The Medical Officer in chaige, jail dispensary, Pt. Amar Nath Raina, and Dr. Ali Mohammed went immediately to see him. He complained of slight pain on the side of of left chest, lower part, Temperature was 99.2 degree, pulse 90, pleuritic friction of heat of left infraxillary region ; diagnosis dry pleurisy. Dr. Mookerjee gave history of an attack of dry pleurisy in 1937, of relapse in 1944. A proper treatment including antibioties was administered. His condition improved and he felt much better afterwards. Still, as a precautionary measure, he was kept under medical supervision.

On the morning of June 22, Superintendent, jail, received a telephone call from Guru Dutt Vaid, who was staying with Dr. Mookerjee informing him that Dr. Mookerjee had an attack of pain in the chest followed by perspiration. Accordingly, Dr. Ali Mohammed with the superintendent, Central Jail, hurried to the villa reaching there at 7 a.m.

On enquiry, the history given was of pain in the heart area lasting for about 2 minutes. He had perspiration and sensation of fainting. He was fully conscious. Immediately restorative measures were given and his condition improved. It was decided to shift him to Nursing Home in the State Hospital, Srinagar. Dr. Ali Mohammed was with him up to 9 a.m. and when he saw that the patient's condition was better, he hurried to the hospital in order to make necessary arrangements for his reception in the Nursing Home. The Medical Officer, jail dispensary, was left there to watch the patient.

At noon, Dr. Mookerjee was taken to a comfortable car from the villa to the Nursing Home. From the main gate on the hospital he

was carried in a wheeled chair up to the lift and then again in the same wheeled chair he was carried up to his bed in the Nursing Home.

As has already been stated in the medical report issued by the Government on June 23, 1953, he was examined in the Nursing Home by two physician specialists namely, Dr. Ali Mohammed M.R.C.P. (Edin.) and Dr. Ramnath Parhar M.D. (Edin). All examinations aud investigations including electro-cardiogram were made and a provisional diagnosis of heart attack of coronary type was made. The patient related that he had a similar attack in the year 1937 and once again a few years later. Appropriate treatment was prescribed including sedatives, antibiotics and aminophylline. Patient's condition was fairly good He was kept under constant nursing and medical attendance.

When asked whether he would like his relatives to be informed about his removal to the nursing home, Dr. Mookerjee said that he would prefer to inform them himself. At about 2 p.m. on June 22 he sent the following telegrams :

(1) To Justice Mookerjee, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.

"Sudden dry pleurisy three days ago. Better today. Fever pain much less. Removed hospital. Satisfactory medical arrangements made. No anxiety. Specially tell mother—Syama Prasad."

(2) To Anutosh Mookerjee, Somamoy Boring Road, Patna.

"Sudden dry pleurisy three days ago. Much better today. Removed to hospital. Satisfactory medical arrangements. No anxiety —Bapi."

(3) To Mrs. Banerjee, 30, Altamont Road, Bombay.

"Sudden dry pleurisy three days ago. Pain fever less today. Removed to hospital, No anxiety. Inform Hasu, Bowma and see they do not worry—Syamaprasad."

At 7-30 p.m. Dr. Mookerjee was seen by the District Magistrate, Srinagar, and Mr. Trivedi his counsel. The surgeon specialist, Dr. Girdhari Lal Kaul, who is also the Assistant Superintendent of the Hospital was present. Dr. Mookerjee appeared quite cheerful

at the time and while attending to some work such as dictating notes to his counsel and signing cheques he cut jokes with those present.

At 9 p.m. his general condition was fairly good, except for low blood pressure, i.e. 102-80 as recorded by Dr. Ali Mohammed.

At 11 p.m. the patient felt restless and oxygen was administered. At this time, his blood pressure was 100-80 as taken by Dr. Jagannath Zutshi, the House Surgeon, who was in attendance. Glucose with aminophylline was given intravenously.

His condition improved subsequently as recorded by Dr. J. N. Zutshi, House Surgeon. However, At 1 a.m. Dr. Mookerjee had a setback and his condition did not improve thereafter. The end came suddenly at 3-40 a.m. and Col. Moitra and Major Mehta of the Indian Army Hospital and Dr. Chopra, whose help had been requisitioned, arrived at the Nursing Home a few minutes too late.

It has already been stated that Sardar Hukam Singh met Dr. Mookerjee on 16th June and found him "quite all right." Further, Col. Sir Ram Nath Chopra has mentioned in his report that Dr. Mookerjee "remained in perfect health up to June 19." It is thus evident that till June 19 Dr. Mookerjee was in a satisfactory state of health.

I have shared the facts with the public. The tragedy developed with a swiftness no less unexpected in Kashmir than in other parts of the country. In this common sorrow, there is no room for recriminations, for despite all efforts, a great figure has passed away.

D

MAULANA AZAD'S STATEMENT ON 23-6-53

Maulana Abul Kalam Azad in a statement said he had learnt with deep sorrow the death of Dr. Mookerjee.

"Whatever be our political differences with Dr. Mookerjee," he said, "the hand of death has wiped them out. What we remember today vividly are his fine qualities and the record of his service to the country."

Maulana Azad said: "I have learnt with deep sorrow that Dr. Syamaprasd Mookerjee died early this morning in a nursing

home at Srinagar. He caught a chill three days ago which developed into dry pleurisy. The Government of Jammu and Kashmir immediately transferred him to a nursing home and arranged that his friends present in Srinagar should be by his side. His condition deteriorated and at 1 A.M. he had a heart attack. At 3-30 A.M. he passed away. The Government of India have arranged a special plane to carry his body to Calcutta.

"I understand the Government of Jammu and Kashmir are issuing a communique with necessary details.

"We remember today vividly his fine qualities and the record of his service to the country. My personal relations with Dr. Mookerjee date back to 1935. We have been friends since then and our friendship has endured in spite of all political differences.

"I would like to convey my condolences to the members of his family in their bereavement."

—*Amrita Bazar Patrika*, 24th June, 1953

E

SK. ABDULLA'S SPEECH ON 26-6-53

Srinagar, June 26.—Kashmir Premier, Sheikh Abdullah, said here yesterday that the death of Dr. Syamaprasad Mookerjee was an unfortunate occurrence. Sheikh Abdullah said, Dr. Mookerjee's death was all the more regrettable because the Government was considering to send him to Delhi immediately after Sri Jawaharlal Nehru's return to India.

The Kashmir Premier was addressing the Delhi teachers' goodwill mission now touring the Valley.

Referring to the circumstances under which the Jan Sangh leader was detained and arrested in the State for defying the permit system, Sheikh Abdullah said even though "the permit system means some difficulty for us, we have to submit to the needs of the national security of India as defence of the country is paramount for every Indian."

The Premier added that though technically Dr. Mookerjee was under detention "the Government had allowed him all facilities particularly in view of his weak state of health."

He said Dr. Mookerjee had "moved to the Nursing Home reluctantly as he felt that his ailment was not serious."—U.P.I.

— *Hindusthan Standard*, 27th June, 1953.

F

MR. JAWAHARLAL NEHRU'S STATEMENT (EXTRACTS)

"I was on the point of leaving Geneva by air for Cairo when I heard the news of Dr. Syama Prasad Mookerjee's death. The news stunned me as it was wholly unexpected. About a month earlier, I had paid a brief visit to Srinagar. I had made enquiries then about Dr. Mookerjee, about his health and where he was kept. I was told that he was keeping very well and I was shown where he was staying. This was a lovely Villa by the side of the Dal Lake and adjoining the famous Moghul Garden called the Nishat Bagh. The Villa had a little garden with fruit trees and flowers. From the accounts I had I was happy to learn that Dr. Syamaprasad Mookerjee was living in healthy and agreeable surroundings and was being well looked after. I had hoped that, in these conditions and in the excellent summer climate of srinagar, he would improve in health.

The shock, therefore, of the news of his death was all the greater because it was so utterly unexpected. He and I had often differed in our views in regard to political matters and we have had many an argument in Parliament. But however much we differed, we respected and had affection for each other and his passing away is a severe loss. Parliament, of course, will be much poorer. We are poor enough in men of outstanding ability at a time whent he country demands all that is best in us.

The fact that Dr. Syamaprasad Mookerjee died in detention makes his end particularly sad and painful. The Kashmir Government went all out to treat him with every courtsey and to offer him every convenience that was possible in the circumstances. To them his death was a severe blow. The end came suddenly. It is easy for all of us to be wise after the event and to point out what should have been done and was not done. But till the very evening prece-

ding his death no one suspected what was going to happen and Dr. Mookerjee himself met his lawyer friends that day and sent reassuring telegrams to his relatives in Calcutta telling them not to worry.

Within a few days of his death, Dr. Mookerjee had long interviews with Sardar Hukam Singh, his lawyer, and Pandit Premnath Dogra of the Praja Parishad. He was discussing with them, so I am told, the question of withdrawal of the movement with which he had become associated.

The Kashmir Government had decided to release him within a few days, but that was not to be, and tragedy supervened and found another release for him.

I can well understand the shock that his numerous friends and others experienced when they heard of this sad event for which they were so totally unprepared. But sorrow should not lead us astray from right and balanced thinking. It should lead us rather to a deeper and calmer consideration of even wider issues. A leading personality amongst us has passed away and the burden is all the greater on those who remain...."

Hindusthan Standard, July 3, 1953

G-1

STATEMENT OF SRI GURUDUTT VAID. A CO-DETENU WITH DR. MOOKERJEE ; DATED 25-6-53

We, Dr. S. P. Mookerjee, Sri Tekchand, myself and others, started from Delhi on the 8th May morning. Dr. Mookerjee issued a statement containing the purpose of Dr. Mookerjee's going to Jammu. It was to find out facts there ; to see some persons there and to find out ways and means by which further action for the settlement of Kashmir issue may be taken. During our tour in the Punjab Dr. Mookerjee sent a telegram from Ambala to Sheikh Abdullah. In that telegram he expressed his intention to go to Jammu to find out ways and means for settling Jammu and Kashmir problem. He also expressed his desire to see Sheikh Abdullah, if possible. Dr. Mookerjee sent copy of the telegram to Sri Nehru as well. After the two days' tour of the Punjab, on the

10th evening, when we were boarding the train from Jullunder, a gentleman sitting inside the compartment got himself introduced to Dr. Mookerjee as Disrtict Magistrate of Gurudaspur. He informed Dr. Mookerjee that he would not be allowed to reach Pathankot. He had instruction of the Punjab Covernment to be ready to arrest him. Of course, he could not say the time and place where he would be arresting him as he was waiting for further instructions. The Gurudaspur District Magistrate was coming from Simla after attending a Conference.

At Fagwara on the 9th May, Dr. Mookerjee had already received a reply to his telegram from Sheikh Abdullah copy of which is attached). When we entered Gurudaspur district on the 11th and at Batala the local S.D.O. entered our compartment, remained sitting with us and introduced himself to Dr. Mookerjee. But he told him that he had not come to arrest him but simply to escort him through his area. His area was over at Gurudaspur and the S.D.O. of Gurudaspur came and sat by when the first man left. He went with us up to Pathankot. At Pathankot the District Magistrate and many other officials were present on the platform but they did not arrest us nor did they speak to us. At about 12 o'clock a message came from the District Magistrate, Gurudaspur, to the place where we have been staying to the effect that he wanted to see Dr. Mookerjee. So he came at about 1 P.M. He informed Dr. Mookerjee that he had received a message from his Government to allow him and his party to proceed to Jammu, in spite of the fact that Dr. Mookerjee and his party had no permit. He offered help to procure conveyance etc., to us to go to Jammu. In fact one of his subordinate officers took some of the persons of the party in his jeep up to Madhopur check post. At Madhopur check post the District Magistrate and all his officers were standing and the District Magistrate wished us good journey. The driver of our jeep had at that time complained that he had no permit to enter Jammu State. We demanded a permit from the District Magistrate. He stated that we should proceed and the permit would follow us. So we proceeded but when we had traversed half the Ravi Bridge

Jammu police officers and good many constables were found to be standing there and one Mr. Aziz, Superintendent of Police, Kathua, informed Dr. Mookerjee that he had to perform a very unpleasant duty to ask him not to proceed further as his Government had issued an order prohibiting his entry in Jammu and Kashmir State and he showed the order. Dr. Mookerjee told him that he had been allowed by the Indian Government to go into the Jammu and Kashmir State and he would proceed to that place.

On this the Superintendent of Police produced another order from his pocket arresting him. On my and Sri Tekchand Sarma's declarations that we were also going to Jammu with Dr. Mookerjee, Mr. Aziz told us that we were also under arrest without showing us any order. At Lakshanpur post we were kept for about half an hour and one gentleman saying that he was the Inspector General of Police, Jammu and Kashmir State, told us that we both were under arrest and he read an order from the paper. And after that myself, Sri Tekchand Sarma and Dr. S. P. Mookerjee were made to sit in a jeep and under police and military escort consisting of a Captain and some Kumayun regiment soldiers, were taken to Jammu and from there to Kashmir.

We reached at Udampur at 10-30 p.m. where we took our night meals in a Dakbungalow. Dr. Mookerjee expressed that he was feeling very tired and he also said that he was in the habit of sleeping early. So he would like to stay there instead of proceeding further. But the officer in charge, that Captain, told us that there was no room in the Dakbungalow available and they had got a room reserved for us by telephone at Batote Dakbungalow and we had to go there. So after half an hour's stay there we proceeded to Batote and reached there at about 2 A.M. So we stayed at Batote for the rest of the night. We started from Batote after taking the morning tea at 7-30. We reached Kazikundu at about 1 P.M. There we took our lunch and started from there at about 2 P.M. and reached the Central Jail, Srinagar, at 3 P.M. After preliminary enquiries etc. we were taken to a cottage near Nishat at about 4 P.M. There the Superintendent of Jail, the District Magistrate, Srinagar and Doctor

Ali Mohammed came to see us. They all enquired about Dr. Mookerjee's health and then we were allowed to stay there.

Three days after our arrival there Dr. Mookerjee fell ill of pain in the right leg and he had temperature. We had no thermometer and therefore we could not say what his temperature was. The doctor came the next day and prescribed Belladonna plaster and a mixture for taking in. What the prescription of the mixture was we did not know. It was sent from the hospital. He expressed his opinion that it would be better if Dr. Mookerjee was taken to the hospital and he would speak to the authorities. For three or four consecutive days another doctor named Premnath came and applied plaster. Dr. Mookerjee was all right in four or five days' time. After a fortnight Dr. Mookerjee fell ill again of the same trouble having pain in the leg and fever. Dr. Ali Mohammed came again and prescribed Belladonna. Another doctor came and applied this Belladonna. Dr. Mookerjee was all right after two or three days.

Dr. Mookerjee had been constantly complaining to the Superintendent of the Jail, to the Inspector-General of Prisons and to District Magistrate, Srinagar, that there was no sufficient space to walk inside the Bungalow and he might be given permission to go out for at least an hour a day. In fact, the Superintendent of Jail and the Inspector-General of Prisons allowed him to do under police escort. But the police did not obey them and Dr. Mookerjee was never given an opportunity of going outside. The police in charge wanted a written order from the Superintendent of Jail and it was never sent. We heard from Mr. Trivedi when he came for interview on the 16th June that permission for taking him out for walk had been given but the actual order never reached there till Dr. Mookerjee fell ill for the third time.

On the night between the 19th and the 20th June Dr. Mookerjee felt pain in the back and he had high temperature. In the morning when we saw the temperature in thermometer it was 99·4 and the pain was acute. The doctor was called. He came at about 11-30 and examined Dr. Mookerjee. He declared that Dr. Mookerjee was suffering from dry pleurisy and prescribed streptomycin injection

and some powders, the prescription of which was not shown to us. The doctor said that his blood and urine ought to be tested but this was not done so long Dr. Mookerjee was up to the point he was removed to the hospital. The doctor advised that he might take two powders a day and if the pain is acute he might take more of them up to 6.

Dr. Mookerjee told the medical officer, Mr. Ali Mohammed that his family physician, Dr. Bose had advised him not to take streptomycin because it does not suit his system. On this Ali Mohammed said that this advice was given long ago and now we know much better about this drug. So Dr. Mookerjee need not worry, he would be all right. The medicine came about 3-30 P.M., the injection, full one gram, was given. One powder was also given. The doctor left five remaining powders saying that he would take them at least one and if need be more that night. The injection was given by the jail doctor and not by Ali Mohammed.

Dr. Mookerjee told the Superintendent that news of his illness should be sent to his relatives. That night Dr. Mookerjee was feeling very restless but by the morning the pain was little less and the fever also little lower than what was in the previous day morning. On that day at about 10 o'clock in the morning the jail doctor came and gave another injection of streptomycin, one gram, and supplied more powders. After the injection had been given in the morning by the jail doctor no other medical man either the jail Doctor or Dr. Ali Mohammed had come to see Dr. Mookerjee on that day or in the night until the next morning i.e., 22nd June as stated later on. The Sub-Inspector of Police in charge came in the afternoon to Dr. Mookerjee to enquire how he was and got the information as above.

There was no arrangement made by the doctor for nurses in the sub-jail. In the evening about 4 P.M. the pain increased and fever also increased a little up to 100·2. In the night at about 11-30 on the 21st June Dr. Mookerjee felt that the pain was increasing and according to the instruction of the doctor he took another powder. I left his room after 11-30 when he felt sleepy.

Next morning i.e. 22nd June I was awakened by the jail servant

at about quarter to 5 who told me that Dr. Mookerjee wanted me immediately. I went into his room and found him to be fainting, perspiring and looking very depressed. I saw his pulse. It was very feeble and his whole body was very cold. Dr. Mookerjee told me that he was perspiring for the last half an hour, he was feeling giddy as if he was going to faint. Dr. Mookerjee also told me that he slept from about mid-night to about 4 in the morning when he woke up with the pain in the heart region and with perspiration. At first he thought that he would recover without disturbing anybody but finding the trouble increasing and was about to faint he called the servant. He had called him several times as he could not get up.

The sub-jail was a small bungalow with three small rooms at a distance of about 7 miles from Srinagar and about 10 miles from the hospital where Dr. Ali Mohammed is stated to be living. We immediately gave to Dr. Mookerjee a little 'darchini' and a little sugar, 'labanga' for sucking and in five minutes' time Dr. Mookerjee began to feel better and in about 15 to 20 minutes' time the perspiration had stopped, the pulse had become stronger and the heart pain was also decreasing.

At that time I asked the Hawaldar to telephone to the Superintendent of Jail to send for the doctor and the Hawaldar took me with him and I telephoned to the Superintendent at the Central Jail between 5-15 and 5-30 and gave him the particulars of Dr. Mookerjee's condition. He informed me that he was coming with the doctor immediately. There was no telephone at the place where we were staying. There was only one telephone at the water works office which is closed except during the office hours. So it took some time to get somebody to open it. The Superintendent came with Dr. Ali Mohammad at about 7-30 P.M. He examined Dr. Mookerjee. At that time Dr. Mookerjee was feeling better. The body had become warm except the finger tips. Dr. Ali Mohammad stated that the pleurisy is much better and it was on account of low blood pressure and of lowering of the temperature that this heart trouble had been felt. The temperature of Dr. Mookerjee was 96.8 in the mouth but

at about 5-15 the perspiration had stopped and the body was getting warm. When the doctor examined him the temperature was 98 under the tongue.

Dr. Ali Mohammad gave him coramine injection, 2 c.c. on the arm. Dr. Ali Mohammad had another doctor with him at that time. Dr. Mohammad asked the other Doctor to get a syringe ready with 2 c.c. coramine but the doctor said 2 c.c. would be too much for one injection. To that Dr. Mohammad said that Dr. Mookerjee had a very heavy body and 2 c.c. is all right, and then he told Dr. Mookerjee that he was asking the authorities to remove him to the hospital.

I asked the Superintendent of the Jail to allow us to stay with Dr. Mookerjee in the hospital. At least one of us should be allowed to remain with Dr. Mookerjee in the hospital. He said that that was not possible. Dr. Ali Mohammad said : "I understand your anxiety but you need not worry, he will be perfectly safe in our hands." I asked Superintendent of Jail to take one of the jail servants who had been serving Dr. Mookerjee in the jail for the last few weeks to the hospital to serve him there also. The Superintendent said that it was not necessary. The Superintendent of Jail also told us that it would not be possible for him to arrange for our food in the hospital as arrangements would be made for Dr. Mookerjee's diet.

Dr. Ali Mohammad left us asking the Superintendent to take Dr. Mookerjee in an ambulance to the hospital. The jail doctor remained with us. At about 10 Mr. Trivedi came and saw Dr. Mookerjee. After consulting Dr. Mookerjee about the case he left at about 11 and the Superintendent with the motor car came to us at about 11-30. Dr. Mookerjee was removed in a chair from his room to the car standing outside the bungalow and then he was taken away in a small 4 seated car, which was very uncomfortable for a heart patient.

We did not hear anything about Dr. Mookerjee till 7-30 in the evening. At 7-30 a telephone call came for me and I had to go to the place where the telephene was installed and the Superintendent of Jail told me that he was coming from the hospital and Dr.

Mookerjee was feeling much better.

Next day the 23rd June the Superintendent of Jail woke me at about quarter to 4 in the morning and wanted me, Mr. Sharma and Premnath Dogra who was also staying with us for the last three days to accompany him to the hospital immediately. I asked him what was the matter. He told me that he had been asked by the D.M. on telephone to take us to the hospital without telling him what for. He himself did not know anything else.

We started at about 5 minutes to 4 A.M. and reached in the hospital at about 4-30 and there I was informed by Mr. Trivedi who was already there that Dr. Mookerjee had expired. After 10 minutes I asked the permission of the doctor to go into the room and see the body myself. I, Sri Tekchand Sharma and Premnath Dogra went into the room and saw the body. But that time the body was all cold. When we were coming out of the room Sri Tek Chand Sharma asked a nurse who had followed us into the room "at what time Dr. Mookerjee expired." The nurse replied at 2-30 A.M. She also added that Dr. Mookerjee at about 1 P.M. expressed his wish to have his companions with him.

Two days previous to the last illness Dr. Mookerjee had lost appetite and was taking very little food. From the day it was declared that he was suffering from pleurisy the doctor said that he could take anything he liked but Dr. Mookerjee took only tea, coffee and vegetable soup. On the 20th and 21st he took two cups of vegetable soup and one or two cups of tea and a cup of coffee in a day. He took a little orange juice also on the morning of 22nd on the advice of the doctor.

It is a matter of regret that a precious life was lost in circumstances which I feel could admit of more efficient handling.

(*a*) Medical assistance was not available on the spot where Dr. Mookerjee was detained even when his condition became serious.

(*b*) No nursing arrangements were at all made in the place of his detention.

(*c*) No laboratory tests were made so long he was in the sub-jail.

(*d*) None of his fellow detenus were permitted to be at his bed side when he was removed to the hospital.

Even after Dr. Mookerjee expressed the desire that his fellow prisoners should be brought to the hospital no information was sent to them till he passed away.

(*e*) No intimation was at all sent by the Kashmir authorities to Justice Mookerjee, his mother and his other relatives nor was any attempt made to have the service of an independent competent medical practitioner.

(*f*) In spite of Dr. Mookerjee's protest based on competent medical advice during his previous illness at Calcutta streptomycin was administered to him without a previous pathological examination or without consulting his Calcutta doctors who were available on the phone.

G-2

STATEMENT OF SRI U. M. TRIVEDI, COUNSEL FOR DR. MOOKERJEE :—DATED 25-6-53.

I met Dr. Mookerjee for the first time on the 12th inside the cottage where he was kept in detention. I was accompanied by the District Magistrate, and after a few formal words of greetings I asked Dr. Mookerjee to move to a room where I could get instructions from him in private after he had so moved into the room. The District Magistrate who had accompanied me informed me that the Government had instructed him to allow instructions to be given entirely in his presence and within his hearing. I immediately refused to have any such instructions and took the District Magistrate with me where Dr. Mookerjee was sitting and conveyed to him the conditions under which the interview was being granted. He agreed with me and he also refused to give instructions. I, therefore, left Dr. Mookerjee, but at that interview I formed an impression that he was not looking cheerful. On my return to hotel I was interviewed by some Press reporters and conveyed my idea of his not being cheerful which I think was reported by the ***Hindusthan Standard.***

I again met Dr. Mookerjee on the 18th at 9 o'clok. I had free

discussions with him for about 3 hours and I drafted a petition for him and also an affidavit to be sworn in the presence of the District Magistrate. He did not like the idea of my suggesting that Dr. Mookerjee was not cheerful because he felt that probably his family might construe it in some different light. At this interview he was quite jolly and I conveyed to him the information which was given to me by the Government that his request for taking him out for a walk had been granted.

I again saw Dr. Mookerjee on the 22nd morning at about 10 o'clock. Before I reached the place of detention I was informed by the Superintendent of Jail that Dr. Mookerjee was not feeling well and under instructions of the doctor he was to be removed to a Nursing Home and arrangements were being made to remove him there. I enquired from him where this nursing home was. He was very reticent and did not disclose the whereabouts of the nursing home. My interview with Dr. Mookerjee on this day lasted for about an hour from 10 to 11.

I found him reclining in bed, but he looked quite cheerful. He mentioned to me that probably he would have passed away in the early hours of the morning—"Mere Bhai Panch Baje To Chale Jatha Tha". It was then only the seriousness of his illness was felt by me. I enquired from him how he was feeling then. He told me that he had no pain and was feeling quite all right. However, I did not feel very satisfied. I told him, as it was time for me to attend the Court I would then leave him, but see him positively in the evening again. I left Dr. Mookerjee at about 11 and on my way to the Court I met the Superintendent and another gentleman coming in a small car. The Superintendent informed me that he was going to bring Dr. Mookerjee and take him to a Nursing Home. I then went to the Court and there I found I had left some reference books in the hotel. So I sent Mr. Devki Prasad—that young friend of Dr. Mookerjee who had made an application there—to fetch the books from my hotel. This was about mid-day. Devki Prasad on returning told me that he saw Dr. Mookerjee being carried in a small car towards the City and he also informed me that there was no Nursing Home

in the direction in which the car was going.

After the Court work was over at about 5-15 P.M., I contacted the District Magistrate and asked him to take me to the place where Dr. Mookerjee had been kept. Before that I had sent out at least 5 young men to hunt out practically all known Nursing Homes if it was anywhere near and I received information that in none of the Nursing Homes Dr. Mookerjee was kept. In the meanwhile, the District Magistrate came down to me in his own car and picked me up to take me to Dr. Mookerjee. I was taken to the State Hospital, about 3½ miles from my hotel and I was taken to Dr. Mookerjee in room No. (1) of Gynaecological Ward of that Hospital on the first floor. I found Dr. Mookerjee in bed in a reclining condition. He looked very pale though smiling. I remarked to him that he was not as well as he was in the morning. But he would not accept that. He said that he was feeling a little better. Then the District Magistrate gave him all his letters (about 15 or so in number). He went through all the Dak, one of which was a telegram from Poona, from one Meera. I read out that telegram to Dr. Mookerjee.

I then enquired of him if he wanted me to send out some telegrams to his relatives or to Hashi at Poona. He informed me that he had already despatched three telegrams through the District Magistrate. The District Magistrate was standing by my side. He confirmed sending the telegrams. And I further enquired from Dr. Mookerjee if he wanted anything more to be said in those telegrams. He said nothing more was required to be said, and there was no cause for any particular anxiety. At that time there were certain papers from some firm in liquidation and Dr. Mookerjee sat up in the bed, took up his fountain pen and went through that correspondence and signed about six or seven statements and 2 cheques.

Then he asked me to write down a letter to one Sailen. He joked with me saying, "Your handwriting is bad ; I can read it, but none else can, so how can I dictate letters to you ?" etc. I wrote out the letter and he signed that letter. At that time the doctor who was present there inside the room and the Medical

Superintendent, Girdharilal asked me to convey to Dr. Mookerjee t hat he should not try to sit up in bed. After signing that letter he again reclined and at the time of reclining he placed his hand on his heart and his face indicated that he felt some pain.

I had some idle talk with him and continued to sit with him right up to 7-15 or 20 P.M.—may be above 25 also. I did not feel very happy about his condition. I took the doctor a little away and enquired how *did* he feel about the condition of Dr. Mookerjee. He said there was nothing to be afraid of ; the crisis, if any, had already passed and the next morning he would be X-rayed and he further told me that within 2 or 3 days he would be quite fit.

However, I did not feel satisfied even then, because I did not like the look of Dr. Mookerjee. I was thinking of going away the following morning by plane to Pathankote, but I cancelled my idea and told him that unless I saw him quite happy on the following morning I would not leave. When I was parting company at about 7-30 or so he asked me to bring some periodicals for him. I asked him what particular type of literature he wanted. Then he said anything that interested me would interest him also. He was also a human being, and anything that interested others would surely interest him also. He could also read what I could.

"Bring anything, but do bring something, and spend some money over it." I then placed my hand on his in order to feel if there was any temperature. I found it normal and I left him with a promise to return the next morning.

Inside the room I found one nurse who was always standing by and outside the room I found some police guards posted. So I requested the District Magistrate to allow me to visit him about 9 in the morning. But the doctor suggested that I should come at about 8 as he would be X-Rayed at about 9 o'clock. The District Magistrate asked the guard on duty to allow me to come. At this interview of mine, the petitioner on behalf of Dr. Mookerjee had accompanied me and he was also allowed to see Dr. Mookerjee.

Next when I heard about Dr. Mookerjee was only at about quarter to four in the early morning of 23rd. The Superintendent

of Police informed me that Dr. Mookerjee's condition was rather serious and the District Magistrate had asked me to come to the hospital to be by the bed side.

I immediately went there reaching there at 5 minutes to four. I found the door of Dr. Mookerjee's room closed and one doctor seated in the visitors' room. I was asked to sit by his side, but I became restless as I could not tolerate sitting like that. So I enquired within a minute about the condition of Dr. Mookerjee.

The Superintendent of Police, of course, said that Oxygen was being given. Then I told him—"Let us go and sit inside the room ; go and find out whether I could go in."—He went inside the room and returned with the doctor who informed me that Dr. Mookerjee had passed away five minutes before my arrival in the hospital.

Then I was taken into the room. I found the body covered up. I removed the cloth from above his head and found him dead.

Within 5 minutes of my arrival, the District Magistrate arrived there and the Deputy Home Minister also arrived. I had a talk with the Deputy Home Minister. I informed him then and there that I would like to take the body to Calcutta and he must make arrangements. And if he cannot he must allow me to contact the Goverment of India.

He promised me he would be able to do that. I then asked him to send messages to his family members immediately and contact his Calcutta house so that the news may be broken to his mother not by any announcement from All-India Radio, but by some of his relatives concerned. I also asked him to send for the co-detenus and he informed me that they had all been sent for. While I was still at the hospital all three of them arrived. I gave them the news and as the Home Minister Mr. Ghulam Mohamed Bakshi had already arrived there, I asked him to release all the detenus who were there and allow them to accompany me in the aeroplane. He, therefore, asked them to be carried back immediately and get their things packed.

This was at about 4-35 A.M. The Deputy Home Minister had already gone to convey the news. I also returned to my hotel at

about 4-50 A.M. and I phoned up All-India Radio man and the "*Times of India*" representative as well as the U.P.I. man, and asked them to come to my hotel. The "*Times of India*" man and the All-India Radio man arrived within 5 minutes and I conveyed this news to them. Till then they did not know anything.

I then tried to get telephonic call to Delhi to Mouli Chandra ; I could not get him. Then I tried to get a call to Jammu, but I did not get it. I was informed by the All-India man that he had tried for full 2 hours and he also did not get any connection. At about 8 o'clock, again I went to the hospital and met the Deputy Home Minister. Then he told me that he could not get direct phone call to Calcutta, but he was able to talk with Justice Mookerjee through the operotor, and he also sent messages to Bombay through Delhi. He also told me that he had already talked to Dr. Katju before 5 A.M.

In the meantime about 500 people came to the hospital and gathered at front gate and so the body was taken through the back door.

About 8 o'clock I asked for his things. I got his wristwatch, fountain pen and a suitcase ; the attache case was not there. There was no key, nor any lock to the suitcase. Chappals were lying outside. The specs were there, but not the case.

After we left for the aerodrome at about 8-40 the police staff who happened to be all Hindus—the Superintendent, the Deputy Superintendent, Sub-Inspector, and one Head Constable—did not like the idea of Mohammaden staff touching the body.

The Police Officers suggested that if the body had to be lifted to the stretcher I might make a suggestion that their services should be utilised for the purpose, and Mohammadens need not touch. So I asked the District Magistrate to call the detenu friends. I had also asked for their release and also requested the Home Minister to release Premnath Dogra also who was undergoing long sentence of imprisonment.

I asked the District Magistrate to arrange for the release of these gentlemen before the body could be lifted, because I felt that at least 10 men would be required to lift the body. At 8-40 these 3 detenus

arrived, but before their arrival the body was brought out with the help of the police officers and the military officers. We carried the body to the ambulance, and all of us who lifted the body sat inside the ambulance itself. We reached the Aerodrome by 9-5.

At the aerodrome all the Ministers except the Chief Minister, Sheikh Abdullah, were present At that time practically all the Ministers expressed their very great regret ; the Finance Minister broke down, the District Magistrate also again broke down. The Chief Minister arrived at about 10-15 A.M. In between there appeared to be some obstruction by the Indian Government authorities about the use of the Indian Air Force Dakota. The Wing Commander and other Officers on the spot were willing to help, and were awaiting orders from the Air Head Quarters to fly. Mr. B. B. Ghosh of Defence Ministry was phoned up, he was not contacted. For about half an hour obstructive messages were being received from the Head Quarters, Delhi.

The Home Minister then asked the Deputy Home Minister to contact Dr. Katju.

When Dr. Katju was contacted the Home Minister himself talked for about 10 minutes and asked Dr. Katju to talk to the Wing Commander then and there and get subsequent ratification from the Defence Ministry for the use of the Indian Air Force Dakota. The weather was extremely bad ; the Civil Aviation had stopped its planes from proceeding ; and Dr. Katju did not feel willing to lend the Dakota.

Then Ghulam Mohamed Bakshi told him that (I was standing by the side and listening to the talk) he must not refuse. Then Dr. Katju spoke to the Wing Commander, but I could not make out what was communicated to him for even after his phone the Wing Commander refused to lend the plane. Bakshi Ghulam Mohamed got wild with him and made him to obey his orders taking the full consequence on himself.

While this telephonic communication was going on Sheikh Abdullah arrived. All the Ministers then joined in lifting the stretcher and put it in the plane after placing wreaths. Sheikh

Abdullah brought a special flowered shawl and placed it on the body. We left the aerodrome at 10-40 A.M. under the impression that we will get down at Delhi wherefrom another plane will take us to Calcutta.

After we passed Kashmir State territory I was informed by the pilot that he had instructions to proceed to Jullunder. Then I told him why not to Ambala ? He told me that the landing ground at Ambala was not good. But at Jullunder he received no instruction to land. He tried to get instructions on the radio, but he could not. We reached Jullunder at 12-30. The plane hovered round Jullunder for half an hour, left Jullunder without landing, proceeded 50 miles to the south, returning back to Jullunder again ; and left Jullunder and landed at Adampur Airport at 2 P.M.

At 2 o'clock when we got down I met the Pilot of the I.N.A. plane there. I enquired how he happened to be there. He was to take off at Delhi. He said that he was sorry. Home Minister had instructed him to pick up here and so he had come. "I have to refill—that I do not know where—and then proceed to Calcutta."

We left Adampur at 2-30 P.M. got down at the military airport at Kanpur.

We got down there and after refill we left again at 5-30 p.m. At Kanpur we calculated the distance to Calcutta and we found out that still we had 560 miles to fly. The officer told me that we would not reach Calcutta before 9 P.M. He would, however, try his best, but he would not be able to reach before 9 o'clock. We reached Calcutta at 5 minutes to 9 P.M.

After reading the Statement of Pandit Guru Dutt Vaid and comparing it with my personal knowledge which I have put down in my statement the following salient features are noticeable :

(1) Dr. Mookerjee was not advised complete rest after the first attack on 22nd morning, 4 o'clock ;

(2) He was not immediately removed to the hospital while 7 valuable hours were lost ;

(3) He was not carried to the hospital in an ambulance but was carried in a small taxi and in uncomfortable position ;

(4) The immediate medical relief was not made available even after entry into the hospital ;

(5) The gravity of the illness was not noticed ;

(6) The Superintendent, jail, was asked to remove Dr. Mookerjee to the hospital early morning but he wasted time and actually sat chatting with Mr. Raina for nearly one and a quarter of an hour ;

(7) The medicine that was given to relieve his pain was not well-studied with relation to Dr. Mookerjee's heart trouble ;

(8) When the Doctors knew that he had heart trouble they failed in doing their duty to issue a bulletin immediately and to study the case with the greatest care possible specially when it appeared to be a case of heart trouble ;

(9) All causes of mental pain ought to have been removed, the posting of police guards at his room and not allowing him the congenial company of one of those who knew him was also bad ;

(10) The treatment for pleurisy might be called expeditious but was symptomatic and not in a studied relation to the physical condition of Dr. Mookerjee and his past medical history ;

(11) The diagnosing doctor left it in the hands of his junior to carry out his behest without reference to Dr. Mookerjee and notwithstanding his suggestions to give him smaller doses of streptomycin and avoiding the use of sedatives.

H

MEDICAL EXPERTS' OPINIONS ON KASHMIR GOVERNMENT COMMUNIQUE

Dr. N. B. Khare, M.D.

Dr. Khare, in a statement on 25th June, 1953, said :—"After carefully studying the communique issued by the Kashmir Government along with the medical report on the illness of late lamented S. P. Mookerjee, I am constrained to say that the treatment given appears to me to be faulty for the following reasons :

1. The patient who was apparently suspected to be suffering from heart-attack—coronary type—should not have been removed from his residence, removal in such cases is always contra-indicated.

2. At 12 noon on the 22nd instant at the Nursing Home when a diagnosis of coronary attack was made, aminophylline which is the recognised treatment for coronary attack should have been given immediately. Why was its administration delayed till 11 p.m. i.e. for eleven hours ?

3. Blood pressure was found to be low, that is 100/80 and after aminophylline was given it was found to have gone lower, that is 90/70. Why was not anti-shock treatment given and measures taken to raise blood pressure, e.g. intravenous injection of Dextran by Drip-method.

Hindusthan Standard, 26th June, 1953.

Dr. N. B. Khare, in a statement, on the 3rd July, further said, "The lengthy and revised Communique of the Kashmir Government on the death of Dr. S. P. Mookerjee not only gives no answer to my previous charge, but serves to justify and strengthen the nation-wide demand for a deep probe into the affairs."

"Medically, this lengthy statement," Dr. Khare said, "is an ingenious attempt to evade the charges levelled by me in my last statement of the 25th June. But the staggering anomalies in the statement have served to defeat the very purpose for which it was issued. Besides the inadequacy of the treatment pointed out by me, I have some more lapses to point out."

Dr. Khare said, "Dr. Mookerjee was supposed to be under care of the physician specialist, Dr. Ali Mohammad. It was he who handled the case from the very start. But it is strange that Dr. Ali's name does not appear anywhere after 9 p.m. on the 22nd June when he last recorded the blood pressure which was found to be low. After 9 p.m. the case was in charge of Dr. J. N. Zutshi, a house surgeon and a person, who was never known to have attended on Dr. Mookerjee. The very fact that the help of the military doctors and Dr. Chopra was requisitioned, though late, lends support to the contention that medical attendance was inadequate and that the attending doctor was at his wit's end. That the doctors arrived after the death means they were informed very late and not at 1 p.m. when the setback occurred. It may be that the doctors were out of the

station or else the seriousness of the situation was not impressed upon them."

Dr. Khare pointed out that the communique reads, "From the main gate of the hospital he was carried in a wheeled chair up to the lift and then again in the same wheeled chair up, to his bed in nursing home." "Since a wheeled chair was found to be necessary to handle the patient, why was not used to carry the late doctor from his room in the villa to the car", he asked. "This means that he was made to walk from his room to the car and this is sheer neglect or callousness. Such patients are not carried in a sitting posture but in a lying position on a stretcher." Dr. Khare added.

"According to the statement Dr. Syamaprasad was taken to the nursing home at 12 noon and at 2 p.m. he wrote a telegram to Justice Mookerjee. It is also mentioned that the tests were carried out and a provisional diagnosis of heart attack (coronary type) was made. The telegram makes no mention of this. Also, the authorites enquired whether they should inform his relatives about the transfer and, mind, not about the heart attack, the diagnosis of which was made previously."

"News of the transfer of Dr. Mookerjee was flashed in the Press on the 23rd morning. The bulletin said that he was afflicted with dry pleurisy. Since the transfer and diagnosis took place between 12 noon and 2 p.m. on 22nd the Kashmir Government knew at the time it handed over the news about the transfer to the Press agencies that the late Doctor was suffering from a serious and dangerous ailment viz. heart attack of the coronary type, a disease in which the end is always sudden. Why was this then not mentioned in the newsflash ? Besides no reason is given as to why was Justice Mookerjee not informed about the affliction even of dry pleurisy, which certainly is not a minor ailment, on the 20th or 21st or even of heart attack on the 22nd." Dr. Khare said and added that the nationwide demand for a deep probe into the affair was fully justified.—(PTI .

—***Hindusthan Standard***, dated 5th July, 1953.

Dr. Naliniranjan Sen Gupta, M.D.

Analysing the medical report on Dr. Mookerjee's death as embodied in the Kashmir Government's Press Communique Dr. Nalini Ranjan Sen Gupta made the following points :

(1) During the first 10 days of his illness, reported by Mr. Justice Rama Prasad Mookerjee and published in newspapers, no medical treatment had been arranged—at least no information of such treatment had been available. For better medical facilities Dr. Mookerjee should have been sent to India or medical aid should have been rushed to him from India.

(2) During the first 10 days of illness Dr. Mookerjee should have been removed to a better climate.

(3) Dry pleurisy had been diagnosed in the morning of June 20. He passed a very restless and sleepless night on June 20-21. In spite of this it appears that no constant medical aid had been arranged during the day and the night following when he was seized with that severe attack with symptoms of collapse at 4 a.m. on 22nd morning. It appears from the Communique that in spite of information to the jail authorities no doctor had arrived till 7-30 a.m.

(4) Dr. Mookerjee's condition was clearly one of coronary thrombosis. All the time between the 20th morning and 6 a.m. of 23rd, even after his death, the official knowledge in Kashmir was that Dr. Mookerjee had died of pleurisy and not of coronary thrombosis. Therefore the story of the doctor having diagnosed the case as coronary thrombosis is either a concoction or was not seriously considered. This is borne out by the fact that the patient was carried 10 miles away to the city—a procedure unthinkable in a coronary case where restorative measures had to be taken at 7-30 a.m. The narration of the facts suggests that the doctor never diagnosed it as coronory and it was only an afterthought.

(5) To keep a man so obviously ill with such a fatal illness in charge of people who cannot even diagnose such severe attacks and if diagnosed, handle him so roughly like a quack is a blunder which definitely cost the patient's life and cannot be condoned or pardoned.

(6) The attending physicians, in practically giving a copy-book line of treatment adopted in coronary thrombosis, never mentioned morfin and anti-coagulants. No doctor worth the name can think of treating coronary thrombosis without anti-coagulants. And as to morfin it is the sheet anchor in our treatment. Pethidine is only a poor substitute and even that was given at 1 a.m., 18 hours after the attack. It seems, therefore, that the doctor either did not diagnose it as coronary thrombosis or if he did, he was soi gnorant of modern methods of treatment that he was the last man to be put in charge of a coronary case.

(7) If coronary thrombosis had been diagnosed many accessory treatments might have been done which were not done at all.

Dr. Amal Kumar Roychowdhury, M D.

Giving his opinion Dr. Amal Kumar Roy Chowdhury said it seemed to him that the diagnosis of the disease by the attending physicians was incorrect. He made following observation on the Kashmir Government's Press Communique.

Dry pleurisy is really secondary to the extension of inflammation from the heart to the pleura and as such the original heart-trouble, it seems, started several days back. In fact, extension of inflammation from one region to the other takes some time. Dry pleurisy may also be secondary to an attack of pneumonia and both these conditions—pneumonia and coronary—particularly at this age in a patient having a previous history of coronary attack—are very very serious.

Before removal to hospital, 10 miles away from his place of detention, nothing appears to have been done to record the pulse rate, blood-pressure, respiratory rate in the sitting and in the recumbent posture. These should have been noted before removal to the hospital.

As regards treatment, accepting that it was a case of coronary attack, detected by electro-cardiograph, the best method of treatment would have been to prevent the shock generally associated with this type of trouble, not by pethidine injection but by stronger drugs, namely, morfin, provided there was no contra-indication to the use of

such drugs. Then also the prothrombin time should have been noted and injection and anti-coagulant drugs should have been given, not aminophiline. Pethidine was administered at 1 a.m. If pethidine was administered at all it should have been given earlier, just when complaints of pain over the heart were made and not several hours after, as stated in the Press Communique.

Then there was no detailed report on blood and urine examination. At a stage of shock with a fall in blood-pressure and rapid pulse, intravenous injection was generally contra-indicated.

So it seemed there must have been bungling somewhere and that proper attention had not paid to the case.

—*Hindusthan Standard*, dated 28th June, 1953

Dr. T. N. Banerjee

Patna, June 23.—On hearing the sad news of the death of Dr. S. P. Mookerjee, M.P. and Jan Sangh leader, Dr. T. N. Banerjee, M.L.C. said : "I was stunned on hearing the news. We read in the paper this morning that Shri Syamaprasad Mookerjee has developed pleurisy but no one dreamt that an intellectual giant and a true patriot of our country will die so soon from a disease which when timely diagnosed and properly treated with modern uptodate medicines saves 99 per cent of its victims.

—*Searchlight*, dated 24th June, 1953.

Ajmer Dctors' Opinion

Ajmer, June 29.—A board of eminent doctors headed by Dr. Ambalal Sharma have issued the following joint Press statement regarding the treatment given to Dr. Mookerjee prior to his death :

"Without entering into political aspects of Dr. Mookerjee's death we simply comment as medical men on the line of treatment which was adopted by Dr. Ali Mohammad as reported in the Press.

"In our opinion a patient of coronary attack should not have been removed from his bed at any cost, and the latest treatment for heart attack should have been undertaken at the earliest

diagnosis.

"Amenophylin is indicated only in the initial stages of the attack whereas it was given intravenously when the blood pressure was 100 and the patient was in a state of collapse. As a rule amenophylin lowers the blood pressure and its intravenous use may prove dangerous in such condition. We have been using the latest and established drugs such as khellon, lacharnol, cardiazole and corhorn etc. in our practice. Treatment for collapse such as plasma, glucose intravenous etc., was not given. Opinions may differ but in our long practice of 40 years we have come across a number of cases successfully treated. If a patient dies suddenly it is a different matter but if time permits—which it certainly did in the case of Dr. Mookerjee—we have known that this type of treatment is lifesaving.

"Without casting aspersion on any body we have given our opinion as above and invite the opinion of other professional experts on the subject."

—*Hindusthan Standard*, dated 30th June, 1953.

Gwalior Doctors' Opinion

From the information we gather from the eye-witness account of Shri U. M. Trivedi, we conclude that whatever stage Dr. Mookherjee had on the 22nd morning was not of a sudden nature. He was not feeling well and the authorities were intending to shift him to some Nursing Home.

(1) That was the proper time to inform the relatives as well as the GOI about his deteriorating condition. Shri U. M. Trivedi found him in a reclining position and the words he uttered, clearly show that some indistinct helplessness and disappointment about his health, which he expressed was of a serious nature.

(2) Even a lay-man could determine his deteriorating condition. Upto 5-15 P. M. Shri Trivedi was not informed in the Court about his condition in the State Hospital.

Shri Trivedi was taken by the District Magistrate in his own Car and he found him (Dr. Mookerjee) there in a reclining position.

He looked pale, though smiling, and whatever talk about the correspondence he had with Shri Trivedi was not of an easy nature. He put his hand on his heart, his face indicated that there was pain. Till then no serious measure was resorted to.

Whatever we gather from the day to day report from 16th to 22nd June, we conclude that it was surely a case of Coronary Thrombosis with Dry Pleurisy. The Medical Authorities handled the case carelessly nay—criminally.

Dry pleurisy is really secondary to the extension of inflammation from the heart to the Pleura and as such the original heart trouble, it seems, started several days back. In fact, extension of inflammation from one part to another takes some time. Dry Pleurisy may also be secondary to an attack of Pneumonia and both these conditions—Pneumonia and Coronary Thrombosis—particularly at this age in a patient having a previous history of Coronary attack are very, very serious.

The immediate treatment of a case of Coronary Thrombosis consists in securing absolute rest in bed and the relief of pain by administration of Morphin in full doses. Before removal to Hospital 10 miles away from his place of detention, nothing appears to have been done to record the pulse rate, blood pressure, respiratory rate in the sitting and the recumbent posture, and Urine Examination for the exculsion of Nephritis etc.

Instead ef Morphine, Pethidine was used, which is far inferior to Morphine and which does not act so effectively in relieving sudden acute pain. If it is used intravenously it lowers the blood pressure. Should the attack occur when the patient is at work or away, he should be given hypodermically $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{2}$ gr. of Morphine immediately on diagnosis and should be sent to hospital or Nursing Home in an Ambulance. He must be assisted in his undressing and should, from the outset, be debarred from all avoidable exertion. He must not rise even for toilet and should not even sit up on the bed pan. He is required to be lifted in bed for attention to bowels and for changing the linen, and even for a change of position, so that the services of two strong trained Nurses

are desirable. The temptation for the patient to ease the burden by doing things for himself is too grave. It is wiser to send the patient to the Hospital at the outset than to move him some days later, when his condition may be even more precarious. The account we gather is just the contrary to what has been stated in the above line of treatment.

It is said that Aminophylin (a purin derivative) was used intravenovsly. This Drug has played a great havoc, for it was used too late.

In the text book it has been clearly stated that, *occasionally an Intervenous Injection of Aminophyllin may cause alarming Symptoms, even Death, in gross Myocardial Degeneration and Coronary Occlusion, but is safe in uncomplicated Asthma and controls the Paroxysm* (Dr Mazumdar's Mat. Med. 1951 P. No 533, L. 36—39).

Nitrites and other vasodilators are useless in Coronary Thrombosis and should not be administered, particularly as shock is usually marked and blood pressure greatly lowered (which in this case was already lowered).

Dr. Mookerjee was under the treatment of Dr. Ali Mohammad, a physician and specialist. Was he not aware about the contra-indication of Aminophyllin during the rapid fall of blood pressure ?

When absolute rest is of prime importance why a stretcher was not used ? Why he was allowed to walk on foot ? We the medical associates of Gwalior think it mere callousness or neglect. The Doctor in charge thought it to be the case of Dry Pleurisy only, but at the time of issuing the communique he has by the way declared the true diagnosis—Coronary Thrombosis—which was too late and hence useless.

We request GOI to look into the matter keenly and to appoint a Committee of unofficial medical men to go through the details of the case and let the Nation know whether Dr. Ali Mohammad ....deliberately used the said Drug and so killed Dr. Mookerjee.

Dr. KAMAL KISHORE.
Dr. S. S. SAPRE.
Gwalior VAID G. H. MARATHE.

—*Organiser, dated* 27th July, 1953.

APPENDIX I-I

1

STATEMENTS OF SOME EMINENT PERSONS ASKING FOR ENQUIRY

Dr. M. R. Jayakar

Poona, June 23—Observing that Dr. S. P. Mookerjee's death would shock the country Dr. M. R. Jayakar said : "To die in prison-house locked there by his country's Swadeshi Government, by persons with whom he shared power as a colleague only a few days ago, is a fitting termination of a warring life. Let us hope that this incident will make the Government of India realise, in their self-complacent enjoyment of the chits of American visitors, the deep enormity of their behaviour which ignored all the canons of fairness and justice accepted by civilised Governments."

—U.P.I.

Extracts from a letter dated 10-8-53 :

"I······made my views clear about the absolute necessity of an impartial enquiry into the mysterious circumstances relating to his death. I am out of politics at present and, therefore, it is not easy to say whether my voice reaches Delhi. I wish you success in your efforts to popularise the demand for an impartial enquiry into Syama Prasadji's death."—M. R. Jayakar.

Sri Purushottamdas Tandon

Allahabad, July 1.—Sri Purushottamdas Tandon, former Congress President, today supported the demand for an enquiry into the death of Dr. S. P. Mookerjee in Srinagar.

Sri Tandon, who was presiding over a meeting here convened by the Akhil Bharat Banga Sahitya Sammelan, said he felt that Dr. Mookerjee's treatment "was not properly done". Sri Tandon hoped the Government of India would explain the whole situation after due enquiry.

The Kashmir Government, Sri Tandon said, should have given Dr. Mookerjee all the facilities to visit Kashmir and study the

situation there.

Speaking "with full responsibility", Sri Tandon said the people of India were not able to know what was happening inside Kashmir. There was an "iron curtain" over the land and even newspapers could not write what they knew.—*P.T.I.*

—*Hindusthan Standard*, dated July 2, 1953.

Sri Jayaprakash Narayan

Sri Jaya Prakash Narayan, Praja-Socialist leader, said here (at Lucknow) yesterday that the Kashmir authorities were "criminally negligent" in looking after Dr. Syamaprasad Mookerjee's health.

The Praja-Socialist leader, in a statement issued, said : "I regret deeply that the Prime Minister, in his reply to Sri Atulya Ghosh, as reported in the Press this morning, has stated so categorically that there was no negligence shown by the Kashmir Government in the care of the late Dr. Syamaprasad Mookerjee.

"I cannot say what facts have been placed before the Prime Minister. But the facts as I know them lead to an entirely different conclusion.

"I was at Calcutta only three days ago,when I took the opportunity of calling on Dr. Mookerjee's family to offer my condolences and my homage to the departed leader.

"It was on this occasion that Mr. Justice Rama Prasad Mookerjee told me the whole story, as he, a distinguished jurist, had been able to place together. The story left no doubt in my mind that Kashmir authorities were not only negligent but criminally negligent in looking after Syama Babu's health. I feel sure that the life of this great Indian could have been saved by better care."

Sri Jaya Prakash Narayan added. "It seems to me that after such a national tragedy the least that the India Government could do was to insitute a proper and impartial enquiry into the whole affair. Meanwhile it does not seem proper for the Prime Minister to pronounce judgment on such a controversial subject and to attempt to whitewash the guilt of those who seem to deserve severe punishment."

Sri Narayan added that he had no intention to say anything about this matter. But he was afraid that the expression of the Prime Minister's opinion might lead to a grave injustice and he thought it was necessary to challenge it publicly.

—*Hindusthan Standard*, dated 9-7-53.

Dr. B. C. Roy

West Bengal Chief Minister Dr. B. C. Roy has drawn the attention of Prime Minister Sri Jawaharlal Nehru to the rising public feelings in West Bengal over the question of death in detention of Dr. Syamaprasad Mookerjee in Kashmir, it is learnt.

Referring to the public demand for an enquiry into the circumstances of Dr. Mookerjee's death, Dr. Roy, in a communication to the Prime Minister, is understood to have stated that the situation called for an enquiry by eminent non-official persons like Dr. M. R. Jayakar or Sri Hriday Nath Kunzru or a Supreme Court Judge and that such a step alone could allay mounting public feelings. Dr. Roy had left it to Sri Nehru as to how best to tackle the situation.

Dr. Roy is further understood to have drawn the attention of the Prime Minister to what was described by the public as the callousness of the Kashmir Government towards medical treatment of Dr. Mookerjee.

—*Hindusthan Standard,* dated 1-7-53.

In a telegram to Dr. Roy on the occasion of his birthday. Sheikh Abdullah states :—

"Please accept my heartiest congratulations on your auspicious birthday. I wish you many happy returns of the day. I understand you are leaving for Europe shortly. I would like remind you of your promise to visit Kashmir this season.

"I would be delighted if you could come up before your departure for Europe. Incidentally your visit at this juncture would help clear many doubts regarding Dr. Syamaprasad's sad demise, as you will have an opportunity of acquainting yourself with details on the spot."

The following is the text of Dr. Roy's reply :—

"Your telegram reached me to-day, July 3, contents of which had already appeared in the Press even before its receipt by me. Thanks for your good wishes on my birthday and also your kind invitation to visit your place.

"I am grateful also for offering me the opportunity to acquaint myself with details regarding Dr. Syamaprasad Mookerjee's sad demise. To get acquainted with such details I must, besides visiting Srinagar, also meet those friends who were associated with Dr Mookerjee during his last illness and at the time of his death. Many of these friends may not be in Kashmir now. I am leaving for Europe on the day after tomorrow as my doctor will not be available after July 10. I may immediately on return contact those friends and associates and also go over to Kashmir.

"While I may undertake this task I would prefer some non-political persons to do the job. If you do not approve of this suggestion of mine, you may allow one or two such persons to be associated with me when I take up the job myself. Such information as we can thus jointly collect will, I feel, satisfy the public more effectively. Meanwhile, may I suggest you to preserve all documents, case sheets and other materials regarding Dr. Mookerjee's illness and death."

Dr. B. C. Roy's subsequent statement

Dr. Roy was giving his reaction, at the request of Pressmen, to the newspaper reports that he had written, prior to his departure for Europe, a letter to Prime Minister Sri Jawaharlal Nehru stating that, in his opinion, there was no case for enquiry into Dr. Mookerjee's death.

Dr. Roy said it was true that he had written to Sri Nehru that the misgivings that had arisen in his mind when the first reports of the circumstances of Dr. Mookerjee's death were received, were cleared by subsequent reports and particularly by the statement of the Kashmir Health Minister. "But that does not necessarily mean", Dr. Roy pointed out, "that there is no case for an enquiry as has been suggested."

Dr. Roy added : "There are many points that have arisen out of

the brochure published by Dr. Mookerjee's mother and about which no information was available. I do not say, I never said, there is no case for enquiry into Dr. Mookerjee's death."

"What I do say is this", Dr. Roy continued, "I am aware of and I do not arrogate to myself the position that I should be asked to make enquiries which will satisfy the country-wide demand for an impartial investigation. Therefore, I had suggested in my first telegram to Kashmir Premier that other non-political persons should be associated with the enqiury. I might be of help from the technical point of view, the medical point of view. But I shall be happy if some other persons, non-political persons, are appointed for this purpose. This is particullarly so in view of the fact that my relations with Dr. Mookerjee's family were so close for decades that any report from me may be challenged from one quarter or the other. Therefore, I do not personally feel that the enquiry should be left to me alone. I had suggested in my last telegram to Sheikh Abdullah (a copy of which was sent to Sri Nehru) that the enquiry should be made by non-political persons. I still stand by that."

—*Hindusthan Standard*, dated Aug., 6, 1953.

Sri H. V. Kamath

(Extracts from a speech delivered at Nagpur.)

"Why was he not released when he fell ill a fortnight ago and his condition did not improve ; when were his relations informed, what medical facilities were provided? Many such questions naturally arise. He said, "What looks *prima facie* like awful bungling demands an immediate independent inquiry. As he was a distinguished Opposition leader of Parliament, I suggest the inquiry should be conducted by an all-party committee of Parliament nominated by the Speaker and not weighted by a Congress majority. The committee can be appointed straightway though Pailiament is not in session."

Mr. Kamath added, "If Sheikh Abdullah has nothing to hide, he should welcome the inquiry. If he resists, Parliament should consider the adoption of stern measures against him and his Government. I trust Prime Minister Nehru will rise above petty

personal and party consideration and act quickly. Let us meanwhile strive for the cause of national unity for which Dr. Mookerjee so valiantly laid down his life." concluded Mr. Kamath.

—*U. P. I.*

—*Hindusthan Standard*, June 26.

Pandit Premnath Dogra

Urging the appointment of an impartial commission to enquire into the circumstances of Dr. Syamaprasad Mookerjee's death in detention in Kashmir, Sri Prem Nath Dogra told a Press conference in Calcutta on Tuesday that the facts as he knew them and the information that had reached him from different sources had convinced him that this was a case of deliberate negligence. There was a mystery about it which could be resolved only by the appointment of such a commission of enquiry.

Referring to Prime Minister Sri Nehru's statement expressing satisfaction at the arrangements made to save Dr. Mookerjee's life, Sri Dogra said it was his duty as the Prime Minister to ascertain facts before he pronounced his opinion. He and others who were with Dr. Mookerjee in the Srinagar sub-jail could give him facts but he had not cared to enquire about these from any of them. "It is now, therefore, the duty of the people to press him for the appointment of an impartial commission of enquiry. That is the one thing that will give some consolation to the afflicted mother of our departed leader", he said.

—*Hindusthan Standard*, July 15.

Sri S. S. More

(From a speech at a Puplic Meeting held at Poona on 23-6-53)

Sri S. S. More (Peasants and Workers Party), paid tributes to Dr. Mookerjee for the unparalleled work he did in the Parliament. "Like a Colossus he stood there in the defence of democracy", he said. Sri More wondered why Dr. Mookerjee was not released from detention the very moment his health was disturbed. He hoped that Prime Minister Nehru would make proper inquiries and explain

the entire position to the country. Mr. More said, he personally felt that the Kashmir Government was ill-advised in detaining him.

—*Hindusthan Standard*, dated 25th June, 1953.

Pandit Hridaynath Kunzru

A largely attended public meeting at Sholapur, which was presided over by Pandit Hridaynath Kunzru, asked the Government of India to "officially inquire into the circumstances leading to the death of Dr. Mookerjee in Srinagar."

—Extracts from *Amrita Bazar Patrika*, dated 25th June, 1953.

Sreemati Sucheta Kripalani

Extract from a speech delivered by Sm. Sucheta Kripalani, M.P. at a public meeting held in Calcutta on 23rd July, 1953 :—

"Demanding an enquiry into the circumstances leading to Dr. Mookerjee's death the Praja Socialist leader Srimati Sucheta Kripalani, M.P. expressed surprise how a leader like Dr. Mookerjee could die in detention and under such circumstances as had been reported in free India today.

* * * *

Along with their demand for an enquiry into the death of Dr. Mookerjee the public should also demand repeal of the Preventive Detention Act, she said. If the Government did not institute an enquiry into the matter they would believe that there was some mystery in Dr. Mookerjee's death, which the Government wanted to hide, she added."

— *Hindusthan Standard*, dated July 24, 1953.

Sri N. C. Chatterjee

Mussooree. July 9.—In a statement here tonight, Mr. Chatterjee said, "Unless it has a guilty conscience, no Government should resist the demand for an impartial enquiry into events leading to the death of any detenu in detention."

Mr. Chatterjee said, "The mystery into Dr. Mookerjee's death is daily deepening as facts are emerging. There are serious misgivings

in the public mind on losing the precious life of a great Indian due to carelessness of a Government whose policy he had criticised and resisted.

"Millions share Mr. Jayaprakash Narayan's deep regard at the non-response of the Prime Minister to the demand for an enquiry and his pronouncing an *exparte* judgment in favour of the Kashmir Government. This judgment, the country is not going to accept."

Mr. Chatterjee added, "The demand for an inquiry is not from so-called communalists but also from eminent persons like Shri Purushottam Das Tandon, Acharya Kripalani, Dr. B. C. Roy and Dr. Jayakar. Prime Minister Nehru should realise that there is a deep-rooted suspicion in the public mind that his Government was as much responsible as the Government of Sheikh Abdullah for Dr. Mookerjee's incarceration in Srinagar."

"With a full sense of responsibility, I say that there is a *prima facie* case of gross negligence. Sheikh Abdullah feels it, otherwise he would not have asked Dr. Roy to proceed to Srinagar and inquire into facts.

"The Government should appoint a commission to hold an independent inquiry immediately as Dr. Roy will be out for a considerable period."—(PTI)

—*Amrita Bazar Patrika*, dated 11th July, 1953.

Shiromani Akali Dal

(*Extracts from a resolution passed in the Working Committee of the Shiromani Akali Dal held on 12-7-53, at Amritasar, under the Presidentship of Master Tara Singh, President, S. A. Dal*).

"The Shiromani Akali Dal strongly supports the demand made by the mother of Dr. Shyam Prasad Mukarji that an absolutely impartial and open enquiry by independent and competent persons be held without delay."

J

CORRESPONDENCE BETWEEN SRI ATULYA GHOSH AND Mr. JAWAHARLAL NEHRU

The 29th June, 1953.
No. WC/4/2378.

Dear Panditji,

I am placing before you the feeling of some of the members of the Provincial Congress Committee as well as my own feeling.

According to reports received up till now, we find that the serious nature of the illness of late Dr. Syama Prasad Mookerjee were made known to the authorities of Kashmir Government on the early morning of 22nd. But it is amazing that no intimation was sent to his family members nor to his physician Dr. B. C. Roy by the authorities concerned. The Kashmir Government appears to be callous.

The way the news was communicated to the house of Dr. Mukherjee was highly objectionable. A telephone message was given to Justice Rama Prasad Mukherjee conveying the news that Dr. S. P. Mukherjee was dead. No other information was sent and it was said in a blunt manner. It seems that there was no consideration for the feeling of the aged mother. You know late Dr. Mukherjee was an eminent person and he was highly respected in our Province if not in the whole of India. From reports published in the newspaper it seems that no facilities were given to him for his treatment nor his sons or daughters were informed about his continued ill health, nor any request was made to the members of his family to visit him while ailing under detention. The public feeling in our State has risen very high. I do not want to suggest anything to you but I think some kind of enquiry by eminent non-official persons such as Dr. Jayakar or Sri Kunzru or a Supreme Court Judge will be helpful to us. Of course you know best how to tackle the situation.

I am sending a copy of this letter to Dr. B. C. Roy.

Yours sincerely,
Atulya Ghosh.

Pandit Jawaharlal Nehru,
Prime Minister,
Government of India, New Delhi.

New Delhi,
July 2, 1953.

My dear Atulya Babu,

I have your letter of the 29th June.

I am aware of the feelings in Bengal in regard to the death of Dr. Syama Prasad Mookerjee. I think that this is largely due to lack of knowledge of the facts. I have gone into these matters carefully and I am quite convinced in so far as the Kashmir Government is concerned, they did everything in their power to show courtesy and consideration to Dr. Syama Prasad Mookerjee. The Health Minister of the Kashmir Government Sri Sham Lal Saraf has issued a statement giving some facts which has appeared in today's papers. You will, no doubt, see this. It is, I think, completely unjustified to say that the Kashmir Government's attitude was callous. It was the very reverse of this.

Right from the beginning of Dr. Mookerjee's detention in Kashmir he was treated with extraordinary courtesy and a lovely villa was placed at his disposal. There is no better place in the whole of India for a person to choose to live in. There was the lake in front and nearby was a famous Moghul garden. Everyone who was with Dr. Mookerjee or who went to see him spoke highly of the way the Kashmir Government provided for his comfort.

When he felt somewhat unwell on the 22nd, even then no one suspected that his case was serious. He was taken to the hospital so that he may have better treatment. The doctors there wanted to send information to his family, but Dr. Mookerjee himself asked them not to do so and he sent telegrams himself to three members of his family in Calcutta. There is no doubt that these telegrams were sent. I have seen the photostat copies of the originals. You will see that neither the Kashmir Government nor the doctors were to blame in this matter. Later, the same evening his lawyer, Trivedi, saw him and had a talk with him and

showed him a number of papers. Till then also no one suspected any dangerous developments. It was only about 11 o'clock at night that his condition began deteriorationg. The doctors were in attendance throughout. There was some improvement, but again there was deterioration. Information was sent to a Minister of the Kashmir Government, who hurried out of his bed and went to the Indian Army Station Hospital to bring doctors from there. Distances are great in Srinagar and these doctors arrived just when Syama Babu was dying or had died.

I do not see what else could have been done. It may be said that information might have been sent a little earlier in the night. No one in the Kashmir Government was aware of the serious development till long after midnight.

You refer to the way news was communicated to Justice Mookerjee by telephone. As a matter of fact, it took a long time to get the telephone connection. After this was obtained, it was impossible to talk directly as nothing could be heard. The Minister who was on the line in Srinagar, Durga Prasad Dhar, ultimately had to ask the Delhi operator to give the message to the Calcutta operator who repeated it to Justice Mookerjee. You can well imagine what happened to the message in the course of this double relay. It must have been distorted and only the briefest message was given. I have had a talk with Durga Prasad Dhar, who says that he gave a long message, but naturally only a distorted form went through. I am sure that Justice Mookerjee, if he is informed of this, will realise that absolutely no discourtesy was intended. Indeed, the Ministers of the Kashmir Government were very greatly upset by Syama Babu's death. They had been thinking of releasing him soon.

Yours sincerely,

Sd/- Jawaharlal Nehru.

Shri Atulya Ghosh,
President, West Bengal Pradesh
Congress Committee,
59-B, Chowringhee Road,
Calcutta-20.

K

CORRESPONDENCE BETWEEN LADY MOOKERJEE AND MR. JAWAHARLAL NEHRU

No. 499—P.M.—New Delhi June 30, 1953.

My dear Mrs. Mookerjee,

It was with deep grief that I learnt a few days ago, as I was leaving Geneva for Cairo, that your son, Dr. Syama Prasad Mookerjee, had died. The news came as a shock to me for, though we may have differed in politics, I respected him and had affection for him. To you, his mother, the shock must have been very great and I can say little to lessen your sorrow.

I sent a telegram from Cairo to Dr. Bidhan Chandra Roy asking him to convey my deepest sympathy and condolences to you. It is a matter of particular sorrow to me that Syama Babu's death should have occurred as it did under detention. When I went to Kashmir about five weeks ago, I enquired particularly as to where he was kept and about his health. I was told that he was being kept, not in any prison but in a private villa on the side of the famous Dal Lake in Srinagar. I found that the Kashmir Government was anxious to give him such comfort and amenities as were possible and that he was keeping well. I was happy to learn this at the time. Indeed, I hoped that the healthy climate of Kashmir might lead to an improvement in Syama Babu's health.

But it was not to be so and the shock and sorrow are, therefore, all the greater. I suppose it was beyond human power to do anything and we have to bow to circumstances beyond control.

To you, revered lady, I offer my respectfull homage and expression of sorrow. It I can be of any service to you, you will please not hesitate to inform me.

Yours sincerely,
Sd. Jawaharlal Nehru.

77 Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta.
4th July, 1953.

Dear Mr. Nehru,

Your letter dated 30th June was forwarded to me on the 2nd of July by Dr. Bidhan Chandra Roy.

I thank you for your message of condolence and sympathy.

The nation mourns the passing away of my beloved son. He has died a martyr's death. To me, his mother, the sorrow is too deep and sacred to be expressed. I am not writing to you to seek my consolation. But what I do demand of you is Justice. My son died in detention—a detention—without trial. In your letter you have tried to impress that Kashmir Government had done all that should have been done. You base your impression on the assurances and information you have received. What is the value, I ask, of such information when it comes from persons who themselves should stand a trial ? You say, you had visited Kashmir during my son's detention. You speak of the affection you had for him. But what prevented you, I wonder, from meeting him there personally and satisfying yourself about his health and arrangements ?

His death is shrouded in mystery. Is it not most astounding and shocking that ever since his detention there, the first information that I, his mother, received from the Government of Kashmir was that my son was no more and that also at least two hours after the end ? And in what a cruel cryptic way the message was conveyed ! Even the telegram from my son that he had been removed to the Hospital reached us here after the tragic news of his death. There is definite information that my son had not been keeping well practically from the beginning of his detention. He had been positively ill a number of times and for successive periods. Why did not, I ask, the Government of Kashmir or your Government send any information whatsoever to me and my family ?

Even when he was removed to the Hospital they did not think it necessary to immediately intimate us or Dr. Bidhan Chandra Roy. It is also evident that the Kashmir Government had never cared to

acquaint itself with the previous history of Syamaprasad's health and provide for nursing arrangements and emergent medical attendance in case of need. Even his repeated attacks of illness were not taken as a warning. The result was disastrous. I have positive evidence to prove that he had, to quote his own words, a "sinking feeling" on the morning of 22nd June. And what did the Government do? The inordinate delay in getting any medical assistance, his removal to the Hospital in a most injudicious manner, the refusal to allow even his two co-detenus to be by his side in the Hospital are some glaring instances of the heartless conduct of the authorities concerned

The responsibility of the Government and their own doctors cannot be in any way evaded or lightened by some stray quotations from Syama Prasad's letters chosen at random, that he was keeping well. What is the value of such quotations? Does anybody seriously expect that he—of all persons—and that while in detention far away from his dear and near ones—would ventilate his grievances through letters or diagnose his own malady? The responsibility of the Government was immense and serious.

I charge them that they had utterly neglected and failed to discharge this bounden duty. You speak of the comforts and amenities given to dear Syama Prasad in detention. It is a matter to be enquired into. The Kashmir Government had not even the courtesy to allow free flow of family correspondence. Letters were held up with inordinate delay and some mysteriously disappeared. His anxiety for home news, particularly of his ailing daughter and my poor self, was distressing. Will you be astonished to learn that on the 27th June last, we received here his letters dated 15th June, despatched by the Kashmir Government in a packet on the 24th June, that is, a day after sending his dead body? That packet also brought back to us the letters addressed by myself and others here to Syama Prasad which had reached Srinagar on the 11th and 16th June, but had never been delivered to him. It was purely a case of mental torture. He had been repeatedly asking for sufficient space for walking. He was feeling ill for want of it. But

he was persistently refused it. Is not this a method of physical torture too ? I am filled with surprise and shame to be told by you "that he was being kept, not in any prison but in a private villa on the famous Dal Lake in Srinagar." Strictly confined in a small bungalow with a little compound, guarded day and night by a body of armed guards—such was the life that he was leading. Is it seriously maintained that a golden cage should make prisoner happy ? I shudder to hear such desperate propaganda. I do not know what medical treatment and assistance had been given to him. The official reports, I am told, are self-contradictory. Eminent physicians have expressed their views that it was, in the least, a case of gross negligence. The matter requires a thorough and impartial enquiry.

I do not bewail here the death of my beloved son. A fearless son of Free India has met his death while in detention without trial under most tragic and mysterious circumstances. I, the mother of the great departed, demand that an absolutely impartial and open enquiry by independent and competent persons be held without delay. I know nothing can bring back to us the life that is no more. But what I do want is that the people of India must judge for themselves the real causes of this great tragedy enacted in a free country and the part that was played by your Government.

If a wrong has been done anywhere, by any person—however high he may be—let justice take its course and let the people be cautious so that no mother in Free India has again to shed tears with the same agony and grief that has befallen me.

You are good enough to tell me not to hesitate to inform you about any service that you may render to me. Here is the demand on my own behalf and on behalf of the mothers of India. May God give you courage to allow Truth to see the Light.

Before I close my letter I would refer to one very important fact. Syama Prasad's personal diary and his other manuscript writings were not returned by the Kashmir Government along with his other belongings. Copies of correspondence between Bakshi Ghulam Mohammed and my eldest son, Ramaprasad, are enclosed herein. I shall be deeply grateful if you could recover the

diary and the manuscripts from the Kashmir Government. They must be with them.

With my blessings,

Yours in grief,
Sd/- Jogmaya Debi.

New Delhi,
July 5, 1953.

Dear Mrs. Mookerjee,

I thank you for your letter of the 4th July which has just reached me.

I can well understand a mother's sorrow and mental anguish at the death of a beloved son. No words of mine can soften the blow that you must have felt.

I did not venture to write to you before without going into the matter of Dr. Syama Prasad's detention and death fairly carefully. I have since enquired further into it from a number of persons who had occasion to know some facts. I can only say to you that I arrived at the clear and honest conclusion that there is no mystery in this and that Dr. Mookerjee was given every consideration.

I might mention that letters to Kashmir go by air, but the air services are very irregular because of the weather and sometimes they do not go for a week or more. In fact, they have not gone there now for over a week and many important letters which I had sent have thus been delayed.

It has been my lot to spend about ten years in prison and I have been kept in innumerable jails of all kinds all over India, and so I know something about how a prisoner feels and what the conditions of his imprisonment usually are.

On the day of Dr. Mookerjee's sudden death, a Minister of the Kashmir Government tried to telephone to Justice Mookerjee. It was not possible for him to get through for a long time, and then he could not speak directly. His message was relayed by two operators on the way and no doubt became completely distorted.

I am forwarding your request about Dr. Mookerjee's diary and

other papers to Bakshi Gulam Mohammed. I am sure that, if he has got any papers, he wonld certainly send them.

Yours sincerely,
Sd/- Jawaharlal Nehru.

77, Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta.
The 9th July, 1953.

Dear Mr

Your letter dated 5th July reached me on 7th.

It is a sad commentary on the whole situation. Instead of helping to clear up the mystery, your attitude deepens it. I demanded an open enquiry. I did not ask for your "clear and honest conclusion." Your reaction to the whole affair is now well-known. The people of India and I, the mother, have got to be convinced. There is a rooted suspicion in the mind of many. What is required is an open, impartial, immediate enquiry.

The various points raised in my letter remain unanswered. I had clearly told you that I had positive evidence to prove certain very relevant and important facts. You do not care to know or look into them. You say that you had enquired "from a number of persons who had occasion to know some facts." It is strange that even we—the members of his family—are not regarded as persons who can throw at least some light on the matter! And yet you call your conclusion to be "honest"!

Your reference to the irregularity in the Kashmir Air Mail Service is of no avail. That does not explain the total disappearance of letters and the inordinate delay in many cases. If you had taken pains to go through my letter with care, you would have, I am sure, hesitated to offer such a lame excuse. Postmarks on the covers of the letters we hold positively belie your theory in the present case.

Your experience in jails is known to all. It was at one time a matter of great national pride with us. But, you had suffered imprisonment under an alien rule and my son has met his death in detention without trial under a national Government. What

would have happened if such a tragic and mysterious end had come behind the prison bar during the British rule ?

It is futile to address you further. You are afraid to face facts. I hold the Kashmir Government responsible for the death of my son. I accuse your Government of complicity in the matter. You may let loose your mighty resources to carry on a desperate propaganda, but Truth is sure to find its way out and one day you will have to answer for this to the people of India and to God in Heaven.

I am releasing our correspondence to the Press. Let the people of India judge and act when their Prime Minister fails.

Yours in grief,
Sd/- Jogmaya Debi.

CORRESPONDENCE BETWEEN BAKSHI GULAM MOHAMMED & SRI RAMA PRASAD MOOKERJEE

Copy of telegram sent to Bakshi Gulam Mohammed on 28th June, 1953, by Sri Rama Prasad Mookerjee.

Bakshi Gulam Mohammed
Home Minister
Srinagar (Kashmir)

Do please send immediately Syamaprasad Mookerjee's personal diary and manuscript writings not sent with the body and any other personal belongings that are still there.

Ramaprasad Mookerjee.

Copy of letter confirming the above telegram written on the same day.

77, Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta-25.
The 28th June, 1953.

Dear Mr. Gulam Mohammed,

I have sent the following telegram to you to-day :

"Do please send immediately Syamaprasad Mookerjee's personal diary and manuscript writings not sent with the body and any other personal belongings that are still there."

Syama Prasad had been regularly keeping a diary and it was

with him while in detention at Srinagar. It is a black bound book. He had also been writing some literary work there. The diary and the manuscript writings have not been sent with his other belongings that came with his body. There may be other personal articles still lying at Srinagar.

I earnestly request you to send immediately all those articles, particularly the diary and the manuscript without fail. It is needless to explain the value we attach to these articles.

Your personal attention to this matter will be much appreciated.

Yours sincerely,
Sd/- Rama Prasad Mookerjee.

Copy of the telegram from Mr. Bakshi Gulam Mohammed, Home Minister, Kashmir, dated 29th June.

X R SRINAGAR KMR 29 RAJ 37

Justice Rama Prasad Mookerjee, Calcutta.

IS / 2374 / D / 53 Your telegram stop all personal belongings of Syamaprasad Mookerjee carried by Tek Chand his personal Secretary and Mr. Trivedi his Counsel please contact them—
Bakshi, Home Minister—

Copy of letter from Sri Ramaprasad Mookerjee to Bakshi Gulam Mohammed dated 3rd July, 1953.

77, Asutosh Mookerjee Road,
Calcutta-25.
The 3rd July, 1953.

My dear Mr. Gulam Mohammed,

I am greatly surprised at the reply you have sent. As I said before, the personal belongings that were sent by you with Syama Prasad's body did not include his diary and manuscript writings. Syama Prasad, we know, had been regularly keeping his diary while in detention at Srinagar. It must have been with him at the Hospital. It is most surprising and regrettable that it was not sent along with his other belongings. Messrs. Tek Chand and Trivedi informed us that they had brought only those articles that had been

made over by the Kashmir authorities. Some articles had been handed over to Mr. Trivedi at the Hospital but they did not contain the diary. We also know that Syama Prasad had been writing a good deal in detention. Curiously enough, the articles sent by you do not include any of his manuscripts as well.

I earnestly entreat you again to find out his diary and the manuscripts immediately and send them to us.

Yours sincerely,

Sd/- Rama Prasad Mookerjee.

L

AN ARTICLE REPRINTED FROM THE ORGANISER, (DELHI), DATED 20TH JULY, 1953

The Prime Minister has been pleased to state that he has enquired "from a number of persons who had occasion to know some facts" and come to the conclusion that martyred Dr. Mookerjee had been lodged in a nice bungalow and that he "was given every consideration."

We have also enquired from a number of persons who had occasion to know many facts. Some of these facts we have published. Here are some more.

The house in which the beloved leader was lodged is not a "fine bungalow." It is neither fine nor a bungalow. It is a ramshackle cottage. It is not a government building. It is a private house. But it is so desolate and derelict that no tourist has ever cared to hire it. ***It is unfit for human habitation.*** Nor is it true to say that it is located on the banks of the Dal Lake. It is not even on the main road. ***The surroundings are as wild as they are weird.*** They look like belonging to some other planet than ours. The house itself is full of owls and snakes. Abdullah put a few ricketty cots into this reeking house and also put our dear Syama Prasad in it.

More than once Dr. Mookerjee saw snakes creeping by him. Often he complained of them to the gardeners. The helpless gardeners could only answered with looks of mute embarrassment. The house is exposed to gusts of snowy winds from the surrounding mountains.

It was nothing short of criminal to keep a man from the plains with previous heart trouble, in a bleak snake-pit like this. According to the gardeners, Doctorji often complained of the cold. He asked for warm clothing from the jail authorities. It was some days before Bakshi sent in an overcoat and some blankets.

The cold desolation of the place soon affected his health. He complained of pain and sickness to the jail authorities. ***But the only medical attention he got was from a sub-assistant surgeon (L.M.P.) in charge of the sub-jails of Srinagar· So that in the beginning he was treated no better than hundreds of other prisoners.***

When Dr. Ali Mohammed examined him on the morning of June 22, he is reported to have passed adverse remarks on his medical treatment.

At about 12 noon a small transport van No. 159 carried Dr. Mookerji to the nursing Home. ***He was made to walk upto the van and later made to sit up in it without even pillow support or blanket cover.*** The Jail Superintendent sat to his right as though to remind him that he was Abdullah's prisoner. He was seen in this position by several persons near Nedou's Hotel.

Before leaving the prison-house Dr. Mookerjee thanked the menial staff and expressed his gratitude by folding his hands. Of course, it is well-known that none of his co-detenus was permitted to accompany him.

In the evening when Sri Trivedi and Sri Devki Prasad called on him in company with the D. C., no doctor, and only one nurse, was in attendance on him. During the half hour they were with him, he received no treatment of any sort.

His room in the so-called Nursing Home was a cubic 12 × 12, ill-equipped and ill-furnished. In this small room he was confined with Abdullah's armed policemen standing guard. One cot, one old half-broken chair and one stool constituted the entire furnishings. The embarrassed D. C. seated himself on a stool and made Sri Trivedi sit on the chair. Devki Prasad kept standing. At the instance of Dr. Mookerij a chair was found for him.

Dr. Mookerji besmeared his hand with the black paint of the cot on which he was lying. He tried to wash it off with water. Water failing to wash it, he asked for soap. ***However, in this hospital not a soap cake could be found.*** Ultimately he asked the nurse to take one out of his attache case, which she did.

It is learnt that the doctor in charge of the ward in which Dr. Mookerjee was put, was on leave. So that Dr. Zutshi of another ward was asked to do a side job with Dr. Mookerjee. Dr. Ali Mohammad and Dr. Parhar who are mentioned in the Abdullah communique as having waited on him, were, in fact, not residing on the premises. Their residences are far removed from the hospital. Latest enquiries have revealed that none of these specialists waited on him on that fatal night.

To the nurses who called on him at 9-30 P.M. he complained about the unworthy treatment meted out to him by Abdullah. He said that when he became well and went to India he would expose the tyranny of Abdullah.

Only one nurse, Rajdulari Tiku, was in attendance on him. When he felt like passing urine he called her as his daughter and was sorry that she should hold the urinal for him. According to Rajdulari, the dying leader cried in agony for a doctor but none was at hand. She rushed Noor Ahmed, scavenger, to call in Dr. Zutshi. Dr. Zutshi came running in but found the patient in a grave condition. He rang up Dr. Ali for instructions. Meanwhile his condition deteriorated and he passed away at 2-25 A.M. ***Dr. Ali arrived more than half an hour after death. The communique time of death as 3-40 A M. is absolutely false.*** They spent the one hour and a quarter fabricating forms to fit in with the communique. ***The whole communique is a tissue of lies.*** When the nurse found that the worst had already happened, she burst into loud lamentation.

Later, ministers called in. Conspicuous by their absence was Abdullah and his pro-Pakistani minister Afzal Beg.

Is the Prime Minister still satisfied that nothing was left undone to save the priceless life of our Syama Prasad ?

APPENDIX II

The following two notes, written in Dr. Mookerjee's own handwriting, were found in his brief-case, which he had left locked up at the sub-jail, when he was removed to the hospital, The first one is a temperature chart, kept by him, for 20th, 21st and morning of 22nd June. The second one is, presumably, a note prepared by him in connection with his application before the Kashmir High Court.

1

Temperature Chart

20/6

8 am 99·4

12 noon - 99·2

4 pm - 101·2

8 pm - 100·2

21/6

9 am - 99

11·30 am - 98·4

4 pm - 100

8 pm - 100

At about four am - heart-pain, heavy perspiration, sinking feeling & temperature suddenly dropped. Temperature taken at 5·30 am - 97 —

7 am - 98

8 am 98·2

(3)

Court can certainly intervene. Malafide is suggested by the following

(1) My telegram to Abdullah & his reply — he did not then consider my visit to be so dangerous (it was inopportune) as to bring it within the scope of the P S Act.

(2) Conspiracy between Govt of India & J & K Govt — the circumstances under which my entry was facilitated by Indian officials.

(3) Keeping both orders ready beforehand — specially the 2nd order — which, when signed, mentioned certain alleged facts which could not possibly then be in existence

[*Notes, in Dr. Mookerjee's handwriting, in connection with his application before the Kashmir High Court.*]

"1. See Sk. Abdullah's Broadcast talk—where he refers to my arrest—and says I attempted to enter the State without a permit and courted arrest.

2. On 11th May J. & K. Govt. passed an Ordinance through the Sadar-i-Riyasat making it an offence for anyone to enter the State without a STATE permit. Please see this. My arrest was not under this Ordinance.

3. There was no STATE law when I entered the State, requiring a permit. The G. of I. permit had apparently no legal validity—in any case the authorities in India did not arrest me for attempting to enter without their permit—rather, the D. C. of Gurudaspur received instructions to give me all facilities and not create any obstruction in case I decided to proceed to J. & K. without their permit.

4. J. & K. High Court has the jurisdiction to interfere. The law is special. It gives wide powers to the executive to arrest and detain a person for an unlimited period without giving him a charge-sheet and without having his case enquired into by any Tribunal.

5. The words "reasonably satisfied" give power to the Court to intervene, if the circumstances of a case so warrant.

Compare the present Indian law. The Supreme Court has apparently no jurisdiction to go into the merits of a case of detention. But merely because the Act provides that grounds of detention are to be communicated to the internee to enable him to make representation, the Supreme Court has intervened and considered in many cases whether the grounds are such as would give a fair opportunity to the accused to make his representation. It has proceeded on a liberal interpretation and has not refused to intervene merely because the Act gave powers to formulate its own grounds. Even if one ground is bad, the detention has been held illegal.

In this State this archaic, barbarous and lawless law still operates

and the Court, which cannot obviously go outside the four corners of the Act, can certainly step in, if it is satisfied on the facts of a particular case that there could possibly have been no application of 'reasonableness.'

In any case if in a case the surrounding circumstances show a malafide intention on the part of the Executive, the Court can certainly intervene. Malafide is suggested by the following :

(1) My telegram to Abdullah and his reply—he did not then consider my visit to be so ***dangerous*** (it was ***inopportune***) as to bring it within the scope of the P. S. Act.

(2) Conspiracy between Govt. of India and J. & K. Govt.—the circumstances under which my entry was facilitated by Indian Officials.

(3) Keeping both orders ready beforehand—specially the 2nd order—which, when signed, mentioned certain alleged facts which could not possibly then be in existence.

(4) The Broadcast talk of Sk. Abdullah—declaring that my arrest was for entering the State without permit—which proves the reasons given in the orders served on me were unfounded.

Distinguish the Court from the Executive. The Court should not stand on technicalities or narrow interpretation of law—but, as had been held by Supreme Court and other Courts in all democratic countries—uphold personal liberty and not make it completely subservient to executive whims.

If reference is made to subsequent happenings in Jammu leading to disturbances and arrests, you can say all this has been largely due to my arrest—if Govt. had acted otherwise, the effect would have been different entirely.

Petition filed before the High Court of Kashmir with annexures (Orders of Arrest & detention).

IN THE HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR
AT SRINAGAR

Criminal Miscellaneous application
of·· ··· · ·· ·········2010.

In the matter of Dr. Syama Prasad Mookerjee a detenu

&

In the matter of section 3 (1) of the Public Security Act 2003

&

In the matter of Section 491 of the Cr. Procedure Code

In the matter of Devki Prashad Nakhasi petitioner

versus · ········· · ·· 1. Inspector General of Police, Jammu and Kashmir Government,

2. Superintendent Central Jail, Srinagar.

Respondents.

The humble application of the petitioner above named respectfully sheweth :—

1. That the detenu is a member of the Parliament, an Ex-Cabinet Minister of the Union Government and Ex-Vice-Chancellor of the Calcutta University and is a citizen of India.

2. That the detenu was arrested by the police on 11-5-53 at Lakhanpur purporting to act under section 3(1) of the Public Security Act 2003, under an order made by respondent No. 1.

3. That about 10 minutes before the said arrest an order bearing No. 382-F/53 dated 10-5-1953 was served upon the detenu under section 4(1) of Public Security Act prohibiting him from entering residing or remaining in any part of the State of Jammu and Kashmir

on the allegation that the said detenu was about to act in a manner prejudicial to the public safety and peace in Jammu and Kashmir vide copy annexed marked "A".

4. That the said detenu has been kept in detention under the Supervision of respondent No. 2 the Superintendent Central Jail Srinagar.

5. That the detenu has not been allowed to give full and free instructions to his Advocate Shri U. M. Trivedi, Barrister-at-law and hence further details of the nature of detention, conditions of detention, duration of detention and circumstances accompanying the detention could not be mentioned in this petition.

6. That Shri U. M. Trivedi did go to the place of detention on 12.6.53 at 5 p.m. but as he was told that the instructions could only be given in the hearing af DistrictMagistrate Shri Trivedi refused to take such instructions and Dr. S. P. Mookerjee the detenu refused to give such instructions.

7. That under the above circumstances the application from the detenu himself was not possible and as the detenu has no relatives in Jammu and Kashmir State, the petitioner files this application as his friend.

8. That the arrest of the said detenu and his detention is illegal and without any authority of law.

9. That no reasonable grounds existed or exist which can warrant the detention of the said detenu.

10. That the detenu never acted in any manner prejudicial to the peace or safety of the State.

11. That detention was malafide and preconceived as will be apparent from the order passed 10 minutes before the arrest of that detenu.

12. That the detenu is a citizen of India and his fundamental rights of freedom guaranteed by the Constitution of India under Article 19 (d) has been so guaranteed to him as a citizen of India.

13. That the order served upon the said detenu before the arrest was also illegal and offended against the provisions of Articale 19(e) of the Constitution.

14. That the respondent No. 1 had no grounds on which he could act much less had he any reasonable grounds for so acting and hence the order of arrest and detention passed by him is without proper authority and the continued detention without production before a Magistrate is wholly unlawful.

Wherefore the petitioner prays that the respondents be ordered to produce the detenu before the Hon'ble Court and he be set at liberty thereafter.

AND SHALL EVER PRAY.

Petitioner

Dated 15th June, 1953.

In the High Court of Jammu and Kashmir at Srinagar
Criminal Miscellaneous application
of........................2010

In the matter of Dr. Syama Prasad Mokerjee, a detenu.
In the matter of Section 3(1) of the Public Security Act, 2003
&
In the matter of Section 491 of the Cr. Procedure Code
&
In the matter of Devki Prashad Nakhasi, petitioner.

Versus....................1. Inspector General of Police,
Jammu and Kashmir Government.
2. Superintendent, Central Jail,
Srinagar.

Respondents.

The application of the detenu above named respectfully showeth :—

1. That he has read the application made by Shri Devki Prashad under Section 491 of the Criminal Procedure Code.

2. That before coming to Jammu and Kashmir the detenu had intimated to Sheikh Mohammed Abdullah by a telegram of his proposed visit and of the purpose of his visit viz. to study conditions himself and to explore the possibilities of creating conditions leading

to peaceful settlement and to see if possible Hon'ble Shri Sheikh Mohammed Abdullah, and he had received a reply thereto which is annexed hereto and marked 'B'. The telegram which the said detenu sent from Amritsar was despatched on 8.5.53 and the aforesaid reply reached him at Phagwara on 9.5.53.

3. That he had entered the State with full knowledge of the Indian authorities and in fact the Deputy Commissioner, Gurudaspur saw him at Pathankot on 11.5.53 and intimated to him that the authorities would not obstruct him and party from entering into Jammu and Kashmir although he and his party had no permits. The said Deputy Commissioner preceded to the Madhopur Checkpost to see that his entry into the State without permit was facilitated.

4. That after he and his party had travelled by Jeep half way over Ravi he was met by one Shri Capt. A. Azeez, S.P. of Kathua and served with an order prohibiting entry into the State, which has been marked 'A'. After apprising him of the cricumstances leading to his entry into the State, he asked him to allow him to proceed to Jammu. Thereupon he immediately produced the order of arrest marked 'C' referred to previously and took him into custody. Both these orders, the said Capt. A. Azeez was carrying with him and the interval that lapsed between the communication of the first order and the second order was not more than a minute.

5. That simultaneously two of his companions Shri Guruduttji and Shri Tekchandji who expressed their desire to accompany him were also later taken into custody but were served with no order on the spot but some order was read out to them at the Lakhanpur Checkpost where they had halted for an hour or so before his departure for Srinagar.

Wherefore the detenu prays that this may be read as part of the application and in addition thereto.

AND SHALL EVERY PRAY,

Sd/- Syama Prasad Mookerjee
Petitioner.

Dated 18th June, 1953.

In the High Court of Judicature Jammu and Kashmir Srinagar.

Criminal Misc. No·············of 2010.

In the matter of Shri Devki Prashad·············Petitioner.

Versus

(1) Inspector General of Police }
(2) Superintendent Central Jail } Respondents

AFFIDAVIT

I Syama Prasad Mookerjee son of Sir Ashutosh Mookerjee aged 52 years now a detenu in a sub-jail at Srinagar state on solemn affidavit as follows :

(1) That the statements contained in paragraphs 1 to 5 in the accompanying application are true.

(2) That I make this affidavit bonafide.

Signed : Syama Prasad Mookerjee,
Detenu

Solemnly affirmed before me at

Signed : G. Nabi,
District Magistrate,
18. 6. 53

(True copy)

'B'

Copy of a telegram dated 9th of May 1953 from Sheikh Mohammad Abdullah to Syama Prasad Mookerjee

---

Thanks your telegram—I am afraid your proposed visit to the State at the present juncture inopportune and will not serve any useful purpose.

ORDER DATED 10-5-1953.

Jammu and Kashmir Government.

Order No. 382-F/53 Dated 10-5-1953.
of 1953.

To

Dr. Syama Prasad Mookerjee,
President Bharatiya Jan Sang,
20 Tughlak Crescent,
New Delhi.

Whereas the Government are satisfied that there are reasonable grounds for believing that you Dr. Syama Prasad Mookerjee are about to act in a manner prejudicial to the Public Safety and peace of and in furtherance of the movement prejudicial to the Public safety and peace in Jammu and Kashmir State ;

And whereas it is necessary to prevent you from acting in the aforesaid manner,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 4 of the Jammu and Kashmir Public Security Act, 2003, the Government hereby direct that you Dr. Syama Prasad Mookerjee shall not enter, reside or remain in any part of the State of Jammu and Kashmir.

By order of the Government,

Sd. Chief Secretary.

ORDER DATED 11-5-53

Whereas, I, Prithvinandan Sing, Inspector-General of Police, Jammu and Kashmir, am satisfied that there are reasonable grounds for believing that Dr. Syama Prasad Mookerjee, President Bhartiya Jan Sangh, 30 Tughlak Crescent, New Delhi, has acted, is acting and is about to act in a manner prejudicial to public safety and peace, and whereas in order to prevent him from so acting in the aforesaid manner, it is necessary to make the following order :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Section 3(1) of the Public Security Act No. 15 of 2003 read with Notification forming an annexure to Council order No. 356 C of 1947, dated 20th May, 1947, I hereby order that the said Dr. Syama Prasad Mookerjee be arrested.

This is, therefore, to authorise, and direct you, Captain A. Azeez, Superintendent of Police, Kathua, to arrest the said Dr Syama

Prasad Mookerjee and remove him under custody to Central Jail at Srinagar.

Herein fail not.

Given under my hand this the 29th day of Baisakh, 2010. (11th of May 1953).

Sd. Inspector General of Police,
Jammu and Kashmir Government.

Dated, Lakhanpur,
29.1.2010
11.5.1953.

ORDER DATED 11-5-53

Whereas I, Prithvinandan Singh, Inspector General of Police, Jammu and Kashmir, am satisfied that there are reasonable grounds for believing that Dr. Syama Prasad Mookerjee, President Bhartiya Jan Sangh, 30 Tughlak Crescent, New Delhi. has acted, is acting and is about to act in a manner prejudicial to public safety and peace, and whereas in order to prevent him from so acting in the aforesaid manner, it is necessary to make the following order :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Section 3(2) of the Public Security Act, Act No. 15 of 2003 read with Notification forming an annexure to Council order No. 356-C of 1947, dated 20th May, 1947, I hereby order that the said Dr. Syama Prasad Mookerjee be detained in custody at Central Jail, Srinagar for a period of two months.

This is, therefore, to authorise you, the Superintendent Central Jail, Srinagar, to receive the said Dr. Syama Prasad Mookerjee and detain him in the Central Jail, Srinagar, for a period of two months.

Given under my hand this the 29th of Baisakh 2010 (11th of May, 1953).

পরিশিষ্ট ৭

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯০১ জন্ম কলিকাতায়, ৬ই জুলাই।

১৯২১ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স সহ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি.এ. ডিগ্রী লাভ।

১৯২২ ১৬ই এপ্রিল সুধা দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯২৩ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. ডিগ্রী লাভ।

১৯২৪ বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট রূপে নাম লেখানো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত। মে মাসে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর সিণ্ডিকেটের শূন্য আসনে সদস্যরূপে মনোনীত।

১৯২৬ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা। লিনকন'স ইন্-এ যোগদান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।

১৯২৭ বিলেতে ব্যারিস্টার হওয়া।

১৯২৯ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস সদস্য রূপে নির্বাচিত।

১৯৩০ কংগ্রেস লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ এবং স্বতন্ত্র সদস্য রূপে পুনরায় নির্বাচিত।

১৯৩৩ পত্নী-বিয়োগ।

১৯৩৪ উপাচার্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পর পর দুইবার, ১৯৩৪-৩৮। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পোস্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি—পর পর কয়েক বছরের জন্য। আর্ট ফ্যাকাল্টির ডীন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান।

১৯৩৫ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের (বাঙ্গালোর) কোর্ট এবং কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৩৭ পুনর্গঠিত কনস্টিটিউশান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত।

১৯৩৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল. এল. ডি. উপাধি প্রদান।

লীগ অফ নেশনসের "ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটি"তে ভারতের প্রতিনিধি রূপে মনোনীত।

১৯৩৯ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ।

১৯৪০ ১৯৪০-৪৪এর জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

১৯৪১ ১৯৪১এর ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২এর ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত ফজলুল হকের দ্বিতীয় প্রগতিশীল মোর্চার মন্ত্রিসভায় বাংলার অর্থমন্ত্রী রূপে যোগদান। বিহার সরকার ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে নিষেধাজ্ঞা জারী করায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ডঃ মুখার্জীর ভাগলপুর অভিযান, গ্রেপ্তার বরণ, ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইনে আটক হওয়া, এবং পরে মুক্তি।

ক্রিপ্স্ মিশনে বক্তব্য পেশ করার জন্য অংশগ্রহণ।

১৯৪২ মেদিনীপুরে এবং ১৯৪২ আগস্ট আন্দোলনের সম্পর্কে অন্যত্র বাংলার গভর্নরের দমননীতির প্রতিবাদে বাংলা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে ইঙ্গ-ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়ে পত্র লেখা, কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রচেষ্টা ও অনুমতি না মেলা।

১৯৪৩ বাংলার মন্বন্তরে ব্যাপক সাহায্যের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব। ১৯৪৩-৪৫ বাংলার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।

১৯৪৪ "ন্যাশনালিস্ট" নামে এক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করা। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯৪৫ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস পালনের সময়ে সরকারের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের সময়ে ছাত্রদের নেতৃত্বদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ। তারপরেই গুরুতর অসুস্থতা।

১৯৪৬ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত। কলকাতার দাঙ্গায় বিপুল প্রাণক্ষয়। চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। দুর্গত মানুষের পাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে দাঁড়িয়ে সাহায্যদান। হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল গার্ড-এর প্রতিষ্ঠা করা। বাংলা থেকে গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত। ডঃ মুখার্জীর আন্দোলনে বাংলার এক অংশের ভারতীয় ইউনিয়নে থেকে যাওয়া সম্ভব হয়।

১৯৪৭ ১৫ই আগস্ট পণ্ডিত নেহরু সরকার গঠন করেন। ডঃ মুখার্জী মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভার নেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে নিয়োগের উপদেশ দেন। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি।

১৯৪৮ ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। কয়েক মাস আগে প্রদত্ত নীতির পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৯৪৮-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী মহাসভা কর্তৃক গৃহীত।

১৯৪৯ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক জানুয়ারী মাসে তাঁর হাতে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্তও মোগ্গালানার দেহাবশেষ ডঃ মুখার্জীর হাতে অর্পণ। আগস্টে মহাসভার ১৯৪৮, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সিদ্ধান্ত নাকচ এবং পুনরায় রাজনীতিক কার্যকলাপ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাসভার কার্যকরী সভা থেকে ডঃ মুখার্জীর পদত্যাগ।

১৯৫০ নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি। পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তোষণ-নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্য এবং সেই কারণেই ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ডঃ মুখার্জীর পদত্যাগ। উদ্বাস্তুদের সেবায় মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ এবং তাদের সাহায্যে ও পুনর্বাসনের জন্য বিস্তৃত জায়গায় পরিদর্শন।

১৯৫১ পিপলস্ পার্টি নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন এবং পাকিস্তানকে তোষণের জন্য ভারত সরকারকে অভিযোগ। দিল্লীতে অক্টোবর মাসে ডঃ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। ভারতের সকল প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এই সভায় আসেন। লোকসভায় মৌলিক অধিকার খর্বকারী ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনী বিল পাস করানোর বিরুদ্ধে লোকসভায় তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৫২ সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত। পাকিস্তানের প্রতি দৃঢ় নীতি নেওয়ার জন্য লোকসভার ভেতরে ও বাহিরে সরকারের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেন। লোকসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক দল নামে একটি বিরোধী ব্লক তৈরী করেন। নভেম্বর মাসে সাঁচীতে বুদ্ধশিষ্যদের দেহাবশেষ স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগদান। বর্মা, কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভ্রমণ। কটক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব। কানপুর জনসঙ্ঘের সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৫৩ জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য জম্মুতে প্রজা-পরিষদের অন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য সরকার বিশেষ করে শ্রীনেহরুর সঙ্গে তীব্র বাদ-বিতণ্ডা। পারস্পরিক আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য নেহরু ও আবদুল্লার সঙ্গে দীর্ঘ কিন্তু নিষ্ফল পত্রবিনিময়। চাঁদনী চকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শোভাযাত্রা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার, আটক, পরে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ। ১১ই মে কাশ্মীর প্রবেশ, গ্রেপ্তার এবং শ্রীনগরে আটক থাকা। বন্দীদশায় শ্রীনগরে মৃত্যু। ২৪শে জুন কলিকাতায় মরদেহের সৎকার।
